বুকের কথা

বুকের কথা

মনীষা

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ১৯৬৩

প্রকাশক

মণি সান্যাল

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড

৫৪এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক

মৃণাল কান্তি রায়

রাজলক্ষ্মী প্রেস

৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

গল্পক্রম

বুকের কথা

মেয়েব কাছে চলেছে হিরণ্ময়। শিলিগুড়ি। এ-জীবনে কাউকে মনের কথা বলা হল না হিরণ্ময়ের। মেয়েকে বলতে হবে সব। মনে তো কত কথাই জমে মানুষের। হাজারও কথা। লাখো কথা। অর্বুদ কথা। সেইসব কথা ঠিক ঠিক বলে ফেলতে পারলে হিরণ্ময়ের পৃথিবীটা হয়তো আমূল বদলে যেত। অনেক মনোরম, অনেক ভরভরন্ত হয়ে উঠত জীবনটা। কেন যে তাকে নিয়ে এই নিষ্ঠুর খেলা খেলল বিধাতা!

খেলা, নাকি বৈরিতা? মানুষ যা বলতে চায় তার বদলে যদি অন্য কথা বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, তবে তাকে কি বলে? এই ব্যাপারটাই ঘটে আসছে হিরণ্ময়ের জীবনে। চিরটাকাল। হৃদয়ের সঙ্গে স্বরযন্ত্রের এ এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। মন যা বলতে চায় কণ্ঠ তাকে ধাক্কা মেরে হটিয়ে দেয়। স্বরযন্ত্র টপকে যদিওবা মুখে এল কথাটা, জিভ ঠোঁট ওমনি বিদ্রোহ করে বসল। মনের কথা মনেই রয়ে গেল হিরণ্ময়ের।

হিরণ্ময়ের শৈশব কেটেছিল দুটো মানুষকে ঘিরে। মা আর দিদি। হিরণ্ময়ের যখন সবে ছয়, তখন তার বাবা মারা যায়। হঠাৎ। দিব্যি সুস্থ মানুষ খেয়েদেয়ে অফিস গেল, ফিরে এল মৃতদেহ হয়ে। অফিসে নাকি ফাইল দেখতে দেখতে আর্তনাদ করে উঠেছিল একবার, পাশের টেবিলের লোক ছুটে আসার আগেই সব শেষ।

বাবার মৃত্যুর পর অথৈ জলে পড়েছিল মা। আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগুষ্টি সবাই দূর থেকেই আহা-উহু করে, এগিয়ে এসে দায় নেওয়ার বেলায় একজনও নেই। অর্থ নেই, সম্বল নেই, দু-দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে মা যে তখন কী করে! শেষে

বাবার বন্ধুদের করুণায় মাটিতে পা রাখার একটা জায়গা জুটল। বাবার অফিসে চাকরি পেল মা।

চাকরি পাওয়ার পরও বহুকাল বাবার ছবির সামনে বসে কাঁদত মা। সারা দিন অফিস, সংসারের খাটাখাটুনি, দিদি ছোট থেকেই একটু রোগাভোগা তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা—মা বোধহয় ফিরে ফিরে বাবার কাছেই আশ্রয় খুঁজত।

মার কান্না দেখে বুক ভার হয়ে যেত হিরণ্ময়ের। সন্ধেবেলাই রাত নামত চোখে। মনে মনে বলত, দুঃখ কোরো না মা। আমাকে একটু বড় হতে দাও, তোমার সব কান্না আমি মুছে দেব।

ছোট্ট হিরণ্ময় জানত না এ পৃথিবীতে কেউ কারুর কান্না মোছাতে পারে না। কান্না জিনিসটা জোলো বাতাসের মতো। রুক্ষ পৃথিবীকে কান্নাই খানিকটা সহনীয় করে তোলে।

তা হোক, তবু কথাগুলো শুনলে হয়তো একটু ভাল লাগত মার। শিশুর মুখের কথা হলেও সান্ত্বনা তো বটে।

কিন্তু ওই যে, মনের কথা মুখে আসে না হিরণ্ময়ের। এসে এসেও ফিরে যায়।

হিরণ্ময় জোরে জোরে ঠেলত মাকে, —আর কাঁদতে হবে না। ওঠো। আমাকে খেতে দেবে চলো।

মা সজল চোখে বলত, —তোর কি বাবার জন্য একটুও মন কেমন করে না হীরু?

করে। করে। ভীষণ করে। যে মানুষটা এই সেদিনও ছিল, হাসিখুশিতে ভরিয়ে রাখত সংসার, তাকে শ্মশানে পুড়িয়ে এলে বুক হু-হু করবে না? বাবা কত ভালবাসত হিরণ্ময়কে। ছুটির দিন হলেই তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়। চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পরেশনাথের মন্দির কোথায় না যেত। আইসক্রিম ঝালমুড়ি খাওয়াত, বুড়ির মাথার পাকা চুল কিনে দিত, রেস্টুরেন্টেও খাইয়েছে কত দিন। হাঁটতে হাঁটতে হিরণ্ময়ের পা ধরে গেলে তাকে কাঁধে নিয়ে ছুটত বাবা। বাঘের খাঁচার সামনে হিরণ্ময়কে পাঁজাকোলা করে তুলে ছুঁড়ে দেওয়ার ভান করত, আর হাসত গমগম।

লকলকে চিতার হৃদয়ে সাপটে রেখে হিরণ্ময়ের ঠোঁট বলে উঠত, — যে মরে গেছে তার কথা ভেবে কি লাভ?

ছোট মুখে বড় কথা শুনে অবাক চোখে তাকাত মা। বুঝিবা বুঝতে চাইত কথাটা কতটা শেখা বুলি, কতটা বা অন্তরের। ভিজে স্বরে ধমকাত, —ও কথা

বলতে নেই হীরু। তোমার বাবা এখানেই আছে। এই আমাদের চারপাশে।

—দূর, বাবা তো কল্পেই [illegible]র ভূত। সত্যি সত্যি ভূত এলে আমার একটুও ভাল লাগবে না।

একদিন ঠাস করে চড় কষিয়ে দিয়েছিল মা। বিনবিন কান্না ঝেড়ে ডুকরে উঠেছিল, —তোর মনে কি একটুও মায়া নেই? এই বয়সেই এত নিষ্ঠুর?

আশ্চর্য! সেই মাও বাবাকে ভুলে গেল। মাঝখান থেকে হিরণ্ময়ের কপালে একটা স্ট্যাম্প পড়ে গেল—নিষ্ঠুর!

এক সময়ের যোগিনী বেশ ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলল মা। চুলে মুখে চোখে রুখুসুখু ভাব, কপালে দিবারাত্র বিষণ্ণতার ভাঁজ দিব্যি উবে গেল। চড়া রঙিন শাড়ি পরে অফিস যেতে মা আর অস্বস্তি বোধ করে না, ছোট্ট টিপ পরে, পাউডাব বুলোয়, পারফিউম মাখে, হাল্‌কা কাজলও দেয় চোখে। অফিস থেকে ফিরে যে মা হা-ক্লান্ত বসে থাকত, মাত্র চারটে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার মধ্যে কী পরিবর্তন! বাবার অফিসের বন্ধু অরুণকাকুর প্রায়ই আসাযাওয়া বাড়িতে। কাকুকে দেখলেই মার চোখ খুশিতে ঝলমল।

মার ওই সুখী মুখটাই তো আজীবন দেখতে চেয়েছে হিরণ্ময়। অরুণকাকুকেও তার মন্দ লাগত না। শান্ত, কিন্তু কী দিলদরিয়া। কাকু কত খেলনা কিনে দিত হিরণ্ময়কে। দিদিকেও। যখনই আসত হাতে চকোলেট লজেন্স কেক পেস্‌ট্রি। হিরণ্ময়দের হারিয়ে যাওয়া খুশিটাকে আবার যেন ফিরিয়ে আনছিল কাকু।

এক রবিবার বিকেলে, সেদিন বুঝি অরুণকাকু রাত্রে হিরণ্ময়দের বাড়িতে খাবে। সকাল থেকে দিদিকে সঙ্গে নিয়ে কত পদ রাঁধল মা। তারপর বিকেল হতে আয়নার সামনে সাজতে বসল। দেখতে দেখতে কী অপরূপ হয়ে উঠছিল মার পানপাতা মুখ। পাতা কেটে চুল আঁচড়েছে, ঘাড়ের কাছে গোল খোঁপা. কপালের খয়েরি টিপও সেদিন যেন একটু বড়। মিষ্টি সৌরভে ভরে যাচ্ছিল ঘরের বাতাস।

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, তুমি চিরকাল এমনই সুন্দর থেকো মা।

সাদার ওপর নীল ফুটফুট শিফনের আঁচল কাঁধে ছুঁড়ে মা হঠাৎ কথা বলে উঠল, —আমাকে দেখতে কেমন লাগছে রে হীরু?

স্বরযন্ত্র খরখর করে উঠল হিরণ্ময়ের, —তোমার মুখটা কেমন বুড়ি বুড়ি হয়ে গেছে মা। সাজলে তোমাকে সঙের মতো দেখায়।

মার মুখ পলকে মলিন। সমস্ত রঙ মুছে গিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে এক তেত্রিশ বছরের কঙ্কাল। এক প্রাগৈতিহাসিক মমি।

অবসন্ন মা কপাল থেকে টিপ মুছে ফেলল। চুপটি করে মোড়ায় বসে রইল

কিছুক্ষণ। ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় কি যেন খুঁজল। তারপর অরুণকাকুর কিনে দেওয়া ঝুরো কুমকুমের কৌটো ফেলে দিল জানলা দিয়ে নিঃশব্দে।

মা আব কখনও টিপ পরেনি।

অরুণকাকুর সঙ্গে সম্পর্কটাও স্থবির হয়ে গেল।

মা একটা শক্ত লোহার বর্ম এঁটে নিল শরীরে। মনেও।

হিরণ্ময়দের সংসাবে আলো জ্বলেও নিবে গেল।

সংসারে সুখঅসুখ থাকেই। ঝড়ঝাপটা বিপদআপদও আসে। আবার কখনও কখনও দখিনা বাতাসও বয়। কিন্তু নিবে যাওয়া সংসারে শুধু মেঘ আর মেঘ। সেই মেঘের আড়াল থেকে এক অদৃশ্য তীরন্দাজ বিষের তীর হেনে চলে অবিরাম।

রোগা দিদির ভারি ন্যাওটা ছিল হিরণ্ময়। বাইরের জগৎ তেমন টানত না হিরণ্ময়কে, চার বছরের বড় দিদিই ছিল তার কৈশোরের পৃথিবী। দিদিব সঙ্গে খাওয়া। দিদির সঙ্গে খেলা। দিদির সঙ্গে ঘুম। সেই দিদি পড়ে গেল এক কঠিন অসুখে। বাবাকে অসম্ভব ভালবাসত দিদি, বাবার মৃত্যুর পর গুমরে গুমরে কাঁদত। দিদির সেই গোপন অশ্রুই বুঝি প্লুরিসি হয়ে বাসা বাঁধল বুকে।

হিরণ্ময়ের জগৎ যেন চুরমার হয়ে গেল।

চোদ্দো বছরের দিদি সারা দিন মিশে আছে বিছানায়। বিষণ্ণ। ফ্যাকাসে। শীতের নিষ্পত্র কৃষ্ণচূড়া গাছটির মতো। দিদিকে দেখে ভীষণ মায়া হত হিরণ্ময়ের। জ্বরে আচ্ছন্ন দিদির মাথার পাশে বসে হিরণ্ময় মনে মনে বলত, দিদি, তুই ভাল হয়ে ওঠ্। দিদি, তুই একদম সেরে যা।

একদিন হিরণ্ময়ের প্রার্থনার সময়ে চোখ খুলল দিদি। শীর্ণ হেসে বলল, —কি বিড়বিড় করছিস রে হীরু?

হিরণ্ময় ভীষণ চমকে উঠল, —কই, কিছু না তো।

—নিশ্চয়ই কিছু বলছিস। কি বলছিলি বল্ না।

হিরণ্ময়ের জিভ ঠোঁট বেমালুম বলে দিল, —তুই আর ভাল হবি না রে দিদি।

—এ কথা কেন বলছিস্? দিদি প্রায় ককিয়ে উঠল।

—তোর অসুখটা খুব খারাপ। আমি জানি। এ রোগ সেরেও সারে না।

নিমেষে দিদির মুখ পাংশু। রক্তহীন মুখমণ্ডলে প্রাণের আভাটুকুও যেন আর রইল না। অসাড়ে জল গড়িয়ে গেল গাল বেয়ে।

হিরণ্ময়ের দিকে পিছন ফিরে শুল দিদি।

মাস দুই পর দিদি মোটামুটি সুস্থ হল। তবে দিদির বুকের দোষটা পুরোপুরি গেল না কোনওদিন। সামান্য অনিয়মেই অসুখে পড়ে, ঘুষঘুষ জ্বর লেগেই

আছে, একটু হাঁটাচলা করলেই হাঁপায় কুকুরের মতো।

লেখাপড়াটাও হল না দিদির। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিদি বড় খিটখিটেও হয়ে গেল। বিনা কারণে মার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে, তুচ্ছ অজুহাতে দিনরাত শাপশাপান্ত করে ভাইকে। বারবার পাত্রপক্ষের সামনে বসা আর বাতিল হওয়াই যেন হয়ে উঠছিল তার জীবনের পরিণতি।

হিরণ্ময় তখন একটা ওষুধের কোম্পানিতে কাজে ঢুকেছে। ক্যানভাসাব। সেও তখন বুঝে গেছে দিদির রূপ নেই গুণ নেই, যদি দিদির বিয়ে হয়ও, তার জন্য লাগবে প্রচুর টাকা। দিনরাত খেটে টাকা জমিয়ে চলেছে সে। তার মনের কোণে এক সূক্ষ্ম অপরাধের কণা নোংরা ঝুল হয়ে জমে আছে। যদি একদিন মুখ ফুটে দিদিকে মনের কথা বলে ফেলতে পারত, তা হলে কি আর একটু সতেজ হয়ে ফুটে উঠত না দিদি!

এ বড় কঠিন ধন্দ। এই ধন্দের কূলকিনারা পায় না হিরণ্ময়। পায় না বলেই সে আরও অসুরের মতো খাটে, আরও টাকা জমায়।

শেষ পর্যন্ত দিদির একটা সম্বন্ধ পাকা হল। পাত্র কার্ডবোর্ডের ব্যবসা করে। খাট আলমারি ড্রেসিংটেবিল, নমস্কারী শাড়ি ছাড়া তাদের আর বিশেষ দাবিদাওয়া নেই। গয়না শাড়ি মেয়েকে যে যেমন দেয় তা তো হিরণ্ময়রা দেবেই।

হিরণ্ময় দিদির বিয়ের তোড়জোড় শুরু করল। কোমর বেঁধে। বহু দিন পরে সংসারে একটা উৎসব আসছে।

বিয়ের মাত্র সাত দিন আগে আবার এক বিষতীর ছুঁড়ল অদৃশ্য তীরন্দাজ। পাত্রপক্ষ একটা ছোট্ট লিস্ট পাঠিয়েছে। অতি বিনয়ের সঙ্গে। ব্যবসার কাজে তাদের হঠাৎ লাখ টাকা আটকে গেছে, ছেলের বউভাতের খরচখরচার জন্য দশ হাজার টাকা দরকার। আগে বলা হয়নি, ছেলেকে কাজের ধান্দায় নানান জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়, একটা মোটর সাইকেল বা স্কুটার না হলে ভয়ানক অসুবিধে হয় ছেলের।

হিরণ্ময়ের মা সিঁটিয়ে গেল, —এখন কী হবে হীরু?

হিরণ্ময়েরও চোখ ফেটে জল আসছিল। এখন উপায়? কি হবে দিদির?

মা বলল, —আরও পঁচিশ তিরিশ হাজারের ধাক্কা। অত টাকা আমি পাব কোথায়?

হিরণ্ময় দ্রুত হিসেব করে নিচ্ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে কুড়িয়ে কাছিয়ে আরও হাজার নয়েক তোলা যেতে পারে, বাকিটা কি কোনওভাবে জোগাড় করা যায় না? দরকার হলে কোম্পানির মালিকের কাছে আত্মাটাও বাঁধা রাখবে সে।

মাকে অভয়বাণী শোনাতে চাইল হিরণ্ময়, কিন্তু স্বরযন্ত্র বেইমানি করল,

—এ বিয়ে ভেঙে দাও মা।

দিদি হাউমাউ তেড়ে এল, —কেন বিয়ে ভাঙবে? আমার জন্য তুই টাকা খরচ করতে চাস না? তোর জমানো টাকা নেই?

হিরণ্ময় বলতে চাইল, সত্যি অত নেই রে। বলে ফেলল, —থাকলেও দেব না। ওখানে বিয়ে হওয়ার থেকে তোর আইবুড়ো বসে থাকা ভাল।

শুকনো প্যাকাটির মতো দিদি দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল, —আমি মরে যাব। আমি বিষ খাব।

ভেতরের হিরণ্ময় বলে উঠল, আমি তোকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি রে দিদি। তুই শান্ত হ। আমি ব্যবস্থা কিছু করবই।

মা দিদি শুনতে পেল উল্টো কথা, —পাগলামি করিস্ না দিদি। এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না।

আচমকা মা ছুটে গিয়ে জাপটে ধরল দিদিকে। অনেক কাল আগে এঁটে নেওয়া খোলস ভেঙে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগীর মতো চেঁচিয়ে উঠেছে হঠাৎ, —ও আমাদের কারুর ভাল চায় না রে খুকু। টাকা আমি জোগাড় করব। দেখি তোর বিয়ে ও কি করে আটকায়।

চেয়েচিন্তে, প্রায় এর ওর কাছ থেকে ভিক্ষে করে, টাকাটা জোগাড় করে ফেলল মা। পরদিন নতমুখে যথাসর্বস্ব সঞ্চয় তুলে এনেছিল হিরণ্ময়, মা ছুঁয়ে দেখল না। কল্পিত শুভ লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল দিদির।

মাস চারেক পর জামাইবাবুর সঙ্গে মুসৌরি বেড়াতে গেল দিদি। বিলম্বিত মধুচন্দ্রিমা। সেখানেই পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে দিদি মারা গেল।

মা জামাইকে দুষল না। হিরণ্ময়ের দিকে আঙুল তুলল, —তুই কি কখনও কারুর সুখ চাইবি না হীরু? তোর মনে এত কু?

হিরণ্ময় কলকাতা ছাড়ল। কপালে একটা দগদগে দাগ নিয়ে। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!

দুই

মেয়ের কাছে চলেছে হিরণ্ময়। শিলিগুড়ি। সেখানে মার সঙ্গে থাকে মেয়ে। তাদের দ্বীপ থেকে বহুকাল নির্বাসিত হয়েছে হিরণ্ময়।

মনের কথা হিরণ্ময় মেয়ের মাকে বলতে পারেনি। মেয়েকে বলতে হবে সব।

হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে অনন্ত কথার মিছিল ঝংকার তোলে অবিরাম।

শিলাবৃষ্টি হয়ে আছড়ে পড়তে থাকে হৃদয়ের খাঁচায়। মাথা খোঁড়ে। ভাষা চায়।

একটি বারও যদি মনের কথাকে বার করে দিতে পারত হিরণ্ময়!

আরতি বলত,—তুমি একটা কসাই। তোমার মন বলে কিছু নেই।

আরতি হিরণ্ময়ের বউ। আরতি ঝুমুরের মা। কলকাতা ছেড়ে অন্য ওষুধ কোম্পানিতে কাজ নিয়ে শিলিগুড়ি চলে গিয়েছিল হিরণ্ময়। সেখানেই আরতির সঙ্গে তার বিয়েটা ঘটে। আরতির বাবা রেলের কন্ট্রাক্টর। সিভিল। দাপুটে মানুষ। কোমরে টোটা ভরা রিভলবার। দু-আড়াই শো কুলির প্রভু। অপার সুখ, অঢেল বিত্ত, অসীম প্রতিপত্তি লুটোপুটি খায় তার পায়ে। পোষা বেড়ালের মতো। এমন একটা লোকের মেয়ের সঙ্গে হিরণ্ময়ের বিয়ে হওয়ার কথা নয়, তবু কেমন করে যেন হয়ে গেল।

হিরণ্ময় তখন ভূতের মতো খাটে। সক্কালবেলা বেরিয়ে পড়ে বাক্স নিয়ে, হিমালয় থেকে তরাই চক্কর মারে দিনভর। তখন তার পরিশ্রম নিজেকে শুধু চেতনার শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাতে দিনশেষে বুকে কোনও কথা জমার অবকাশটুকু না থাকে।

আরতি বাবা কর্মবীর। বোধহয় হিরণ্ময়ের এই পরিশ্রমী চেহারাটাই পছন্দ হয়েছিল তার।

হিরণ্ময়ের মধ্যেও তখন এক তীব্র বাসনা। সংসার করতে হবে। আরতি বাবার প্রস্তাবে সেও বেশ প্রলুব্ধ হয়েছিল। একটাই শর্ত ছিল আরতির বাবার। মেয়ে তার চোখের মণি, হিরণ্ময় কখনও শিলিগুড়ি ছাড়তে পারবে না।

হিরণ্ময়ই বা তখন আর কোথায় যাবে? মেনেই নিল। বিয়ের খবর জানিয়ে চিঠি দিল মাকে। মা এল না।

ফুলশয্যার রাতে আরতিকে দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল হিরণ্ময়ের। ফুলচন্দনে সাজা, বেনারসিতে মোড়া ওই পুতুলের মতো মানবী তার! তবে কি জীবন আবার....! প্রিয়জন হারিয়ে আবার কি প্রিয়জন পেল হিরণ্ময়!

ফাল্গুন মাস। মহানন্দার দিক থেকে একটা বাতাস আসছিল ঘরে। ঠাণ্ডাও নয়, আবার ঠিক উষ্ণও নয়, কেমন এক শান্তির প্রলেপের মতো। দোলপূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিচ্ছিল জানলায়।

আরতি বিছানায় বসে একটা একটা করে কাঁটা খুলছিল খোঁপা থেকে। মৃদু মৃদু পা দুলিয়ে ছুন ছুন নিক্বণ তুলছিল নুপুরে। তেমন একটা লজ্জাশীলা কনেবধূটি ছিল না আরতি, বরং সে যেন একটু বেশিই চপল।

গ্রীবা হেলিয়ে আরতি প্রথম কথা বলল, —আমাকে একটু জল দাও তো।

টেবিলে জলের গ্লাস। দৌড়ে নিয়ে এল হিরণ্ময়। জলটুকু নিঃশেষ করে

শূণ্য গ্লাস হিরণ্ময়কে ফিরিয়ে দিল আরতি। সুগন্ধী রুমালে মুখ মুছল। হঠাৎ বুঝি তার খেয়াল হল গ্লাস হাতে দাঁড়িয়েই আছে হিরণ্ময়।

আরতি কটাক্ষ হানল, —কি দেখছ?

হিরণ্ময়ের বুকে মাদল বাজছিল দ্রিম দ্রিম। তুমি সুন্দর। তুমি সুন্দর। তুমি সুন্দর।

স্বরযন্ত্র রুখে দিল কথাটাকে। জিভ আর ঠোঁট বিদ্রোহী হল। কাঁপা কাঁপা গলায় হিরণ্ময় বলল,—তোমার কপালটা বড্ড ছোট।

— তো?

— ছোট কপালের মেয়েরা সুখী হয় না। তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

ঠিকাদারের ধনী মেয়ে থমকাল মুহূর্তের জন্য। ক্ষণ পরেই হেসে উঠেছে খিলখিল,— সে তো আছেই। বাবা এমন দড়ি-কলসি বেঁধে জলে ফেলে দিল!

হিরণ্ময় কুঁকড়ে গেল, —আমাকে বুঝি তোমার পছন্দ নয়?

ঠিকাদারের মেয়ে পা দোলাচ্ছে আবার,— ভেবে দেখতে হবে।

—কি?

—এই, এরকম চালচুলোহীন লোককে পছন্দ করা যায় কিনা।

হিরণ্ময় নিঃশব্দে বলল, —আমি বড় দুঃখী আরতি। আমাকে দয়া কোরো। আমাকে দয়া কোরো।

হিরণ্ময়ের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে নিজেই ড্রেসিংটেবিলে রেখে এল আরতি। নতুন বরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সামনে। নরম আঙুল দিয়ে নেড়ে দিল হিরণ্ময়ের নাক, — উঁউঁহু, অমনি বাবুর ঠোঁট ফুলল! না রে বাবা, তোমার মতো লোকই আমার পছন্দ। বোকা বোকা। ভ্যাবলা ভ্যাবলা।

খুশি হবে, না আহত হবে ভেবে পাচ্ছিল না হিরণ্ময়। শুনতে পেল রক্তে যেন কল্লোল উঠছে। তীব্র সুবাসে আচ্ছন্ন হয়ে এল ঘ্রাণশক্তি।

আরতি হঠাৎ বলল,—তখন কপালের কথা বললে কেন? তুমি জ্যোতিষচর্চা করো নাকি?

নিশ্বাস ঘন হয়ে এল হিরণ্ময়ের। সামান্য হেসে হাল্‌কা হতে চাইল।

ধনী মেয়ের হাত ভরা গয়না নেচে উঠল ঝমঝম। তুলতুলে দুটো হাত এগিয়ে এল হিরণ্ময়ের দিকে, —দ্যাখো তো, আমার হাতে কি আছে?

কোমল হাতের স্পর্শে হিরণ্ময়ের দেহ শিরশির। এ এক অচেনা স্বাদ। রোমহর্ষক।

আরতি বলল, আমার আয়ুরেখাটা কেমন গো? কদ্দিন বাঁচব বলে মনে

হয়?

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, কি হবে জেনে? যতদিন সুখ ততদিনই তো বেঁচে থাকা। বাকি জীবন তো নীরস সালতারিখের হিসেব।

আরতি অধীর হল, —আমার স্বাস্থ্য কেমন যাবে? অসুখ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগে না।

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, —অসুখের চিন্তাই অসুখ আরতি। আমি চিরকাল তোমার মন ভাল রাখব, অসুখ তোমার হবেই না।

আরতি ঝামরে উঠল, —কই, কিছু বলো। হাত ধরে সখা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

তড়বড়িয়ে সরব হল হিরণ্ময়। এবং ভুল কথা বলল, —তোমার হাতে বড় কাটাকুটি। এত দাগ থাকা ভাল নয়। জীবন জটিল হয়।

—আমার জীবন জটিল হবে কি মরতে? আমার বাবা আছে না? সব জটিলতা বাবা সিধে করে দেবে। বাবার কাছে আমার সুখ সব থেকে আগে।

হিরণ্ময়ের হাত থেকে করতল দুটো খসে পড়ে গেল।

—ভয় খেয়ে গেলে? হেসে লুটিয়ে পড়েছে আরতি, —তুমি একটা ভোঁদা কার্তিক। তুমি একটা হাঁদাগঙ্গারাম। ফুলশয্যার রাতে মেয়েরা কেন বরেদের হাত ধরতে বলে বোঝ?

হিরণ্ময়ের সত্যি ভয় করছিল। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে কি ভুল করল সে!

পরদিন থেকে আরও পরিশ্রমী হয়ে গেল হিরণ্ময়। বড়লোকের মেয়েকে স্বাচ্ছন্দ্যের নকশিকাঁথায় মুড়ে রাখতে হবে। কখনও যেন বাবার ধনের কথা না তুলতে পারে আরতি। কখনও যেন এতটুকু অভাবের কষ্ট না পায়।

এত খেটেই বা কি লাভ হল হিরণ্ময়ের! যার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম, তার মুখ ভার দিনে দিনে। আরতি দর্পী মেয়ে বটে, কিন্তু তার চাওয়া খুব বেশি নয়। হিরণ্ময় বাড়ি ফিরলেই সে ছোট ছোট অনুযোগের ঝাঁপি খুলে বসে। তুমি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাও না! শান্তিনিকেতন থেকে অত ভাল নৃত্যনাট্যের দল এসে চলে গেল, তুমি একদিনও সময় করতে পারলে না! সারাটা দিন কিভাবে কাটে আমার, সে খবর রাখো!

হিরণ্ময় নিবিড় চোখে তাকাত। তোমাকে ছেড়ে এই খেটে মরা, এ তো তোমারই জন্য আরতি।

বলত অন্য কথা, —ঘরে বসে থাকার দরকার কি? ঘোরো না নিজের মতো।

—কার সঙ্গে ঘুরব?

—যার সঙ্গে খুশি। এ শহর তো তোমার চেনা।

আরতির মুখ থমথমে হয়ে যেত। সরে যেত পাশ থেকে, —জানি। চাইলেই বাবা এক্ষুনি গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। একবার তুড়ি দিলে একশোটা সঙ্গী জোটে আমার।

—সত্যি?

—তুমি দেখতে চাও?

হিরণ্ময়ের মুখের বলাটাকে ধ্রুব ধরে নিয়ে সঙ্গী জুটিয়ে নিল আরতি। পাড়ার দেওর, পুরনো বন্ধু, অনেকেরই আনাগোনা শুরু হল বাড়িতে। আজ এর সঙ্গে মার্কেটিং, কাল ওর সঙ্গে সিনেমা। কখনও বা দলবল নিয়ে পাহাড়, কখনও পিকনিক করতে জঙ্গল। কত দিন রাতে বাড়ি ফিরে বউকে দেখতে পায়নি হিরণ্ময়।

তবু সম্পর্কটা ছিল। অম্ল মধুরে। কাঁটায় ফুলে।

এক রাতে হিরণ্ময়ের গলা জড়িয়ে শুয়ে আরতি রাতপাখির মতো রিনরিন করে উঠল, —এই, তুমি তমালকে চেনো?

—কে তমাল?

—চেনো না? আমার বাপের বাড়ির পাশেই যে বিশাল বাড়ি....। দারুণ হ্যান্ডসাম। রোজ নতুন নতুন রঙের টিশার্ট পরে। প্রচণ্ড স্পিডে মোটরবাইক চালায়।

হিরণ্ময় চিনতে পারল না। তবু বলল, —হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি। কেন?

—তমালটা ভারি অসভ্য হয়ে গেছে।

হিরণ্ময়ের বুক ঢিপঢিপ করে উঠল।

—তমাল কি বলে জানো?

বোলো না আরতি। বোলো না।

—তমাল বলে আমার জন্যই নাকি ও বিয়ে করে উঠতে পারছে না। যে মেয়েকেই দ্যাখে তাকে আমার তুলনায় বাঁদরী মনে হয়।

হিরণ্ময় নিরুচ্চারে বলল, এসব তো আমার বলার কথা। এ কথা তমাল বলে কেন?

মুখ বলল, —অকারণ স্তুতিবাক্য মানুষের ক্ষতি করে আরতি।

আরতি শুনেও শুনল না। ঝটপট বলে উঠল,—তোমার হিংসে হচ্ছে?

বুকের চিন চিন ভাব বুকেই রয়ে গেল হিরণ্ময়ের। স্বর বলল, —হিংসে কেন?

—কারণ তুমি তমালের মতো হ্যান্ডসাম নও। কারণ তুমি তমালের মতো সুন্দর করে কথা বলতে জানো না। কারণ তুমি তমালের তুলনায় অতি সাধারণ। কথাটা বলেও যেন তৃপ্তি হল না আরতির। ব্যঙ্গের সুরে বলল, —আরও কি বলে শুনবে?

—কি?

—সেই কথাটা। যে কথাটা আমাকে তুমি আজও বলোনি।

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, সে কথা কি তুমি এখনও শুনতে পাওনি আরতি? কণ্ঠ বলল, —তুমি কি সে কথা আর আমার কাছে শুনতে চাও?

—না, চাই না। আরতি ছিটকে সরে গেল, —ও কথা তমালের মুখেই মানায় ভাল।

ক্রোধের বদলে এক বিষাদ ঢেকে ফেলছিল হিরণ্ময়কে। পথেঘাটে বনে প্রান্তরে পাহাড়ে আকাশে নদীতে সর্বত্র আরতিকে দেখতে পায় হিরণ্ময়। এই দুনিয়ায় কোন পুরুষ কোনও নারীকে হিরণ্ময়ের থেকে বেশি ভালবাসতে পারে না।

বুক উজাড় করতে গিয়ে বাধা পেল হিরণ্ময়। উৎকট হাই উঠে কথার পথ রোধ করল। মুখ বলল, —রাত বড় অশালীন ভাবনা ভাবায়। তুমি ঘুমোও আরতি।

আরতি অন্ধকারে হিসহিস করে উঠল, —তুমি কসাই। তুমি মানুষ নও। মন বলে তোমার কিচ্ছু নেই।

কথাটা আরও বহুবার বলেছে আরতি। বহু সময়ে। প্রতিবার একটু একটু করে ছিঁড়েছে সম্পর্কের সুতো। শেষবার বলেছিল বড় কঠিন ভাবে। তখন তাদের মাঝে ঝুমুর এসে গেছে।

দেড় বছরের মেয়েকে নিয়ে সেবার প্রথম আরতির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল হিরণ্ময়। পাহাড়ে। তখন হিরণ্ময় কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার, সবে একটা গাড়ি কিনেছে। শ্বশুরের সাহায্য ছাড়াই ছোট্ট বাড়িও তুলেছে শিলিগুড়িতে। হিরণ্ময় খুশি। খুবই খুশি।

আরতিও সেদিন বেশ উচ্ছল। শেষ বিকেলে পাহাড় কিনারে দাঁড়িয়ে অনেক নীচের জঙ্গল দেখছিল সে। দেখছিল দুপাশে পাইনের হাতছানি। দেখছিল অপরূপ ক্যাকটাস চতুর্দিকে। পাশে ঝুমুর। পাহাড় চুঁইয়ে আসা আলোয় দুজনেই কী অপরূপ! খানিক দূর থেকে অপলক চোখে দুজনকে দেখছিল হিরণ্ময়।

আরতি এক সময়ে ডেকে উঠল, —এই, শুনছ, শুনছ?

—উঁ?

—আমি যদি এক্ষুনি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিই, কেমন হয়?

এ কি কথা বলে আরতি!

আশংকা চেপে হাসল হিরণ্ময়, —ওখানে বড় ঝোপজঙ্গল। একটু নীচে গিয়ে আটকে যাবে।

আরতি ভুরু কুঁচকে তাকাল, —যদি আরও খাদের দিকে গিয়ে ঝাঁপ দিই? ধরো ওই দিকটায় গিয়ে?

কেন আরতি! এখন তোমার কিসের অভাব!

হিরণ্ময়ের কণ্ঠস্বর বলল, —তুমি মরতে পারবে না আরতি। তোমার এত পিছুটান।

—কিসের পিছুটান?

আমি। আমি। আমি।

আরতির কাছে পৌঁছেও হিরণ্ময়ের স্বর বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল, —তোমার বাবা। যিনি তোমার সমস্ত জটিলতার সমাধান করতে পারেন। তোমার তমাল। যে তোমাকে ভালবাসার কথা শোনাতে পারে।

আরতি গুম। খানিক পরে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, —আর কোনও পিছুটান নেই আমার?

ম্রিয়মাণ আরতিকে দেখে বুক টনটন করছিল হিরণ্ময়ের। আরতি কি শুনতে চায় সে তো স্পষ্ট। তবু কেন ঠোঁট খোলে না হিরণ্ময়ের!

দিব্যি কায়দা করে আরতিও ঘুরিয়ে নিল কথাটা, —আমাদের মেয়ে নেই?

ভুল বলতে হিরণ্ময়ের জিভ সঙ্গে সঙ্গে রাজি, —আমাদের যে একটা মেয়ে আছে, আমার মনেই থাকে না।

—মানে?

—এ মেয়ে যে সত্যিই আমার, বিশ্বাসই হতে চায় না।

—মানে?

কথার পিঠে কথা পড়ে গেছে। মাথা খুঁড়লেও কথা আর ফেরাতে পারবে না হিরণ্ময়।

আরতি বিকারগ্রস্তের মতো চেঁচাচ্ছিল, —তুমি কসাই। তুমি ইতর। তুমি ছোটলোক...

বিকেল বড় দ্রুত রাত হয়ে গেল। কালো অন্ধকার রাত।

শিলিগুড়ি ফিরেই মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল আরতি। হিরণ্ময় আনতে গিয়েছিল তাদের, আরতির বাবা ফটক দেখিয়ে দিল।

বাড়ি গাড়ি বেচে শিলিগুড়ি ছাড়ল হিরণ্ময়। কপালে দগদগে দাগ নিয়ে।

কসাই! কসাই!

তিন

মেয়ের কাছে চলেছে হিরণ্ময়। শিলিগুড়ি। সেখানে আরতির সঙ্গে থাকে ঝুমুর। মা মেয়ের দ্বীপ থেক বহুকাল নির্বাসিত হয়েছে হিরণ্ময়। বিশ বছর পর হিরণ্ময়কে চিঠি লিখেছে মেয়ে। বিয়ে। মেয়ে বিয়ের আগে একবার বাবাকে দেখতে চায়।

কথার ভার আর বইতে পারে না হিরণ্ময়। দেহ ন্যুব্জ হয়ে আসে তার, কান মাথা ভোঁ ভোঁ করে সর্বক্ষণ। মাত্র সাতান্ন বছর বয়সেই এক পলিতকেশ বৃদ্ধ হয়ে নিজেকে খুঁড়ে চলে হিরণ্ময়। তার চোখেব সামনে ভেসে ওঠে এক বিকেল, যে বিকেলে ঝুরো কুমকুমে সাজছিল মা। মা আর নেই। মনে পড়ে এক পাতাঝরা কৃষ্ণচূড়ার জ্বরতপ্ত কপাল। গাছটা মরে গেছে। মনে পড়ে মহানন্দার হাওয়া মাখা দোলপূর্ণিমার রাত। মনে পড়ে পাহাড়ি বিকেলে দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া আলো। আরতিও হারিয়ে গেছে কবেই।

ঝুমুর আছে। ঝুমুর ডেকেছে হিরণ্ময়কে।

শ্রাবণের সকালে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছল হিরণ্ময়। ট্রেনে। মেঘলা আকাশ, নোংরা চাদরের মতো আলো ছড়িয়ে আছে স্টেশনে। হিরণ্ময় বেরিয়ে একটা রিকশা ধরল। বহুকাল না এলেও এ জায়গা তার হাতের তালুর মতো চেনা, দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল শ্বশুরবাড়ি।

বাড়িটা বদলে গেছে। আমূল। বেদিটা ভাঙা। ফটকের ধারে দারোয়ান থাকত, সেখানে নেড়ি কুকুর ঘুমোচ্ছে। বাগানে জঙ্গল। কড়িবরগা খিলান দরজাজানলা সবেতেই কেমন দুঃখী দুঃখী ভাব। দেখেই বোঝা যায় টোটা ভরা রিভলবার আর নেই।

হিরণ্ময়কে চিনতে দু-এক সেকেণ্ড সময় লাগল আরতির। চমকটুকু কাটার পর হঠাৎই মুখ উদ্ভাসিত। ক্ষণ পরেই একটা ছায়া এসে ম্লান করে দিল আলোটুকু। শুকনো স্বরে আরতি বলল, —তুমি?

হিরণ্ময় হাঁ হয়ে আরতিকে দেখছিল। সময়ের অজস্র দাগে ভরে গেছে আরতি। ছোট্ট কপাল চওড়া হয়ে গেছে। বয়স ঘাঁটি গেড়েছে দেহের আনাচে-কানাচে।

থতমত মুখে হিরণ্ময় বলল, —এলাম।

আরতি বলল, —এসো।

বৈঠকখানা ঘরে বসেছে হিরণ্ময়। ঘরটাতেও প্রচুর ঝুল জমে আছে। পুরনো

সোফায় ধুলোর পরত।

সময়ের বড়ই ওলটপালট করা স্বভাব! হিরণ্ময়ের অস্বস্তি হচ্ছিল।

চারঠেঙে ঢাউস পাখাটা চালিয়ে দিয়ে আরতি বলল, —কেমন আছ?

হিরণ্ময়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, —ভাল। তুমি?

—ভাল। ভালই তো।

আরতিও কি ভুল কথা বলা শিখে গেছে৷

হিরণ্ময় প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে ফেলল, —তুমি আর মুখ দেখাতে বারণ করেছিলে, তাই আসিনি।

—ও। আরতি আবার ভুল কথা বলল, —তা এতদিন পর শিলিগুড়িকে মনে পড়ল যে?

শিলিগুড়ি আমার অস্তিত্বে মিশে আছে আরতি।

বলতে গিয়েও হিরণ্ময় বলে উঠল, —মেয়ে চিঠি দিয়ে ডাকল....

—সেই চিঠি দিল! পলকে কঠিন হয়ে গেছে আরতির মুখ, —বেইমান। বেইমান। এত কাল ধরে যে একা একা মানুষ করল....

হিরণ্ময় গুটিয়ে গেল। আরতি কি সত্যি চায়নি হিরণ্ময় আসুক!

বেশ খানিকক্ষণ পর কথা বলল আরতি, —একেই বলে রক্তের দোষ। মেয়ে বলে যে বাপ স্বীকারই করল না, তার ওপর এত কিসের টান থাকে মেয়ের!

হিরণ্ময়ের বুক ধুকপুক করে উঠল। প্রিয়জন তবে হারায় না! ফিরে ফিরে আসে! ভিন্ন রূপে!

আরতি বলল, —মেয়ে বিয়ের কথাও জানিয়েছে নিশ্চয়ই?

—হুঁ।

—ভালই হল। বাপের কর্তব্যটাও সেরে যাও তবে।

—পাত্র ভাল?

—ইঞ্জিনিয়ার। মেয়ে নিজেই পছন্দ করেছে।

—ও।

—বোসো। মেয়েকে ডেকে দিচ্ছি। তার মুখ থেকেই শোন সব। উদাস মুখে আরতি চলে যাচ্ছিল, হিরণ্ময় পিছু ডাকল, —শোন।

—কি?

—আমার আসাটা কি তোমার পছন্দ নয়?

ঠিকাদারের মেয়ে সত্যিই কথা ধরে রাখা শিখে গেছে। দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত। নাকি অনন্তকাল? তারপর তার ঠোঁট বলল, —আমার

পছন্দ-অপছন্দে কি আসে যায়!

ভেতরবাড়িতে ঢুকে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকছে আরতি। হিরণ্ময শুনতে পাচ্ছিল।

হঠাৎ ভীষণ ভয় করে উঠল হিরণ্ময়ের। মেয়ে আসছে। মেয়েকেও যদি ভুল কথা বলে ফেলে হিরণ্ময়! যদি বলে! যদি বলে!

থাক। কথা নয় রয়েই যাক বুকে।

কত কথাই তো জমে মনে। কটা কথাই বা বলতে পারে মানুষ!

হিরণ্ময় পালাল। পালিয়ে বাঁচল।

আঁধার বৃত্ত

তখনই কেমন সন্দেহ হয়েছিল ব্রততীর। প্রতিদিন এ সময়ে তীর্থের কাকের মতো মার প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে মেয়ে, দূর থেকে মাকে দেখলেই লাফালাফি নাচানাচি শুরু করে দেয়, আজ ব্রততী বাড়ি ফিরে বেল বাজানোর পরও সে মেয়ের দর্শন নেই!

ভুরু কুঁচকে মার দিকে তাকাল ব্রততী, — ওরা এসেছিল বুঝি?

মমতা ত্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মৃদু ঘাড় নাড়লেন।

তীক্ষ্ণস্বরে ব্রততী বলল, — ওরা নিতে এল, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে ওকে ছেড়ে দিলে!

— আমি কি করব? তোর মেয়েই যাওয়ার জন্য খুব কান্নাকাটি করছিল যে।

পলকের জন্য ব্রততীর বুকটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। শূন্য ধূ ধূ ঘাসহীন মাঠের মতো। পরক্ষণে একটা অসহায় রাগ ফুঁসে উঠেছে ভেতরে। চটাস চটাস চটি খুলে ছুড়ে দিল জুতো রাখার র‍্যাকে। থমথমে মুখে বলল, — কথাটা আমায় একবার অফিসে ফোন করে জানাতে পারতে।

— করেছিলাম। তুই তখন অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিস।

— কখন এসেছিল ওরা?

— এই তো খানিক আগে। এক ঘণ্টা.....না না, আরও কম। মমতা সাহস সঞ্চয় করে হাসলেন একটু, — তাড়াতাড়ি দিয়ে যাবে বলেছে। আটটার মধ্যে।

— তাহলে আর কি! ধেই ধেই নাচি।

ব্রততী দুপদাপ ঢুকে গেল ঘরে। কাঁধের ব্যাগ আছড়ে ফেলে দিল টেবিলে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে খাটে বসে পড়েছে। আজই প্রথম দিন নয়, এই নিয়ে দু'মাসে তিন তিন বার তুতুনকে নিয়ে গেল ওরা, একটা না একটা বাহানা দেখিয়ে। হুঁহ্, বাড়িতে সত্যনারায়ণ হচ্ছে! পুজোর দিনে বাবা-মা একবারটি তুতুনকে দেখতে চায়! তার আগের বারও কি একটা বলে যেন নিয়ে গেল না? সীমার ছেলের জন্মদিন না ছাতার মাথা কি যেন? অছিলা অছিলা, সবটাই অছিলা। ব্রততী কি বোঝে না কিছু! সমস্ত ওই অতনুর কারসাজি। কোর্টে মেয়ের কাস্টডি নিয়ে লড়তে গিয়ে হেরে গেছে অতনু, মুখে চুনকালি পড়েছে, তাই এখন অন্যভাবে কলকাঠি নাড়ছে। তুচ্ছতম ছুতো ধরে মেয়ের ওপর দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। আশা কত!

মমতা দরজায় এসেছেন,—মুখ হাত পা ধুলি না? যা, বাথরুম ঘুরে আয়। চায়ের জল বসাচ্ছি।

দু'মিনিট আগেও প্রবল ক্ষিধেতে নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছিল ব্রততীর। অফিসের ক্যান্টিনটা আজ বন্ধ ছিল, কোন দুপুরে বাইরে থেকে এক ঠোঙা মুড়ি-বাদাম এনে খেয়েছে, সে কি এতক্ষণ পেটে থাকে! চার্টার্ড বাস থেকে নেমে মোড়ের দোকান থেকে গোটা চারেক গরম প্যাটিস্ কিনেছিল ব্রততী, সঙ্গে তুতুনের জন্য তার প্রিয় লাড্ডু। বাক্সটা ব্যাগেই পড়ে আছে। থাক, পড়েই থাক।

ব্রততী মুখ থেকে হাত সরাল,— আজ ক'জনের বাহিনী এসেছিল?

— তুতুনকে নিতে? বললাম তো তোর ছোট দেওর আর ননদ। মমতা পায়ে পায়ে ভেতরে এলেন,—বিশ্বাস কর্, আমি আপত্তি করেছিলাম। বলেছিলাম, তুই নেই, তোকে না জিজ্ঞেস করে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তা তোর দেওর-ননদ দু'জনেই এত করে বলতে লাগল......তোর যে ভাসুর দুবাইতে থাকে সে নাকি এসেছে, আজ খাওয়া-দাওয়া করবে তোদের বাড়িতে.....

দেওর ননদ ভাসুর তোদের বাড়ি শব্দগুলো খটাং খটাং লাগছে কানে। ব্রততী কড়া গলায় বলল,—বার বার দেওর ননদ ভাসুর বলছ কেন? তোমাকে কতদিন না বলেছি ওরা আমার কেউ নয়! ও'বাড়িও আমার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি এইটাই।

— সে তুই যা বলিস। মমতা মাথা দোলাচ্ছেন,—তোর সঙ্গে সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে বলে তারা তুতুনের কাকা-পিসি রইল না এমনও তো নয়।

— তাহলে তুতুনের কাকা-পিসিই বলবে।

— আচ্ছা বাবা আচ্ছা। তাই বলব। ব্রততীর আরেকটু কাছে এগিয়ে এলেন মমতা,—ওদের দেখে মেয়েটা কেমন ছটফট করছিল তা যদি দেখতিস!

ঝাঁ করে আরও তেতে গেল ব্রততী। প্রায় বিকৃত করে ভেংচে উঠেছে,

— দেখে তুমিও গলে জল হয়ে গেলে, তাই তো?

মমতা থমকেছেন। স্থির চোখে দেখছেন মেয়েকে।

ব্রততী আরও হিংস্র হলো,— তুমি কি চাও বলো তো মা? মেয়ে নিয়ে আমি এখানে না থাকি?

— ওমা, সেকি কথা! আমি ও কথা কখন বললাম?

— সব কথা কি বলতে হয়, হাবে-ভাবে বোঝা যায়। ব্রততী ঘাড় নাড়ছে জোর জোর, — ঠিক আছে, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিচ্ছি।

মমতার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল,— ওরকম করছিস কেন খুকু? অন্যায়টা কি বললাম?

— নিজেই ভেবে দ্যাখো।

— না, আমি কিচ্ছু খারাপ বলিনি। মমতার স্বর দৃঢ় শোনাল, —শুধু একটা কথাই আমি মনে করিয়ে দিয়েছি, ওদের সঙ্গে তুতুনের সম্পর্ক অত সহজে ছেঁড়া যাবে না। তুই জোর ফলালেও পারবি না।

মা হয়েও কী নিষ্ঠুরের মতো কথা! হয়তো বা মা বলেই। ব্রততী ঝুম হয়ে গেল। তুতুন যখন এই পৃথিবীতে অতনুর মেয়ে হয়ে জন্মেই গেছে, অতনুর মেয়ে হয়েই থাকবে, এই সত্যিটা ব্রততীর থেকে বেশি আর কে জানে। আর এর বিরুদ্ধেই তো ব্রততীর যত লড়াই-ঝগড়া আইন-আদালত মামলা-মোকদ্দমা। ডিভোর্সের ডিক্রি তো কবেই জুটে যেত, শুধু যদি এই কাস্টডির ফ্যাকড়াটা না থাকত। কত দড়ি টানাটানি, কত থুতু ছেটাছিটি, কত কাদা ছোঁড়াছুড়ি, সবই তো ওই মেয়েকে পাওয়ার জন্যই। কী সিন্ না কোর্টে করেছে অতনু! মেয়েকে নিয়ে চলে আসছে ব্রততী, ছিনিয়ে নিতে চাইছে অতনু। এক পাশ থেকে বাবা টানে, এক পাশ থেকে মা! প্রকাশ্য আদালতে সে কী লজ্জাকর দৃশ্য!

ব্রততীর শরীর শক্ত হয়ে এল,— জোর ফলানোর প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে মা? কোর্ট বলে দিয়েছে মেয়ের বাপ সপ্তাহে একদিন দেখতে পাবে, তাতে আমি কখনও বাধা দিই? তার বেশি ওরা নিয়ে যায় কোন রাইটে? বলতে বলতে মার দিকে টেরচা চোখে তাকিয়েছে, — এর পর থেকে দেখছি মেয়েকে আর এখানেও রেখে যাওয়া চলবে না, ঠিক আছে, এবার থেকে ট্যাঁকে করে অফিসেই নিয়ে যাব।

মমতার মুখ কালো হয়ে গেল,— বেশ তো, এবার থেকে ওরা নিতে এলে দূর দূর করেই নয় তাড়িয়ে দেব। তাতে তোর মেয়ে কাঁদুক, চেঁচাক.....

মমতা চলে গেলেন। ভারী মুখে।

ব্রততীব এবার খারাপ লাগছিল একটু একটু। মমতা নাতনি অন্ত প্রাণ, তাঁর

সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহারটা না করলেই হতো। কি করবে ব্রততী? মাথার ঠিক থাকে না যে।

অফিসের শাড়ি-জামা না বদলেই ব্রততী শুয়ে পড়ল। আলো নিবিয়ে। আঁধার ঘরে মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। কার্তিক শেষ হয়ে এল, পাখার হাওয়ায় শীত শীত করে বেশ। উঠে একটু কমিয়ে দিলে হয়, নড়তে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল ও ঘরে টিভিতে বাংলা খবর শুরু হয়েছে। এর পর একের পর এক সিরিয়াল আরম্ভ হবে, গোগ্রাসে গিলবে মা, অভিমান থিতিয়ে যাবে, দিব্যি কেটে যাবে মার সন্ধ্যেটা। কিন্তু ব্রততীর? মেয়েকে যে পক্ষিণীর মতো আগলে রাখে, যতক্ষণ বাড়ি থাকে ততক্ষণ যে তুতুনকে চোখের আড়াল করে না, অফিস থেকে ফিরেই এমন একটা দুঃসংবাদ শুনলে তার মনের যে কী অবস্থা হয়!

একা ঘরে গলা বুজে আসছিল ব্রততীর। নাহ্, যে যাই বলুক, ব্রততীকে কঠিন হতেই হবে। দরকার হলে জোরই ফলাবে ব্রততী। অতনু যদি গায়ের জোরে একটা সম্পর্ক ছিঁড়ে দিতে পারে, তবে যুদ্ধে জিতেও ব্রততী কেন পারবে না মেয়েকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিতে! সম্পর্ক তো এমনি এমনি গাঢ় হয় না, তাকে ক্রমাগত লালন-পালন করতে হয়। জ্বাল দিতে হয়। সে সুযোগ যদি আদৌ না দেয় ব্রততী। ও বাড়ি না যেতে দিলে, ও বাড়ির কারুর সঙ্গে তুতুনকে দেখা করতে না দিলে, ক'দিন আর তাদের জন্য পা ছড়িয়ে কাঁদবে তুতুন! সে কান্নাও নয় ব্রততী ভুলিয়ে দেবে। তুতুনকে শুধু নিজের মেয়ে করে গড়ে তুলবে। পারবে না? অতনুর অস্তিত্ব কি কোনোভাবেই মুছে দেওয়া যায় না তুতুনের জীবন থেকে!

খুট করে শব্দ হলো একটা। টিউবলাইটের সাদাটে দ্যুতিতে ভরে গেছে ঘর। চোখ কুঁচকে আলোর চাপটা সামলাল ব্রততী। বাবা এসেছে ঘরে।

ব্রততী কাপড় গুছিয়ে উঠে বসল,— কিছু বলবে?

— শুয়ে আছিস যে বড়? শরীর খারাপ?

— উঁহু। ব্রততী হাসার চেষ্টা করল।

— মন খারাপ? মার ওপর রাগ হয়েছে?

ও, শোনাও হয়ে গেছে! মা যে কী, বাবা বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই.....!

কেমিক্যালসের ছোট্ট বিজনেস আছে বিমলের। হাক্লান্ত হয়ে ফেরেন সন্ধ্যেবেলা।

একমাত্র মেয়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় মধ্য পঞ্চাশেই তাঁকে প্রায় বৃদ্ধ

করে দিয়েছে। মাব ওপব তাও হম্বিতম্বি চলে, এই বাবাকে মেজাজ দেখানো যায় না। ব্রততীর ভারী মায়া হয় বাবার মুখখানা দেখে।

চুপ করে থাকা মেয়েব পাশটিতে এসে বসলেন বিমল,— তুই এত অবুঝপনা করিস কেন বল্ তো খুকু?

— কি করলাম আমি? ব্রততী সহজ হতে চাইল।

— মেয়ে এক-দু'ঘণ্টার জন্য গেছে, এখনই ফিরে আসবে। এতে এত উতলা হওয়াব কি আছে?

— উতলা আমি হইনি বাবা। কিন্তু যা আমার পছন্দ নয় তা তো আমি বলবই।

— একটু মানিয়ে নিয়ে চল্ মা। যা হওয়ার তো হয়েই গেছে। পাস্ট ইজ পাস্ট। নতুন করে আর তিক্ততা বাড়িয়ে কী লাভ!

অনেক কথা মুখে চলে আসছিল ব্রততীর। বলতে পারত, তিক্ততা তো আমি বাড়াই না বাবা, বরং ওরাই.....। তুমি জানো, তুতুনের কানে ওরা কেমন বিষমন্তর দেয়! নাহলে আগে যে মেয়ে বাবার কাছে ঘেঁষত না, মা ছাড়া জগতের কিচ্ছু চিনত না, সেই মেয়ে ড্যাংডেঙিয়ে নাচতে নাচতে ও বাড়ি চলে যায়! আর সেটা কোন বাড়ি, না যে বাড়িতে দিনের পব দিন অপমানিত হতে হয়েছে মাকে! অতনুর ভাই-বোন সবাই তো শাগরেদ ছিল অতনুর, একটি দিনের তরেও দাদার ক্রূর আচরণের প্রতিবাদ করেনি কেউ। এখন তারা বাচ্চার মন ভোলাতে আহ্লাদিপনা শুরু করেছে, এও তো শয়তানি। ব্রততীর মা-বাবাকে নিয়েও এক সময়ে কম কথা শুনিয়েছে ও বাড়ির লোক! কোনো কারণ ছাড়াই। সবই তো জানে মা-বাবা। তবু কি করে বলে....! এ বাড়ির কারুর কোনো মানসম্মানবোধ নেই। থাকলে বুঝত ওই চার বছরের মেয়েকে দিয়েই প্রতিশোধের জমি তৈরি করছে ওরা।

ব্রততী কিছুই বলল না। কাকে বলবে? বাবাকে? যে বাবা আগাগোড়া ডিভোর্সের বিপক্ষে ছিল? কাকে বোঝাবে? মাকে? যে মা দিনরাত মিটমাট করে নে, তুতুনকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করিস না বলে বলে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছে, তাকে?

ছোট্ট শ্বাস পড়ল ব্রততীর। অজান্তেই। ও বাড়িতেও সে একা ছিল, এ বাড়িতেও একা। ঘোরতর নিঃসঙ্গ।

মেয়ের শ্বাসটা বুঝি অনুভব করলেন বিমল। উঠে দাঁড়িয়েছেন। নরম গলায় বললেন,— মন খারাপ করিস্ না। আয়, ও ঘবে আয়। অফিস থেকে এসে চা টাও তো খাস্নি শুনলাম। ....আয় আয়।

বিমল চলে যাওয়ার পর বিছানা ছাড়ল ব্রততী। সিন্ ক্রিয়েট করে লাভ নেই। এ বাড়িতে থাকলে এরকমই চলবে। তাকেই উদ্যোগী হয়ে হেস্তনেস্ত করতে হবে কিছু। ব্যাগ থেকে প্যাটিসগুলো বার করল ব্রততী। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তেলতেল করছে বাক্সটা। লাড্ডুগুলোও থেঁতলে গেছে। থেঁতলানো লাড্ডু ফ্রিজে রেখে ব্রততী রান্নাঘরে এল। গ্যাস জ্বালিয়ে চাটুতে প্যাটিস চারটে গরম করে নিয়ে এসেছে বাইরের ঘরে।

টিভির সামনে বসে আছে ব্রততী। কামড় দিচ্ছে প্যাটিসে। বিস্বাদ লাগছে, তবুও। সামনে পর্দায় অর্থহীন কি এক হাসির প্রোগ্রাম চলছে, ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হচ্ছে বাবা-মার মুখ। দেখলেই চোখ করকর করে উঠছে ব্রততীর, তবু সে দৃষ্টি রেখেছে টিভির পর্দায়। হাস্যকৌতুকের পর্ব শেষ হয়ে সিনেমাব গান শুরু হলো। নির্বোধ প্রেমেব লম্ফঝম্পে ভরে যাচ্ছে বোকাবাক্স, ব্রততী দেখছে না কিছুই, শুধু তাকিয়েই আছে। সামনে এখন অসংখ্য রঙ ঝিলমিল ঝিলমিল, ব্রততীর চোখে সবই যেন বর্ণহীন। সবই যেন নীরস।

কেটে যাচ্ছে সময়। চায়ের কাপ শূন্য হলো, প্যাটিসের প্লেট ফাঁকা হলো....., কাটছে সময়। সহসা দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই ব্রততী চমকে উঠেছে। নটা দশ।

— মা, সময়টা দেখেছ?

— হুঁ, নটা তো বেজে গেল।

— তুমি কিন্তু বলেছিলে আটটার মধ্যে দিয়ে যাবে।

— তাই তো বলে গেল।

— আমি জানতাম এটা ঘটবে।

ব্রততী উঠে পড়ল। চঞ্চল পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তার পরে বড় রাস্তা, তাদের তিনতলা থেকে অনেকটা দূর অবধি দেখা যায়। পথে লোক চলাচল কমে এসেছে, বড় রাস্তার হ্যালোজেনের আলো আবছা হয়ে আছে কুয়াশায়। হঠাৎ হঠাৎ গর্জন তুলে ছুটে যায় বাস-মিনিবাস, তারা মিলিয়ে গেলেই আবার নির্জন চারদিক।

কার্তিকের কুয়াশামাখা ওই পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্রততীর বুকটা ছলছল করে উঠল। যদি আর না ফেরে তুতুন! যদি অতনু ওকে রেখে দেয়! শয়তানের বেহদ্দ, সব পারে। কথায় মিছরি ঢেলে ঢেলে হয়তো এমন করে ফেলেছে, মেয়েই আর আসতে চাইছে না। যদি তাই হয়, কি নিয়ে বাঁচবে ব্রততী।

ব্রততীর শরীরের রোম পলকে খাড়া। মাথা ঝিমঝিম কবছে। হঠাৎই শীত

করে উঠল খুব। মেয়ে যদি না ফেরে কি করে নিয়ে আসবে মেয়েকে? এক্ষুনি ছুটবে ও বাড়ি? যদি ওরা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়? থানায় যাবে? পুলিশ ডাকবে? বড়বাবুর নাকের সামনে গিয়ে নাড়াবে কোর্টের অর্ডারটা? পুলিশরা তো এ সবই চায়, খুব মজা পাবে যা হোক। হয়তো দাঁত ছিরকুটে হেসে বলবে, এসব সিলি ব্যাপারে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করা যাবে না ম্যাডাম!

পিছন ঘুরে বসার ঘরের দিকে একবার তাকাল ব্রততী। মা দিব্যি নির্বিকার। বাবা ফিরে ফিরে দেখছে এদিকে। চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে নিল।

কি ভেবে ব্রততী ফিরল বসার ঘরে। অস্ফুটে বলল,— এবার তো আমাদের কিছু করতে হয় বাবা।

বিমল আরেক বার ঘড়ি দেখলেন,— খুব রাত তো হয়নি, আর কিছুক্ষণ দেখি।

— আমার কিন্তু ভাল লাগছে না বাবা।

— তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। আলগা ঝেঁঝে উঠলেন মমতা, — সে তো কোনো চোর-ছেলেধরার সঙ্গে যায়নি। ডাকাত-গুণ্ডার আড্ডাতেও গিয়ে পড়েনি। অত ভাবছিস কেন?

— হুঁহ্ , তুমি যদি বুঝতে। ব্রততীর স্বর তপ্ত থেকে করুণ হয়ে গেল, — বাবা, তুমি একটা কিছু করো।

— কি করি বল্ তো? ফোন করব?

— করে দ্যাখো।

ডায়ালের বোতাম টিপছেন বিমল, পাঁজরে খচখচ শব্দ বিঁধছে ব্রততীর। গলফ্‌গ্রিন থেকে ভবানীপুর কি এমন দূর, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন লক্ষ যোজন। বুঝি বা আকাশের ছায়াপথেরও ওপারে।

ফোন এনগেজড্। একবার নয় পর পর বেশ কয়েক বার চেষ্টা করলেন বিমল। মেযেব কানেও ধরিয়ে দিলেন রিসিভার, দূরাগত ধ্বনি বধির করে দিল ব্রততীকে।

কম্পিত গলায় ব্রততী বলল, — কি হবে বাবা?

— তুইই বল্।

— যাবে সঙ্গে? দু'জনে মিলে গিয়ে দেখব.......?

ঠোঁট টিপে এক সেকেন্ড ভাবলেন বিমল। বললেন,-— যাবি? চল্ ..... আমার পার্সটা এনে দাও তো। আর একটা পাতলা চাদর।

অপ্রসন্ন মুখে মমতা চাদর আর পার্স এনে দিয়েছেন স্বামীকে। গজগজ

করছেন আপন মনে, — যেমন বাপ, তেমন মেয়ে। কারুরই এতটুকু ধৈর্য নেই।

মার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে বাবার পিছু পিছু বেরিয়ে এল ব্রততী। নামছে সিঁড়ি দিয়ে, ধকধক করছে বুক। একই সঙ্গে ঘাম হচ্ছে, শীত করছে, এ এক বিচিত্র অনুভূতি।

রাস্তায় এসে বিমলকে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। দূরের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন কুয়াশা ভেদ করে খুঁজছেন কাউকে। নার্ভাস গলায় বললেন, — ট্যাক্সি ধরব?

— ধরো না। ধরছ না কেন?

— এদিকে এ সময়ে ট্যাক্সি পাওয়াও তো মুশকিল বে। এগিয়ে আনোয়ার শাহ্ রোডের দিকে যাই চল্।

— চলো। দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে!

পিতা-পুত্রী দশ পাও এগোয়নি, উল্টো দিক থেকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসা ট্যাক্সি শব্দ করে ব্রেক কষল। দরজা খুলে গেল। নেমে এসেছে তুতুন। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে হাত নাড়ছে অতনু। মেয়েও ফিরে ফিরে টা টা করছে বাবাকে।

স্টার্ট নিল ট্যাক্সি। হুশ করে হারিয়ে গেল কুয়াশায়।

মেয়েকে প্রায় খামচে ধরেছে ব্রততী, — এত দেরি করলি কেন?

বাবা-মার বিচ্ছেদ তুতুনকে চার বছর বয়সেই অনেক সেয়ানা করে দিয়েছে। চোখ ঘুরিয়ে বুদ্ধিমতীর মতো উত্তর দিল সে, — সরি মা। কারুর দোষ নেই। আমিই বুবলু-টুকুনের সঙ্গে খুব খেলা করছিলাম।

কাকে আড়াল করে তুতুন? বাবাকে? বাবার ওপর টানটাকে? নাকি নিজেকেই? সান্ত্বনা দিচ্ছে তুতুন, না কাটা ঘায়ে নুন ছিটোচ্ছে?

মনে মনে ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল ব্রততী। রাতে মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, — হ্যাঁ রে তুতুন, আমি আর তুই যদি দূরে কোথাও চলে যাই, কেমন হবে বল্ তো?

— কোথায় মা?

— দূরে কোথাও। দার্জিলিং-দিল্লি যেখানে হোক।

— বেড়াতে যাবে? কত দিন থাকব?

— ধর্ সারা জীবন। তুই যদ্দিন না বড় হোস।

— আর তোমার অফিস?

— সেখানেও একটা কাজ জুটিয়ে নেব।

অন্ধকারে চুপ করে রইল তুতুন। তারপর বলল, — কেন মা?

, — এমনি। এখানে আমার ভাল্লাগছে না। সেখানে গিয়ে শুধু তুই আর আমি থাকব।.. ... খুব মজা হবে, না?

আবার চুপ করে আছে মেয়ে। অনেকক্ষণ।

— কি রে, কিছু বলছিস না যে?

— আমরা চলে গেলে দাদু-দিম্মার কষ্ট হবে না?

— হবে। কী করা যাবে।

— তোমার দাদু-দিম্মার জন্য মন কেমন করবে না?

-- করবে।

— কাব জন্য বেশি মন কেমন করবে? দাদু, না দিম্মা?

— ওমা সেকি কথা! দু'জনের জন্যই মন কেমন করবে।

তুতুন একদম চুপ কবে গেল। এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। যেন নিশ্বাসও নিচ্ছে না, এমনই নীরব।

নিজের কথাগুলোই কোন অদৃশ্য পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঝনঝন করে উঠল ব্রততীর কানে। মেয়ের প্রশ্নে কিসের ইঙ্গিত? কি উত্তর দিল ব্রততী? বাবা-মা দু'জনের জন্যই সমান কষ্ট পাবে ব্রততী, অথচ মেয়ে শুধু মাকে নিয়ে ঝলমল করবে খুশিতে, এ ব্রততীর কেমন ধারার প্রত্যাশা?

এই আঁধারে সবই গোপন তবু তার মধ্যেও নিজের মনের লুকোনো চেহারাটা কী বিশ্রী কদর্য লাগছে। কেন এত হীন হয়ে যাচ্ছে ব্রততী! ঈর্ষা? প্রতিহিংসাপরায়ণতা? ক্ষোভ? পুঞ্জীভূত অভিমান? কাব কাছ থেকে দূরে পালাতে চায় ব্রততী!

অসাড়ে চোখ দিয়ে জল ঝরছিল ব্রততীর। সে নিজেই যাকে ভুলতে পারেনি, মেয়ে তাকে ভুলবে কেমন করে!

ফেরা

কাউন্টারে বসে ঘাড় গুজে কাজ কবছিল কমলেন্দু। রুটিন কাজ, ডিপোজিট স্লিপ নিয়ে লেজারের পাতায় পাতায় পোস্টিং করে যাওয়া। তাদের ব্যাংকের এই ব্রাঞ্চটা ছোট, কিন্তু ব্যস্ত খুব। দিনের কাজ দিনে না শেষ করলে স্লিপের পাহাড় জমে যায়।

—কমলেন্দুবাবু, আপনার ফোন। অ্যাকাউন্টেন্ট হীরেন রায়ের গলা।

কমলেন্দু ঈষৎ অবাক হল। এ সময়ে কে ফোন কবছে! জয়ন্ত? দেবু? বাড়ির ফোনটা তো ষোল দিন ধরে মরা, জ্যান্ত হল! খবর দিচ্ছে মাধবী? বড় ভায়রা হলেও হতে পারে। পনেরোই আগষ্ট তিন দিনের জন্য চাঁদিপুর যাবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে, টিকিট ফিকিট করে ফেলল?

উঠে এসে রিসিভার ধরল কমলেন্দু, —হ্যালো!

—কে, কমলেন্দু?

—স্পিকিং।

—বিল্টু, আমি রাঙাদা বলছি। শোন্, কাল রাতে মার.....

ও প্রান্ত একটু থেমে গেল। সামান্য নাড়া খেয়ে গেল কমলেন্দু, —কি হয়েছে পিসির?

—সেবিব্রাল অ্যাটাক। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর। অবস্থা খুব সিরিয়াস। সেন্স তো ছিলই না, সকালে ঘন্টা খানেকের জন্য একটু জ্ঞান মতো ফিরেছিল। খুব বিল্টু বিল্টু করছিল তখন.....তোকে বার বার দেখতে চাইছিল.....

বিশ্রী ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে টেলিফোনে, কিছুই আর প্রায় শোনা যায় না। কমলেন্দু গলা ওঠাল,—হ্যালো রাঙাদা, একটু জোরে বলো। পিসি এখন কেমন আছে?

' খুব আবছা স্বর শোনা যাচ্ছে। একটি শব্দও বোঝা গেল না। ক্রেডলটাকে জোরে জোরে খটখট করল কমলেন্দু, তবুও না। খুট করে লাইনটা কেটে গেল। ঝিঁঝিব ডাক।

কমলেন্দু কয়েক পল হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে। কোথ্‌থেকে ফোন করছিল রাঙাদা? জ্যোতিপুর পোস্ট অফিস থেকে? নাকি সহদেব বেরাদের বাড়ি থেকে? আবার কি এখুনি করবে?

হীরেন রায় চোখ কুঁচকে দেখছে,—কি খবব কমলেন্দুবাবু? খারাপ কিছু? কে ফোন করছিলেন?

কমলেন্দু হতভম্ব মুখে তাকাল,—আমার দাদা। পিসতুতো দাদা। বলছিল পিসির অবস্থা নাকি....লাইনটা কেটে গেল।

—পিসি.....মানে আপনার আপন পিসি?

মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ল কমলেন্দু। বাবার জাড়তুতো বোনকে কি আপন পিসি বলা যায়? আবার সুধাপিসিকে আপন ছাড়া দূরের কেউ বলেও কি ভাবা সম্ভব? কমলেন্দু আলগা ঘাড় নাড়ল,—হ্যাঁ, আপন পিসিই.....প্রায়। দেশে থাকেন।

—দেশ? তার মানে.....

—জ্যোতিপুর। ঘাটাল সাবডিভিশান।

ফোনটা আর আসছে না। লাইন পাচ্ছে না বোধহয়। পায়ে পায়ে কাউন্টারে ফিরে এল কমলেন্দু। থুম হয়ে বসে আছে চেয়ারে। কি করবে এখন? যাবে নাকি জ্যোতিপুর? এখনই রওনা দিলে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। কি আর এমন দূর! হাওড়া থেকে বাগনান সওয়া ঘন্টা মতো, সেখান থেকে বাস ভুটভুটি ভ্যানরিক্সা মিলিয়ে বড় জোর আরও ঘন্টা দেড়েক। আজ গিয়ে সহজেই কাল সকালে চলে আসতে পারবে।

ধুস্‌, হুট বললেই যাওয়া যায় নাকি! উনচল্লিশ বছর বয়সে এই ছেলেমানুষি মানায় না। মাধবীর সঙ্গে পরামর্শ করা হল না, রিন্টি বুবাই জানল না, ...। কাল সকালে গেলেও তো হয়। মাধবীরাও যদি চায় সঙ্গে যাবে।

কিন্তু রাঙাদা যা বলল তাতে মনে হয় পিসির এখন তখন দশা। কাল অবধি কি থাকবে পিসি? যদি না থাকে?

প্রায় সাড়ে তিন বছর গ্রামে যায় নি কমলেন্দু। যতদিন বাবা বেঁচে ছিল, ততদিন পর্যন্ত নাড়ির টান ছিল একটা। কিম্বা হয়তো ঠিক নাড়ির টানও নয়, কর্তব্যের টান। বাবা একা একা গ্রামের বাড়িতে পড়ে আছে, পিসি পিসতুতো

দাদারা দেখাশুনা করে....একটা অপরাধ বোধও বুঝি খোঁচা মারত বুকে। তিনি গেলেন দায়ও সব চুকে গেল। জমিজমা বাড়িঘর বিক্রিবাটা সারা, রাঙাদা মতিদারাই কিনে নিয়েছে, কমলেন্দুরা তিন ভাই বোন ভাগ করে নিয়েছে টাকাকড়ি। জ্যোতিপুরের জন্য পিছুটান শেষ। পিসির চিঠি আসে মাঝে মাঝে। অনন্ত অভিমানে মাখা কাঁপা কাঁপা অক্ষর। তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে বে বিল্টু। কবে মরে যাব, একবার আয় না। বুড়ি পিসিটাকে কি ভুলেই গেলি!

হয় না যাওয়া। সংসার। কাজ। অফিস। ছেলেমেয়ের পড়াশুনো। দেশগাঁয়ে পা মাড়াতে গায়ে জ্বর আসে বাড়ির লোকের। নিজেরই সৃষ্টি করা জালে নিজেই এমন ভাবে জড়িয়ে থাকে মানুষ!

বুকের ভেতর কি যেন একটা কুট কুট কামড়াচ্ছে। কী যে! রাঙাদার শেষ কথাগুলো? ....তোকে বার বার দেখতে চাইছিল. ..!

তিনটে দশ। এখনও সময় আছে, কমলেন্দু ঝটিতি ডিপোজিট স্লিপগুলো এনট্রি করে ফেলল খাতায়। বড্ড গুমোট আজ, বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এল একটু। অ্যাকাউন্টেন্টের টেবিল থেকে রিঙ্ করল সামনের ফ্ল্যাটে।

—হ্যালো বউদি, একটু মাধবীকে ডেকে দেবেন?

—ধরুন।

ধরে আছে ফোন। নিঃসীম নৈঃশব্দ্য। কমলেন্দু কথা গোছাচ্ছিল। কি ভাবে বলবে মাধবীকে? অফিস থেকে সোজা চলে যাওয়া কি বাঁকা চোখে দেখবে মাধবী? মোটেই না। মাধবী অত অবুঝ নয়। সে জানে সুধাপিসি কমলেন্দুর কতটা আপন। কমলেন্দুর জন্মের পর পরই মার বিকলাই হয়েছিল, এই সুধাপিসি বুকের দুধ খাইয়েছিল কমলেন্দুকে, এ গল্প মাধবীর বহু বার শোনা। তার শেষ সময়ে কমলেন্দু ছুটে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক।

মহিলা ফিরে এসেছে,—মাধবী তো নেই। বুবাইকে স্কুল থেকে নিয়ে এখনও ফেরে নি।

সর্বনাশ, কি করে এখন! বাড়ি ঘুরে যাবে? ভবানীপুর থেকে গড়িয়া মিনিট চল্লিশেক লাগে, পাঁচটার আগে বাড়ি থেকে রওনা হওয়া যাবে কি? দেরি হয়ে যাবে না?

কমলেন্দু মরিয়া স্বরে বলল, —কাইন্ডলি একটা ইনফরমেশান দিয়ে দিতে পারবেন? ....আমি এক্ষুনি একবার দেশে চলে যাচ্ছি। মানে যেতে হচ্ছে। মাধবীকে বলবেন জ্যোতিপুরে সুধাপিসির কণ্ডিশান খুব খারাপ....অফিসে খবর এসেছিল....কাল ফিরব।

—ও। ......আচ্ছা। ... হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলে দেব।

—প্লিজ।

টেলিফোন রাখল কমলেন্দু। হীবেন রায়কে বলে বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। বাইরে শ্রাবণের ধূসর আকাশ, সেদিকে দেখল একটুক্ষণ। পার্স বার করে টাকা গুনল। দেড়শো মত আছে, অসুবিধে হবে না। ট্যাক্সি নিলে হয়। একটু সময় বাঁচে।

ভাবতে ভাবতেই একটা চলমান ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়েছে কমলেন্দু, —হাওড়া স্টেশন।

মন্থব হয়েও গতি বাড়াল ড্রাইভার। থামল না।

পব পর তিনটে ট্যাক্সি চলে গেল। কেউ এখন হাওড়া স্টেশন যাবে না। বিবক্ত কমলেন্দু অবশেষে মিনিবাসে। চলছে বাস। ভিড় বাস। হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কমলেন্দু। পার্ক স্ট্রিট মোড়ে এসে বাস থেমে গেল। থেমেই আছে। সামনে মিছিল। কি নিয়ে মিছিল ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল কমলেন্দু, বুঝতে পারল না। হুঁশিয়ার, চাই, ভেঙে দেব, গুঁড়িয়ে দেব, ঠিকরে ঠিকরে আসছে। পাঁচ মিনিট ..দশ মিনিট। কমলেন্দু অধীর। ঘড়ি দেখছে। বিরক্ত হয়ে নেমে পড়তে যাচ্ছিল, ছেড়েছে বাস। শামুকের গতিতে এগোচ্ছে।

হাওড়া স্টেশন পৌঁছতে পাঁচটা বেজে গেল। বাগনানের টিকিট কাটার সময়ে মন খচ খচ করছিল কমলেন্দুর। মাধবীর সঙ্গে একবার মুখোমুখি কথা বলে আসতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। বিনা নোটিশে চলে আসার অস্বস্তিটা এখন এঁটুলির মতো লেগে থাকবে গায়ে। ফিরে যাবে? কাল ভোরে না হয়...।

স্টেশনে বিজবিজে ভিড়। হকার কুলি ভিখিরি বাড়িমুখো মানুষ। কাজের লোক, অকাজেব লোক। এক সময়ে কমলেন্দুও এই লাইনের ডেলি প্যাসেঞ্জার ছিল, পাক্কা তিন বছর জ্যোতিপুর থেকে যাতায়াত করেছে কলকাতায়। দীর্ঘ অনভ্যাস হেতু এ সময়ের স্টেশনকে এখন জঙ্গল বলে ভ্রম হয়। রহস্যময়। শ্বাপদসংকুল। তারই মধ্যে শুনতে পেল মেচেদা লোকাল হুইসিল দিচ্ছে। দৌড়ল কমলেন্দু, আটকে আটকে যাচ্ছে জানজটে। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে মিলিয়ে গেল ট্রেন।

সময় চলে যাচ্ছে। বিভ্রান্ত কমলেন্দু এখন ইলেকট্রনিক বোর্ডের সামনে। পরের ট্রেন খড়্গাপুর লোকাল, ছাড়তে আরও সতেরো মিনিট। অসংখ্য ধ্বনি তালগোল পাকিয়ে বিচিত্র এক গর্জন তুলছে চারদিকে, কান মাথা ঝিম ঝিম করে। স্টল থেকে সিগারেট কিনে ধরাল কমলেন্দু। অনেকক্ষণ পর মস্তিষ্কে

ছড়িয়ে গেল ধোঁয়া, ফুসফুসে পাক খাচ্ছে। রাঙাদারা কি দাদা দিদিকেও খবর দিয়েছে? দাদা মেদিনীপুরে, দিদি আরামবাগ, তাবা কি আসবে? সে'ই বা এমন তালবেতাল ছুটে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ, একথা ঠিক দাদা দিদির চেয়ে তাব সঙ্গে পিসির সম্পর্ক অনেক গভীর ছিল। হয়তো পিসির বুকেব দুধ খেযে সে বেঁচেছিল বলেই। কিন্তু সেটুকুই কি শুধু কারণ! পিসির আকুল চিঠির উত্তবে প্রতিবাবই লিখেছে, সময় পেলেই যাব। আজ অবশেষে সেই সময় এল! না গেলে কি হয়? পিসি হযতো এখন বোধবুদ্ধির বাইরে, তাকে চিনতেও পাববে না, তবে কেন সে...!

চিন্তা এগোতে পারল না। সম্ভাব্য খড়্গপুর লোকাল প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। পিলপিল মানুষ ধেয়ে গেল। আছড়ে পড়ছে কামরায, সঙ্গে কমলেন্দুও। গুঁতোগুতি করে অতি কষ্টে বসার জায়গাও করে নিল একটা। জানলার ধারের দ্বিতীয় সিট, হাওয়া আসছে না, বসে ঘামছে দরদর। তবু নিশ্চিন্দি, আর বড় জোর ঘন্টা আড়াই। আটটা নাগাদ পৌঁছে যাবে।

গাড়ি দুলে উঠল। ঝমর ঝমর শব্দ তুলে পেরিয়ে যাচ্ছে শহরতলি, অতিকায় অজগরের মতো। মৌরিগ্রাম পার হতে একটু বুঝি বাতাস এল কামরায়, জুড়িয়ে এল শরীর।

বিকেল ফুরিয়ে আসছে। সূর্যহীন আকাশে মলিন আলো। বাড়ি ঘর কমে আসছে ক্রমশ, দু ধারে অনেক সবুজ এখন। ধানক্ষেত। গাছপালা। সবই যেন কেমন ছায়ামাখা, ম্রিয়মাণ। তবু ভিড় থসথস বাতাসহীন কামরা থেকে বাইরে তাকালে ভারী আরাম হয় চোখের। আন্দুল পেরিয়ে গেল, সাঁকরাইল আসছে। এর পর আবাদা নলপুর বাউরিয়া চেঙ্গাইল...। পর পর সব স্টেশনের নাম মুখস্থ কমলেন্দুর। শুধু ডেলি প্যাসেঞ্জারি করত বলে নয়, এই সাড়ে তিন বছরেও এ পথ দিয়ে কি কম বার গেছে! দু বার পুরী, একবার ম্যাড্রাস, একবার বম্বে গোয়া, নয় নয় করে বার আষ্টেক শালীর বাড়ি জামসেদপুর। গত শীতেই তো বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘাটশিলা গালুডি বেড়িয়ে এল।

মনে পড়তেই ছোট্ট এক পিন ফুটেছে বুকে। বাগনান মাড়িয়ে এত বার গেল এল, একবারও তো পিসিকে দেখতে যাওয়ার কথা মনে আসে নি কমলেন্দুর! ঘাটশিলা থেকে ফেরার সময়ে বম্বে এক্সপ্রেস কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বাগনানে, রিন্টি বুবাই গরম সিঙ্গাড়া খেল, কি একটা ম্যাগাজিন কিনল মাধবী, জলের বোতল ভরতে নীচে নামল কমলেন্দু, তখনও তো কই পিসির কথা স্মরণে আসে নি! তখনও রিন্টি বুবাইএর স্কুল খুলতে দু দিন বাকি, একবার

জ্যোতিপুর ঘুরে যাওয়াই যেত। সময় না পাওয়াটা নেহাতই আত্মপ্রবঞ্চনা। আলস্য। ঔদাসিন্য।

কাকে মিথ্যে সময়ের অজুহাত দেখাস্ কমলেন্দু?

বাইরে আঁধার চাদর বিছোচ্ছে। বুকের ভেতরটা মেঘলা হয়ে আসছিল কমলেন্দুব। কামরার কোলাহল আর ছুঁতে পারছে না তাকে, স্পষ্ট টের পাচ্ছে একটা স্যাঁতসেঁতে হাওয়া দখল নিচ্ছে বুকটার। চোখ বুজে পিসির মুখ মনে করাব চেষ্টা করল। সাড়ে তিন বছর আগের মুখ। রোগাটে লম্বা চেহারা, একটু বুঝি পাকানো। গাল দুটো কি একটু ভাঙা ভাঙা ছিল পিসির? কপালে আঁকিবুকি? মনে পড়ছে না। অন্য একটা মুখ চলে আসছে চোখের পর্দায়। চৌষট্টি বছরের পিসি নয়, বত্রিশ বছরের পিসি, চৌত্রিশ বছরের পিসি। বেতসলতার মতো ছিপছিপে শরীর, একটু চাপা গায়ের রঙ্, মাথাভরা এক ঢাল চুল, বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। নাকে সাদা পাথরের নাকছাবি পরত পিসি, আলো পড়লে ঝিক মিক রঙ ছড়াত। ভারী মিষ্টি একটা গন্ধও লেগে থাকত পিসির গায়ে। ফুলেল তেলেরও নয়, স্নো ক্রিম পাউডারেরও নয়, সুগন্ধী সাবানেরও নয়, সে এক অন্য সুবাস। পিসির বুকে মুখ রাখলে গন্ধটা কমলেন্দুর ভেতর অবধি ছড়িয়ে যেত। জ্যোতিপুরেই বিয়ে হয়েছিল পিসির, এ পাড়া ও পাড়া। ছোট্ট বিল্টু, যে তখনও কমলেন্দু হয়ে ওঠে নি, সকাল থেকে পড়ে আছে পিসির বাড়ি। পিসির কাছে খাওয়া, পিসির কাছে স্নান, পিসির কাছে ঘুম। রাতেও কতদিন বাড়ি ফেরে নি। মা বলত, কদিন দুধ দিয়ে সুধা আমার ছেলেটাকে গুণ করে ফেলেছে। পিসির মেয়ে বিন্তি, যে কিনা তার্ থেকে সাকুল্যে তিন দিনের বড়, হিংসেয় মটমট করত ছোটবেলায়। অ্যাই, তুই রোজ রোজ আমার মার পাশে শুবি কেন রে! ক্লাস ফাইভে উঠে হোস্টেলে চলে গেল কমলেন্দু। ছুটি পড়ার কদিন আগে থেকেই মন আনচান, এবার না জানি তার জন্য কি কি বানিয়ে রেখেছে পিসি! তিলের নাড়ু , ক্ষীর নারকেলের সন্দেশ, নিমকি, গজা.....! বিল্টু খেতে ভালবাসে!

বাবার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর মাধবী রিন্টি বুবাইকে নিয়ে যখন রওনা দিচ্ছে কমলেন্দু, তখনও না হাতে এক কৌটো নারকেল নাড়ু ধরিয়ে দিল পিসি! ধবধবে সাদা থানের আঁচলে চোখ মুছছে। মাঝে মাঝে আসবি তো বিল্টু!

কুলগাছিয়া ঢোকার মুখে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে। পাওয়ার নেই। ঝুম অন্ধকারে বসে আছে কমলেন্দু। ভিড়ের মাঝে একা হয়ে। সহসা পিসির জন্য তীব্র এক টান অনুভব করছিল সে। প্রতিটি সেকেণ্ডকে এক একটা ঘন্টার মতো দীর্ঘ

মনে হচ্ছে। আশপাশের লোক অধৈর্য হয়ে খিস্তি খেউড় করছে রেল কোম্পানীকে। অসহিষ্ণু কমলেন্দুও ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। ভুল হয়ে গেছে। এতদিনেও একবারও পিসির কাছে না যাওয়াটা অন্যায়। পৌঁছতে পারবে তো ঠিক সময়ে!

ঠিক সময়টা কি! মৃত্যুর আগে হাজিরা দেওয়া!

ঝাড়া চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল গাড়ি। বাগনানে ঢুকল পৌনে আটটায়। স্টেশনের গায়ে বাসস্ট্যাণ্ড, ত্বরিত পায়ে ওভারব্রিজ টপকে এল কমলেন্দু। স্ট্যাণ্ড ফাঁকা। বাস নেই। আধো আলো আধো অন্ধকারে এদিক ওদিক মানুষেব জটলা। হাটুরে মানুষই বেশি, কারুর তেমন কোন তাড়াহুড়ো নেই। গল্প করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এক সভ্যভব্য লোক দেখে কমলেন্দু তাকে প্রশ্ন করল,—মানকুর ঘাটের বাস কখন আসবে?

—আসবে কি? লোকটার মুখে এক রাশ বিরক্তি,—বাইনান মোড়ে কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। লোকজন ড্রাইভার কণ্ডাকটরকে পিটিয়েছে খুব। ওনারা এখন বাস নিয়ে থানায় ধর্না দিয়ে বসে আছেন।

—সর্বনাশ। কমলেন্দু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, —তাহলে আমার কি হবে?

—সবার যা হবে আপনারও তাই হবে। লোকটা কমলেন্দুর আপাদমস্তক জরিপ করল,—যাবেন কোথায়?

—ওপারে। জ্যোতিপুর।

—দুধকুমড়া হয়ে?

ঘাড় নাড়ল কমলেন্দু।

—একটা ভ্যান-ট্যান ধরে নিন। দেখুন যদি শেয়ারে লোক-টোক পান।

আলগা পরামর্শ ছুঁড়ে দিয়ে দূরে সরে গেল লোকটা। কমলেন্দু আবার একা। মনে মনে হিসেব কষছে। ভ্যান রিক্সায় মানকুর ঘাট কম করে ঘন্টা খানেক। নটা সওয়া নটা তো বাজবেই। বেশ রাত হয়ে যাবে জ্যোতিপুর পৌঁছতে। মনে পড়তেই পেটে চিনচিন ক্ষিধের অনুভূতি। কোন্ দুটোর সময়ে টিফিন করেছে, তারপর তো আর একটা দানাও পেটে পড়ে নি, নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকাচ্ছে ভেতরে। দেরি যখন হয়েছেই, এখানেই খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিলে হয়। পিসির বাড়ি গিয়ে রাতদুপুরে কি জুটবে কিছু?

পুরনো স্মৃতি দুলে এল সহসা। সেবার স্কুলের সেক্রেটারি মারা গেল হঠাৎ।

দিনটা ছিল শুক্রবার, সোমবারও কি কারণে যেন ছুটি ছিল, হোস্টেল থেকে চলে এসেছে কমলেন্দু। বাত দশটায় পৌঁছেই ক্ষিধে তেষ্টায় ছটফট করছে। মা ঝেঁঝে উঠল,—অত তাড়া লাগালে চলে! ভাতটা ফোটানোর সময় তো দিবি!

চোদ্দ বছরের অধৈর্য কমলেন্দু এক দৌড়ে পিসির বাড়ি। পলকে ভাতের থালা হাজির। সামনে পিঁড়ি নিয়ে বসেছে পিসি, —তোর জন্য বারো মাস আমার দু মুঠো চাল রাঁধা থাকে রে বিল্টু। শুধু সব্‌জিতে হবে, না একটা ডিম ভেজে দেব?

সেই পিসি এখনও তার প্রতীক্ষায়। কিন্তু অন্য ভাবে। অন্য রূপে।

দীর্ঘশ্বাস চেপে বাজারের দিকে এল কমলেন্দু। শহরটা হাতের তালুর মতো চেনা। এখানেই তার কলেজ জীবন কেটেছে। রায়দের হোটেলে রান্নাটা ভাল, সেখানে ঢুকে চটপট দু-গরাস্ খেয়ে নিল। বেরিয়ে ভ্যানরিক্সার দর করবে কি করবে না ভাবছে, বাসস্ট্যাণ্ডে শোরগোল।

বাস আসছে। যাবে মানকুর।

এল বাস। হেলতে দুলতে। মুরগিঠাসা হয়ে ছাড়ল প্রায় নটায়। রুটের শেষ বাস। যেখানে থামছে, সেখানেই থেমে থাকছে। শেষ যাত্রীকে নামিয়েও নড়ে না। আধ ঘন্টার পথ পেরোতে ঘন্টা কাবার।

মানকুর ঘাট। রূপনারায়ণের তীরে ছমছমে অন্ধকার। ডিঙি নৌকো নেই, একটা মাত্র ভুটভুটি নিরাসক্ত ভাবে দুলছে ঘাটের কিনারে।

আট দশ জন লোক ওপারে যাবে। তাদের সঙ্গে পায়ে পায়ে ভুটভুটির দিকে এল কমলেন্দু।

একজন প্রশ্ন করল,—কখন ছাড়বে গো?

—আসেন না। ...বসেন। হালের পাশে বসে থাকা লোকটা বিড়ি ধরাল।

কমলেন্দু আশ্বস্ত হল। আর বড় জোর ঘন্টা খানেক।

মেশিন বসানো নৌকোর গলুই-এ বসেছে যাত্রীরা। নদীর বুক থেকে হাওয়া উঠছে মাঝে মাঝে। ভিজে ভিজে। তারাহীন আলোবিহীন মাসিকৃষ্ণ আকাশটার দিকে ক্ষণিকের জন্য চোখ গেল কমলেন্দুর। এতক্ষণে ধকলটা জুড়োচ্ছে যেন, বুজে আসছে চোখের পাতা।

মৃদু হট্টগোল। তন্দ্রা ছুটে গেল। নৌকোর লোকটা তাদের বসিয়ে রেখে কোথায় যেন গেছে, ফিরছে না। কয়েকজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ, গজগজ করছে সরবে। একটা ছোকরা মতন ছেলে লাফিয়ে নৌকো থেকে নেমে গেল। মিনিট দশেক পর নৌকো চালককে নিয়ে ফিরেছে।

গা মোচড়াচ্ছে ভুটভুটি চালক,—তাড়া কিসের কর্তাবা? একটু জিরোন না।

ছোকরা তেড়ে উঠল, -র.সকতা হচ্ছে? আমাদের বাড়ি ঘরদোর নেই?

—তা তো আছে। কিন্তু যাবেন কি করে? দেখছেন না কেমন ভাটির টান? আজ অমাবস্যা, এর পরই বান আসবে।

—সে তো আসবে রাতদুপুরে।

—মনে হয় না। আধ ঘন্টার মধ্যেই....

কথা শেষ হওয়ার আগেই চেল্লামিল্লি শুরু কবে দিয়েছে যাত্রীরা, নৌকো ছাড়ার জন্য জোরাজুরি করছে। এসব ঝুট ঝামেলা সচরাচর পছন্দ করে না কমলেন্দু, কিন্তু এই মুহূর্তে সকলের ব্যগ্র ভঙ্গি ছুঁয়ে যাচ্ছিল তাকেও। যেন সকলেই এক সুরে তাবই হৃদয়েব কথার প্রতিধ্বনি তুলছে।

ভুটভুটি চালক প্রায় বাধ্য হয়ে নেমে এসেছে নৌকোয়, মেশিনে স্টার্ট দিল। নৈশ আঁধার যান্ত্রিক গর্জনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, নদীর জল ছটফট করে উঠল। পাড় থেকে সরে গেল নৌকো।

জল কাটছে ছলাৎ ছল। ছিটকে ছিটকে উঠছে জলরেণু, আর্দ্র হয়ে যাচ্ছে মুখচোখ। আবার বাড়ির কথা মনে পড়ছিল কমলেন্দুর। দূর বহুদূর কলকাতার কথা। কি হচ্ছে এখন ফ্ল্যাটে? কি করছে রিন্টি বুবাই? মাধবী কি ওদের আজ তাড়াতাড়ি খাইয়ে শুইয়ে দিল? বুবাই এক রাতও বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, মামার বাড়ি গেলে ফিরে আসার জন্য ছটফট করে। সে কি আজ মুখ ভার করে বসে আছে? নাহ্, দুম করে আবেগের বশে বেরিয়ে পড়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। কাল ধীরেসুস্থে এলেই হত। সত্যি যদি তেমন কিছু ঘটে গিয়ে থাকে, তবে এখন মাঝরাতে পৌঁছনোও যা, কাল দুপুরে পৌঁছনোও তাই। আর যদি পিসি সামলে নিয়ে থাকে, তবে এখন গিয়ে বাড়িশুদ্ধু সকলকে খালি বিব্রতই করা।

চিন্তার মাঝেই ভুটভুটির আওয়াজ থেমে গেছে। মাঝগাঙে এসেছে নৌকো, দু দিকে নিকষ অন্ধকার। বিন্দুর মতো একটা আলোকরেখা দেখা যায় দূরে। দুধকুমড়া ঘাটের। ওই আলোটুকু অন্ধকারকে যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে শতগুণ।

কে যেন হেঁকে উঠল —হল কি? থামলে কেন?

আঁধারই যেন উত্তর দিল। জলদ্‌গম্ভীর স্বর,—বান আসছে।

নৌকো একদম নিঃশব্দ হয়ে গেল। পাটাতন কাঁপছে তিরতির। অনেক অনেক দূর থেকে, যেন শৈশবেরও ওপার থেকে একটা চাপা গুমগুম ধ্বনি

এগিয়ে এল। কাছে আসছে ক্রমশ, আবও কাছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতব হল আগুযান জলোচ্ছ্বাস।

কমলেন্দু বসে আছে স্থিব। নিস্পন্দ। নিজেব বুকেব ভেতবই শব্দটা বাজতে শুরু কবেছে এবাব। মাঝনৌকোয দুলে উঠল কমলেন্দু, দু-পাড ছুঁযে চলে যাচ্ছে বান। অন্ধকাবে দেখা যায না, তবু তাব সবব উপস্থিতি নাড়িয়ে দিল কমলেন্দুব হৃৎপিণ্ড।

জলেব আওযাজ অন্ধকাবেই মিলিয়ে গেল। এবাব কি ছাডবে নৌকো? কমলেন্দু পৌঁছবে ওপাবে?

এক সমযেব অভ্যস্ত তিন ঘন্টাব পথ বড বেশি দীর্ঘ হযে গেছে আজ। বড বাধাসঙ্কুল। দ্বিধাময। চাইলেই কি আব উজান স্রোতে ফেবা সহজ হয এখন।

এই ঊনচল্লিশ বছব বযসে।

রামধনু রং

মাত্র তিন মিনিটের জন্য বাথরুমে গিয়েছিল তপতী। দুপুর থেকে গজগজ করছে মনোর মা। ঝাঁঝরিতে নাকি জল আটকে থাকছে, তার সরেজমিন করতে। তার মধ্যেই পাপু ঘর থেকে উধাও।

এক সেকেন্ডও কি চোখের আড়াল করার উপায় নেই! হরিণ-পায়ে তপতী প্যাসেজে এল। যা ভয় পেয়েছে তাই, সামনে বেতের মোড়া গড়াগড়ি খাচ্ছে, ফ্ল্যাটের দরজা হাট। ছিটকিনিতে এখনও হাত পায় না পাপু, তাই মোড়া টেনে....।

গেল কোথায়!

তপতীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে গেছে? মনে হয় না। সাড়ে চারটে বাজে, রিন্টি মিন্টির টিউটর এসেছে এখন, ওখানে গিয়ে পাপুর এ সময়ে খুব সুবিধে হবে না। দোতলা তিনতলায় পাপুর কোন সমবয়সী নেই, চারতলায় গেলেও যেতে পারে। ভাবতে ভাবতে বিল্ডিং-এর সামনের ছোট্ট লনেও একবার উঁকি দিয়ে নিল তপতী। ফালি জায়গাটা শুনশান, প্রথম ফাল্গুনের নরম রোদ্দুর, একা একাই খেলা করছে ঘাসবিহীন লনে। ছাদে যায় নি তো? মনে হতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। যেতে পারে। ইদানীং পাপুর খুব ছাদে যাওয়ার পা হয়েছে। আট ফ্ল্যাটের আটখানা অ্যান্টেনা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সিমেন্টের ট্যাংকের ওপর উঠে যায়, কার্নিশ ধরে বিপজ্জনক ভাবে ঝোঁকে নীচের দিকে।

ভাবতে বুকটা আরও গুমগুম। দরজা টেনে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে তপতী। ছাদে পৌঁছে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আছে বটে ছেলে, তবে

কোনও অপকর্ম করছে না। ঠিক মধ্যিখানটায় দাঁড়িয়ে দু'-পকেটে হাত ঢুকিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

তপতী দম নিল একটু। কড়া গলায় ডাকল,— পাপু?

তিন বছর পাঁচ মাসেব পাপু প্রাজ্ঞ ভঙ্গিতে মাকে দেখল একবাব। আবাব চোখ আকাশের দিকে। তপতী গলা চড়াল, — ব্যাপাব কী তোর? পুট করে পালিয়ে এসেছিস যে? কত দিন না বলেছি যখন তখন ছাদে উঠবি না?

— তুমি তো পড়াচ্ছিলে না, ঝাঁঝরি দেখতে গেছিলে।

— অমনি তুই দৌড় লাগাবি! কাল তোর ইন্টারভিউ না?

এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা সমুপস্থিত জেনেও তেমন কোন ভাবান্তর হল না পাপুর। প্যান্টের পকেট থেকে একটা হাত বার করে আকাশের দিকে আঙুল তুলল, —দ্যাখো মা, ঘুড়িটা কী সুন্দর হাওয়ায় ভাসছে!

ভুল করে আকাশের দিকে চোখ চলে গেল তপতীর। নীল আকাশে একটা একলা ঘুড়ি দোল দোল দুলছে, অনেকটা উঁচুতে। দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু এখন কি ঘুড়ি দেখার সময়!

মুহূর্তে সচেতন তপতী চোখ নামাল, —ভাসুক। তুমি নীচে চলো।

—ঘুড়ি হাওয়ায় ভাসে কেন মা?

বিজ্ঞানের প্রশ্ন। এই প্রশ্ন কি অতটুকু ছেলেকে কাল জিজ্ঞেস করবে? মনে হয় না। তপতী কাছে এসে ছেলের ঘেঁটি ধরল, —অবাধ্য হোয়ো না পাপু, পড়বে চলো।

মার সঙ্গে এক পা দু পা এগোল পাপু। ঘুরে ঘুরে দেখছে ঘুড়িটাকে, —ওটা কী ঘুড়ি মা?

আবার ভুল করে তাকিয়ে ফেলেছে তপতী। ভাল করে দেখা যাচ্ছে না ঘুড়িটাকে, নীলের প্রেক্ষাপটে শুধু রঙটুকু বোঝা যায়। লাল আর কালো। কী যেন নাম ওটার? পেটকাট্টি? চৌখুপি? ময়ূরপঙ্খি? চাঁদিয়াল? জয়হিন্দ? দাদা ঘুড়ি ওড়ানোর পোকা ছিল, অজস্র নাম মুখস্থ আছে তপতীর। বলে দেবে একটা?

না। ছেলেকে এখন ঘুড়ির নাম শেখানো মানেই তার ইহকাল পরকাল ঝরঝরে করে দেওয়া। গম্ভীর গলায় তপতী বলল, —নাম জেনে কাজ নেই। ঘুড়ির ইংরিজি কী মনে আছে তো?

পাপু ঘাড় নাড়ল, --কাইট।

—স্পেলিং কী?

—কে আই টি কাইট।

—মারব এক থাপ্পড়। কাজের জিনিস মনে থাকে না, শুধু অকাজে মন। শেষের ই'টা কে বলবে?

পাপু লজ্জিত মুখে হাসল, —হ্যাঁ হ্যাঁ। কে আই টি ই।

—কাইট মানে আরেকটা কী হয়?

নার্ভাস মুখে মার দিকে এক ঝলক তাকাল পাপু। তাবপবই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, —চিল, মা?

—হ্যাঁ। তপতীর মুখের পেশি সামান্য শিথিল হল, —আব বাজপাখির ইংরিজি কী?

—হক।

—স্পেলিং?

—এইচ এ ডব্লু কে।

তপতী প্রসন্ন হল। নাহ্, ছেলের মাথা আছে। মন দিলেই শিখতে পারে। সেন্ট পিটারস স্কুল চড়ুই-এর ইংরিজি জিজ্ঞাসা করে দিশেহারা করে দিয়েছিল পাপুকে, এবার সেটি হচ্ছে না। গুনে গুনে এবার পনেরোটা পাখির নাম মুখস্থ করিয়েছে ছেলেকে, দেখাই যাচ্ছে মনে আছে সব।

ছেলের হাত ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল তপতী। নামতে নামতে বাকিগুলো ঝালিয়ে নেবে কিনা ভাবছে, পাপু দুম করে প্রশ্ন করে বসল— কোন কাইটটা আগে মা?

—মানে?

—মানে চিল কাইটটা আগে, না ঘুড়ি কাইটটা আগে?

আজব প্রশ্ন! তপতী ধমক দিল, —তা জেনে তোমার কী হবে?

—বলো না মা।

একটু ভেবে নিয়ে তপতী বলল, —চিল কাইটটা আগে।

—কেন?

—চিল অনেক আগে থেকে আকাশে ওড়ে। ঘুড়ি অনেক পরে এসেছে।

—তাহলে ঘুড়িকে চিল বলে না কেন?

—ফের বাজে প্রশ্ন! চুপচাপ নামো। চড়ুই-এর ইংরিজি মনে আছে?

—স্‌সস্‌স্প্যারো।

—টিয়া?

— প্যারট।

—পায়রা?

—পিপিপিপিপিজন্‌।

সামনে তিনতলার ব্যানার্জিবাবু। সঙ্গে চেনে বাঁধা ইয়া অ্যালসেশিয়ান। প্রকাণ্ড এই প্রাণীটিকে দেখলেই তপতীর হৃৎকম্প হয়, প্রশ্ন ভুলে ল্যান্ডিং-এর কোণে দাঁতমুখ সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাপুর ভযডরের বালাই নেই, দিব্যি হাত বোলাচ্ছে অ্যালসেশিয়ানের গায়ে। লেজ নাড়ছে জন্তুটা।

কুকুর কাম নেকড়ে উঠে যেতে স্বচ্ছন্দ হল তপতী। ফাঁক পেযে পাপুই প্রশ্নবাণ হেনেছে, —জিমিকে অ্যালসেশিয়ান বলে কেন মা?

প্রশ্নটা দরকারি না অদরকারি তপতী ঝপ করে বুঝে উঠতে পারল না। গত সপ্তাহে ড্যাফোডিল হাউসের দিদিমণিরা জন্তুজানোয়াব দিয়েই না ঘায়েল করেছিল পাপুকে? ভাবিত হল তপতী। কোন্ রাইন নদীর পশ্চিমে কোথায় এক অ্যালসেশিয়া নামের প্রদেশ আছে, সেখান থেকেই এই বর্ণসঙ্কর কুকুরের উদ্ভব, —এত তথ্য তপতীর জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে না। যদি প্রশ্নটা করে বসে কাল? সামনের ফ্ল্যাটের সংঘমিত্রার প্রচুর জ্ঞান, সে দিশি কুকুরকে মংগ্রেল বলে ডাকে, সে কি বলতে পারবে উত্তরটা?

ভাবতে ভাবতেই দ্বিতীয় আক্রমণ, —অ্যালসেশিয়ান স্পেলিং কি মা?

দুটোই এস্? না একটা এস একটা টি? পাসকোর্সে বি-এ পাশ তপতী কূল না পেয়ে ছেলেকে দাবড়ে উঠল, —অত বড় কুকুরের স্পেলিং তোমায় জিজ্ঞেস করবে না।

পাপু কী বুঝল কে জানে, আপাতত চুপ। হয়তো মনে মনে আরও কূট প্রশ্ন ভাঁজছে। মাকেই ঘায়েল করার জন্য। তপতী অবশ্য সে সময়টুকু দিল না ছেলেকে, হিড়হিড় করে টেনে এনে ফ্ল্যাটের দরজা লক করেছে। মনোর মাকে চা করতে বলে বিছানায় এসে বসল। সামনে বাবু হয়ে পাপু। এখনও কত রিভিশান বাকি। দেওয়াল দরজা জানলা পর্দার ইংবিজি পাখি পড়া করাতে

হবে, সব রকম রং চেনাতে হবে ছেলেকে। নিউ লাইট হাই স্কুলে টেবিলের রঙটা ঠিক বলতে পারে নি পাপু, গুলিয়ে ফেলেছিল। বাদামিকে ব্রাউন না বলে কালো। সোজা উল্টো দুদিক থেকে ওয়ান টু গোনাও শেখাতে হবে ভাল করে, মুখস্থ রাইমগুলো আওড়াতে হবে বার বার। যেন না আটকায়, যেন একটুও না তোতলায় ছেলে। তিনটে স্কুল ফসকে গেছে, হোলি অ্যাকাডেমি এখন শেষ ভরসা। এখানেও না হলে....

না হলে কী ভাবতে পারে না তপতী, রক্ত হিম হয়ে আসে।

খাটময় রাশি রাশি পশুপাখির ছবি। উট ভাল্লুক হাতি গণ্ডার জলহস্তী কাঠবিড়ালি। ঈগল টিয়া শকুন বুলবুলি ময়না। তপতী নতুন করে পড়ল ছেলেকে নিয়ে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পরখ করছে ছেলের স্মৃতিশক্তি। টপাটপ জবাব দিয়ে চলেছে ছেলে, চোখে মুখে আলো জ্বলে উঠছে তপতীর, ভুল হলে শুধরে দিচ্ছে হাসিমুখে।

হঠাৎ পুড়ুৎ করে উঠে গেল পাপু। খোলা জানলা দিয়ে ঝুঁকে কী যেন দেখছে।

তপতী চোখ পাকাল, —কী হল?

—কী সুন্দর একটা পাখি ডেকে উঠল না মা?

—তুই এখন পাখি দেখতে উঠে গেলি!

—ওটা কী পাখি গো মা?

—জানি না। এখানে অনেক পাখি আছে, এসে দ্যাখ্ না।

পাপু তবু অনড়। বাইরে পাঁচিলের গায়ে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে, সদ্য পাতা এসেছে গাছে, ফুলও। সেদিকে ঘাড় উঁচু করে বলল, —কী সুন্দর ফুল হয়েছে মা গাছটায়! রেড।

তপতী অসহিষ্ণু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, —পাপুউউ!

গা মুচড়ে মার দিকে তাকাল পাপু, —গাছটায় এতদিন ফুল ছিল না কেন মা?

উফ্, কী অমনোযোগ, কী অমনোযোগ! আর পারা যায় না।

তপতী উঠে দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিল।

দুই

কদিন ধরেই অফিস থেকে ফিরতে রাত হচ্ছে স্বপনের। প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি, ইয়ার এন্ডিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে, সাড়ে আটটা নটার আগে বাড়ি ঢুকতে পারে না কোনওদিন।

আজ সাড়ে নটা বেজে গেল।

ফিরে দেখল ঘুমিয়ে পড়েছে পাপু। এখনও রাতের বিছানা করা হয়নি, বেড কাভারের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে পাপুর বিদ্যাচর্চার সরঞ্জাম, তার মাঝেই হাত পা মেলে চিৎপাত ছেলে।

জামা ছাড়তে ছাড়তে স্বপন বলল, —কী, পাপু একদম তৈরি?

তপতী ছেলের শার্টপ্যান্ট ইস্ত্রি করছিল। ক্লান্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে নার্ভাস ভাবে হাসল, —মনে তো হয়। সারাক্ষণ ছেলে নিয়ে তো কম খাটছি না। বাপের বাড়ি পর্যন্ত যাই না কত দিন।

—এবার যেও। কাল তো তোমার পরীক্ষা শেষ।

—আমার বলছ কেন? তোমার নয়?

স্বপন হেসে বলল, —পরিশ্রমটা তুমি করছ, আমার পরীক্ষা বললে তুমি মানবে কেন?

—তবু উদ্বেগ তো দুজনেরই। নয় কি?

তা বটে। তিন মাস ধরে স্বপনেরও কি কম টেনশন যাচ্ছে? ভাল একটা স্কুলে জীবন শুরু করে দিতে পারলে ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে আর ভাবতে হবে না। কত লোককে ধরা হল। বন্ধুবান্ধব, অফিসের লোক, তপতীর জামাইবাবু, নিজের পিসতুতো ভাই, পাড়ার চেনা জানা, কেউ কোনও কম্মে লাগল না। পুরনো এক স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে সেন্ট পিটার্সের প্রিন্সিপালের পরিচয় আছে শুনে, তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল স্বপন, বন্ধু করে দেবে বলে কথাও দিয়েছিল, তার পরও লিস্টে ছেলের নাম নেই। ডোনেশান দিলে ড্যাফোডিল হাউসে ভর্তি করা যাবে খবর পেয়ে একদিন অফিস কামাই করে দৌড়ল, টাকার অঙ্ক শুনে কান লাল করে পালিয়ে আসার পথ পায় না। তিরিশ হাজার! ভাবা যায়!

জামা প্যান্ট বদলে স্বপন বাথরুমে গেল। অন্য দিন মুখ হাত ধুয়ে একটু টিভির সামনে বসে, আজ সোজা খাবার টেবিলে।

খেতে খেতে কথা হচ্ছে দুজনের। রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে স্বপন বলল, —কাগজপত্র সব গুছিয়ে রেখেছ তো? কাল কিন্তু সাড়ে সাতটার মধ্যে হোলি অ্যাকাডেমিতে পৌঁছতে হবে।

তপতী মাথা দোলাল, —জানি।

—জানো তো সবই। তখন আবার তাড়াহুড়োর সময়ে বোলো না এটা নেওয়া হল না, ওটা ভুলে গেছি।

—কবে আমার কী ভুল হয়? কেলো করলে তুমিই করবে।

—আমি! স্বপনের খাওয়া থেমে গেল।

—হ্যাঁগো, হ্যাঁ, তুমি। মনে নেই ড্যাফোডিল হাউসে কী করেছিলে? জিজ্ঞেস করল তোমার স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম ছিল কিনা কেবলুসের মতো বলে দিলে, না তো!

—ভুলটা কী বলেছি? আমাদের বরদা চরণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল থোড়াই ইংলিশ মিডিয়াম ছিল!

বরদাচরণ নামটা বলার কী দরকার ছিল? বলতে পারতে বি সি মেমোরিয়াল। দ্যাখো নি আমি কেমন কায়দা করে টি এস গার্লস স্কুল বললাম!

—তা ঠিক। বরদা চরণের পর তোমার তারা সুন্দরীর নাম শুনলে ইন্টারভিউ বোর্ডে দিদিমণিদের কোঁচকানো নাক আর সোজা হত না।

—কথাটা মাথায় রেখো। দয়া করে মিডিয়ামের প্রশ্ন তুললে কাল, এড়িয়ে যেও।

স্বপন কথা বাড়াল না। টেরচা চোখে দেখল স্ত্রীকে। কেমন যেন দূরমনস্ক, আত্মমগ্ন হয়ে আছে তপতী। খুঁটছে রুটি, মুখে তুলছে না। সাত বছরের পুরনো স্ত্রীকেও এই মুহূর্তে কেমন যেন অচেনা লাগে। ছেলেকে নামী দামী স্কুলে পড়াতে হবে, হেন, তেন, এত সব উচ্চাশা ছিল না স্বপনের। একটু একটু করে তার চোখে মোহের কাজল লাগিয়ে দিয়েছে তপতী। আর পাঁচটা ভাইবোনের সঙ্গে তারা হেঁচিপেচি করে বড় হয়েছে বলে তাদের একমাত্র সন্তানও তাই হবে! এই প্রচণ্ড গতির যুগে শুধু একটা ভাল স্কুলে ভর্তি হতে পারল না বলে অবয়বহীন গড্ডালিকায় তলিয়ে যাবে পাপু, এই ভাবনাতেই কী টেনশান! এই টেনশানও তপতীরই দান, এই টেনশানে তাদের সোনালি সুখের স্বপ্ন লেগে আছে।

খাওযা শেষ করে বেসিনে মুখ ধুতে গেল স্বপন। অনেকক্ষণ ধরে সে

কুলকুচি করে। অভ্যেস। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বলল, —পাপুকে পড়ানোর ঝামেলাটা তুমি না নিলেই পারতে।

—ঝামেলা কীসের? তপতী তরকারির বাটি ঢাকছে।

—না, মানে..... প্রফেশনাল একটা টিউটর অ্যাপয়েন্ট করলে.....দেখতেই তো পাচ্ছ ছেলে আগের তিনটে জায়গায় নিজেকে ভালমতো শো করতে পারল না.....

—সে তো রেখেছিলে একটা। চার মাসেও ছেলেকে এ বি সি ডি শেখাতে পারল না! একদিন আসে, তিনদিন আসে না.....

—আহা, সে তো বাচ্চা মেয়ে। একটা ভারিক্কি গোছের কাউকে রাখলে.. ..

—খুঁড়ো না তো বেশি। আমি জানি আমার কী দায়িত্ব আছে। বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি কিনে এমনিই পড়াশুনো করছি?

ফ্রিজ খুলে দাঁড়িয়ে গেছে তপতী। ঠাণ্ডা ধোঁয়া আসছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। তাতেও যেন শীতল হল না। উষ্ণ স্বরে বলল, —ট্যাড়োশ হচ্ছ তুমি। যদি এখানেও ছেলে চান্স না পায় তবে তুমি দায়ী থাকবে।

—কেন? আমি কী করলাম?

—গ্র্যাজুয়েশানের সার্টিফিকেটটা জোগাড় করেছ? তপতী শব্দ করে ফ্রিজ বন্ধ করল।

স্বপন ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়েছে। হালকা গলায় বলল, —দূর, অ্যাদ্দিন পরে ও আর কলেজে পড়ে আছে নাকি! কবে ইউনিভার্সিটি ফিরে গেছে।

—ইউনিভার্সিটিতেই অ্যাপ্লাই করতে পারতে।

—বহুত ঝামেলা। স্বপন টিভিটা খুলে দিল। একটু বুঝি বা অন্যমনস্ক হতে চাইল।

—ঝামেলা বোলো না, বলো তোমার গেঁতোমি।

—আরে বাবা, মার্কশিট তো আছে।

—নিউ লাইট কিন্তু তোমার সার্টিফিকেটই দেখতে চেয়েছিল।

—তারা চেয়েছিল বলে এরাও দেখতে চাইবে তার মানে আছে?

—যদি চায়?

—তখন দেখা যাবে। স্বপন আলগা হাসল, — তোমারটা আছে, ওতেই হবে।

—আমার একারটা দেখতে চাইলে তো হয়েই যেত। সব স্কুলই বাবা মা দুজনের কোয়ালিফিকেশান দেখতে চায়। তপতী দুম করে রেগে গেল, —আসল কথা হল, ছেলের জন্য তোমার ভাবনা নেই। সংঘমিত্রার বরকে দেখেছ? দুই মেয়ের পড়ার চিন্তায় সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে। তাকে দেখেও তো শিক্ষা নিতে পারো।

কার সঙ্গে কার তুলনা! সংঘমিত্রার বর কলেজে পড়ায়, বছরে আট মাস ছুটি, মেয়েদের নিয়ে সে চব্বিশ ঘন্টা কেন, আটচল্লিশ ঘন্টা আহ্লাদিপনা করতে পারে। স্বপনকে খেটে খেতে হয়, মালিক হুকুম করলে ছুটির দিনেও ছুটতে হয় অফিসে। বিরক্ত মুখে টিভি বন্ধ করে দিল স্বপন। রাগ রাগ গলায় বলল, —আমি ছেলের জন্য ভাবি না?

—ভাবো? তাহলে একবার ছেড়ে সাতবার দৌড়তে ইউনিভার্সিটিতে।

—ওটাই শুধু ছেলের জন্য ভাবনা? অন্য কাজ কাজ নয়? আমি ছেলের জন্য কিচ্ছু করি না? ছেলের ভর্তি ফর্মের জন্য রাত জেগে স্কুলে স্কুলে লাইন দিয়েছে কে? অফিস ফেলে বেহালা ছুটেছি, চুঁচুড়া ছুটেছি, লেক টাউন ছুটেছি, সে কার জন্য? এই যে মাঝে মাঝেই ছেলের ইন্টারভিউ বলে অফিস ডুব দিচ্ছি, মালিকরা আমায় ছেড়ে কথা বলছে?

ঘর থমথমে হয়ে গেছে।

পাশে এসে বসল তপতী। একটু চুপ থেকে বলল, —আহা, অত রেগে যাচ্ছ কেন? উদ্বেগে কি আমার মাথার ঠিক আছে? কী বলতে কী বলে ফেলি।

—বলবে না। মনে রেখো সেন্ট পিটার্স, ড্যাফোডিল সর্বত্র ছেলের লিস্টে নাম আছে কিনা দেখতে আমিই ছুটে গেছি, তুমি নয়। বোর্ডে ছেলের নাম না দেখে কম দুঃখ হয়েছে আমার।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যিখানে দুঃখ শব্দটা যেন পাক খাচ্ছে। ফাল্গুনের বাতাস বুঝি ভারী হয়ে গেল। মাথার ওপব তিন পয়েন্টে ঘুরছে ফ্যান, মনে হচ্ছে আবেকটু জোরে ঘুরলে ভাল হয়।

স্বপনের পিঠে আলগা হাত রাখল তপতী। ছোঁয়াটা কী স্নিগ্ধ, কী নবম, উত্তাপময়। স্বপনের মনটা ক্রমশ জুড়িয়ে এল। তবু যেন কোথায় একটা কাঁটা খচখচ করছে। কাল পারবে তো ছেলে?

. মাথার ভেতর থেকে ঘুরঘুরে পোকাটাকে বার করে দিতে চাইল স্বপন। চোখ বুজে মনোনিবেশ করাব চেষ্টা করছে হোলি অ্যাকাডেমি স্কুলেব দীর্ঘ করিডোরে। ইয়া ইয়া থাম, ঝকঝকে বাবান্দা, উঁচু উঁচু সিলিং। কী পবিত্র আবহাওয়া! মাথা নুয়ে আসে শ্রদ্ধায়।

পলকের জন্য নিজের স্কুল বিল্ডিংটা স্বপনের চোখের সামনে দুলে উঠল। ক্যাটকেটে সাদা শ্রীহীন এক দোতলা বাড়ি, ছোট ছোট জানলা, নিচু নিচু দরজা, ভাঙাচোরা বেঞ্চ, মলিন দেওয়াল। কী দীনহীন।

তিন

টেবিলের তিন দিক ঘিরে বসে আছেন পাঁচ শিক্ষিকা। উঁহু, শিক্ষিকা নয়, শিক্ষিকার বেশে পাপুর পাঁচ ভাগ্যনিযন্তা। একজন প্রৌঢ়া, বাকিরা তিরিশ থেকে চল্লিশের কোঠায়। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলে আবেদন পত্রের স্তূপ, পেপার ওয়েট, জল ভর্তি ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাস। প্রৌঢ়া বসেছেন মধ্যমণি হয়ে, সামনে তাঁর লম্বাটে এক জাবদা খাতা।

তপতীর বুকে গমকল চলতে শুরু কবেছে। ঝাড়া পৌনে দু ঘন্টা বসে থাকার পর অবশেষে এসেছে ডাক। ঘরে ঢুকেই মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধবল ছেলের হাত। সাহস সঞ্চয় করছে। পিছনে স্বপন, তাব ঠোঁটে ঝুলছে এক চিলতে ভীরু হাসি।

তপতী ছেলের কব্‌জিতে মৃদু চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে রোবটের মতো মাথা দুলিয়েছে পাপু, —গুড মর্নিং ম্যাডাম।

প্রৌঢ়ার মুখে মিটিমিটি হাসি, —কাম হিয়ার মাই চাইল্ড।

পাপু একবাব মুখ তুলে মা বাবাকে দেখল। তারপব নির্দ্বিধায প্রৌঢ়াব পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্মিত মুখে প্রৌঢ়া প্রথম প্রশ্ন করলেন, —ইওর নেম?

পাপু ক্ষুদে মিলিটাবিব মতো টান টান, —মাই নেম ইজ মাস্টাব ঋতবান পাল।

—ফাইন। ফাদাবস্ নেম?

—মাই ফাদাবস্ নেম ইজ মিস্টাব স্বপন কুমাব পাল।

স্পষ্ট উচ্চারণ করছে ছেলে। বুকে একটু বল এল তপতীর। ড্যাফোডিল হাউসে এই উত্তরটাই ভুলে মুলে একসা হয়েছিল পাপু।

নিচু স্বরে পাশের গোলাপি শাড়ি পরা শিক্ষিকাকে কী যেন বললেন মহিলা। গোলাপি শাড়ি দ্রুত পাপুর ফর্মে চোখ বোলালেন। এক জায়গায় থামল চোখ, আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাচ্ছেন।

হাসতে গিয়ে হাসলেন না প্রৌঢ়া। গম্ভীর মুখে তপতী স্বপনের দিকে তাকালেন, —বি সিটেড প্লিজ।

দেওয়ালের ধারে পাতা চেয়ারে বসল তপতী। চেয়ার টানতে গিয়ে স্বপন একটা আলগা হোঁচট খেল, সামলে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তপতী রুষ্ট চোখে আড়ে দেখল স্বামীকে, নিমেষে মুখে এঁটে নিয়েছে ইলাস্টিক হাসি। কোন দিক থেকে প্রশ্ন শুরু করবে পাপুকে? পশু? পাখি? রঙ? কাউন্টিং! রাইমস্? বোঝা যাচ্ছে না। টেবিলেব রঙ ঘন সবুজ, পারবে পাপু। পর্দার রঙ মেটে মেটে, হে ঈশ্বর এটা যেন না ধরে। পশুর মধ্যে যেন বাইসনটা জিজ্ঞেস না করে, সকালেও পাপু বাফেলোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছিল।

বাঁদিকের চেয়ার থেকে নীল শাড়ি নড়ে চড়ে উঠেছেন। ইংরিজি ছেড়ে বাংলায় প্রশ্ন করলেন, —আচ্ছা ঋতবান, তোমার বাবার সঙ্গে আর কে এসেছেন?

—মাই মাদার।

—তুমি বাংলাতেই বলো।

—মা।

—তোমার দাদু আছেন? মার বাবা?

—হ্যাঁ, সোদপুরে থাকে। পাপু দারুণ স্বচ্ছন্দ হয়েছে, —দাদু দিদা মামা মামি সব্বাই আছে।

— তোমার ঠাকুর্দা নেই? বাবার বাবা?

—আছে তো। দাদাভাই। জয়নগরে থাকে।

তপতী সামান্য ছটফট করে উঠল। বেশি কথা বলছে পাপু, এত বলার দরকার কী!

ডান দিকের চেয়ার থেকে তখনই প্রশ্ন ছুঁড়েছেন সাদা শাড়ি, —আচ্ছা ঋতবান, তোমার দাদু তোমার দাদাভায়ের কে হন?

পশু নয়, পাখি নয়, রঙ নয়, ছড়া নয়, এ আবার কেমন ধারার প্রশ্ন! তপতীব

মুখ আপনাআপনি হাঁ হয়ে গেল।

পাপু এতটুকু ঘাবড়ায়নি। চোখ ঘুরিয়ে বলল, —কে আবার! বন্ধু।

ফিক করে হাসলেন সাদা শাড়ি, —শুধু বন্ধু?

—খুব বন্ধু।

—এবার বলো তো ঋতবান, তোমার বাবা তোমার সোদপুরের দাদুর কে হন?

তপতীর চোখ জ্বালা করে উঠল। এত শক্ত উত্তর কি দিতে পারে পাপু!

পাপুর কোনও হিল্‌দোল নেই। এক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল, —বাবাজীবন।

ঘরশুদ্ধ সকলে শব্দ করে হেসে উঠেছে। প্রৌঢ়া হাসতে হাসতে ঝুঁকলেন, —আর তোমার বাবা তোমার মার কে হন?

—বড়দা।

—কেন?

—বারে, বাবা মার থেকে বড় না!

অট্টহাসিতে ছত্রখান হয়ে গেছে ঘর, পাঁচ পরীক্ষকের হাসি আর থামে না।

তপতীর সব আশা দপ করে নিবে গেল। সব শূন্য। সব ফাঁকা।

চার

ফ্ল্যাটে ঢুকে ঝেঁঝে উঠল স্বপন, চক্রান্ত, চক্রান্ত। ওইটুকু ছেলেকে ওসব উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করার মানে কী?

তপতী ঝনঝন করে উঠল, আসল কথা বুঝলে না? কাটানোর ধান্দা। ভেতর থেকে সব নেওয়া হয়ে গেছে।

—সে তো ঘরে ঢুকেই বুঝে গেছি। ভাবভঙ্গি দেখলে না, হাসাহাসি করছিল! আমরা যেন ক্লাউন।

—সে তারা যা খুশি ভাবুক, এখন আমাদের ছেলেটার কী হবে?

—পাড়ার নার্সারিতে ভর্তি করতে হবে, আর কি।

তপতী ধপ করে বসে পড়ল,—এতদিন ধরে এত কিছু শেখালাম, কিচ্ছু

জিজ্ঞেস করল না।

বাইরে উড়ো মেঘে বৃষ্টি হচ্ছে একটা। ঝলমল করছে রোদ্দুর, তার মধ্যে রুপোর কুচির মতো উড়ছে জলকণা। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল স্বপন। কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে এল, —আমাদের কপালটাই খারাপ।

তপতীর চোয়াল শক্ত হল, — আমি ছাড়ব না। আজ থেকেই আমি আবার ছেলেকে নিয়ে পড়ছি। সমস্ত জ্ঞাতিগুষ্টি, শালা শালি, মামা মামি, কাকা কাকি, সব সম্পর্ক শিখিয়ে ছাড়ব। এ বছর পারেনি, সামনের বছর ওকে পারতেই হবে।

—সে কী করে হবে? ছেলের বয়স থ্রি প্লাস থেকে ফোর প্লাস হয়ে যাবে না? একদম নিচুতে ভর্তি না করালে পরের ক্লাসে চান্স পাওয়া তো আরও শক্ত।

—কুকুর যেমন, তার মুগুরও আছে। তপতী ক্রুর চোখে তাকাল, —এফিডেভিট করে এক বছর বয়স কমিয়ে নেব। কী গো, করা যাবে না?

—তা অবশ্য করা যায়। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—এবার আর তুমি নয়, পাপুর জন্য টিচার রাখব। ওই সব স্কুলেরই কাউকে একটা। সে যত টাকা লাগে লাগুক। স্বপন কপাল টিপে ধরল, —ওফ, মাথা ধরে গেছে। এক কাপ চা খাওয়াও তো।

উঠল তপতী। বিষণ্ণ পায়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। সেই সকালে দুটো বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছিল, খিদেয় চনচন করছে পেট, কিন্তু জিভে আর কোনও স্পৃহা নেই। মনোর মা মশলা বাটছে, তাকে কিছু না বলে গ্যাসে কেটলি চড়িয়ে দিল।

তখনই মনে হল ফ্ল্যাটটা বড় শুনশান। ছুট্টে স্বপনের কাছে এল, —পাপু গেল কোথায়?

—নেই? এদিক ওদিক তাকাল স্বপন, —এক্ষুনি তো জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল! ঘরে দেখো তো।

দ্রুত ঘর দেখে এল তপতী। নেই। বাইরের ভিজে লনে নেই, উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে নেই, বাবা মার বিমর্ষ চিন্তার মাঝে আবার পাপু পালিয়েছে ফুড়ুৎ।

দুদ্দাড়িয়ে ছাদে উঠল স্বামী-স্ত্রী। ছাদে পৌঁছে থমকে গেল। অপরূপ এক

রামধনু ফুটেছে আকাশে, সাত রঙের বাহার নীল শূন্যে স্থির। পাপু নির্নিমেষ চোখে দেখছে প্রকৃতির বিস্ময়।

বাবা মার পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকাল পাপু। মুহূর্তে মুগ্ধতা সরে গিয়ে চোখের মণিতে ফুটে উঠেছে ভয়। একটু যেন কেঁপে গেল আতঙ্কে। ঘাড় নিচু করে পায়ে পায়ে বাবা মার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অস্ফুটে প্রশ্ন করল, —আকাশে ওটা কী বাবা?

স্বপন শুকনো হাসল, —ওটাকে বলে রামধনু।

পাপুর ঘাড় আরও ঝুলে গেল, —ওটা সব সময়ে কেন আকাশে থাকে না, মা?

রেগে উঠতে গিয়েও ছেলের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে তপতীর কী যেন হয়ে গেল, বুকটা সহসা মোচড় দিয়ে উঠেছে। কী ছাইপাঁশ সে শিখিয়ে এসেছে এতদিন! শুধু কয়েকটা নাম! কয়েকটা অক্ষর! সংখ্যা! ধ্বনি! কেন? ছেলের পিপাসা জলে না মিটিয়ে কেন সে লাইম জুস গেলাচ্ছে ছেলেকে? একটা মনোরম খাঁচায় ভর্তি করার জন্য?

তপতীর নিজেকে বড় নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল।

পনেরো দিন পরে হোলি অ্যাকাডেমির রেজাল্ট বেরোল। তালিকার মাথায় ঠিক দু'জনের পরে জ্বলজ্বল করছে একটা নাম—ঋতবান পাল। আশ্চর্য!

খেলনা বাক্সের সামনে

অফিস থেকে ফেরার পথে সুকান্ত আজ কিঞ্চিৎ টিপসি ছিল। অফিসের পর এক পার্টির দৌলতে দু পেগ পড়েছে পেটে। মেজাজে দিব্যি ঝিমঝিম আমেজ। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই জয়া বলে উঠল, —এসে গেছ তুমি? যাও, তোমার ছেলের কাণ্ড দ্যাখো গে যাও।

সুকান্ত হাসল ভুরু নাচিয়ে, —আজ আব্বার কি করল পাগলা?

—ও ঘরে গিয়ে দ্যাখোই না। কাল সারাদিন ব্যাণ্ডেল চার্চে ঘুরে একটা জিনিসই মনে ধরেছে তোমার ছেলের।

ব্রীফ কেস জয়ার হাতে দিয়ে সুকান্ত আলগোছে বেডরুমের পর্দা সরাল। খাটের ঠিক সামনে, মেঝের ওপর টিভির খালি বাক্সখানা লম্বালম্বি ভাবে দাঁড় করানো। পিজবোর্ডের মাঝখানে আনাড়ি হাতে কাটা এবড়ো খেবড়ো একটা গোল গর্ত। হঠাৎ দেখে মনে হয় কোন খেলনাবাড়ির দেওয়াল ভেঙে বড় মাপের জানলা বানানো হয়েছে। সেই জানলার ওপারে টুকুনের মুখের অংশ অশান্তভাবে নাচছে। জ্বলজ্বলে চোখের মণি গর্ত বরাবর এসেই সরে যাচ্ছে টুক করে। বড় সড় বাক্সটার আড়ালে একবারেই ঢাকা পড়ে আছে টুকুন।

—দেখে ফেলেএ এছি। চোর পুলিশ খেলার গলায় সুকান্ত বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে মিহি গলা মোটা করার আপ্রাণ চেষ্টা টুকুনের, —কোন কথা নয়। চুপচাপ বাক্সের সামনে এসে বসে পড়ো।

সুকান্ত জয়ার দিকে তাকাল। মুখে আঁচল চেপে ফিক ফিক হাসছে জয়া, —বুঝতে পারছ না? ওটা হল গিয়ে তোমার ছেলের কনফেশন বক্স। সারা দুপুর ধরে ওটা তৈরি হয়েছে। ও এখন ফাদার। আমরা সব পাপী তাপী।

সুকান্ত হেসে উঠল হোহো করে। এই ব্যাপার!

—কি হল বাবা? এসো।

—কি কবতে হবে বাবা ওখানে বসে?

—কনফেস্ কবতে হবে। এত দিন ধরে যা যা পাপ কবেছ, অন্যায় করেছ সব স্বীকার কবতে হবে।

—ঠিক আছে, সে নয় করা যাবে। সুকান্ত শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে ড্রেসিংটেবিলেব দিকে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে টুকুন ছুটে এসেছে কাছে, —না, এখনই এসো।

—এখন না। পরে। জয়া আলগা ধমক দিয়ে উঠল ছেলেকে, —বাবা সবে অফিস থেকে ফিরেছে, হাত মুখ ধুক, রেস্ট নিক, তার পরে। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, —তুমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এসো। আমি চায়ের জল বসাচ্ছি কিন্তু।

বাথরুমে ঢুকে সুকান্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল আয়নার সামনে। ছোট্ট আয়নায় টুকুনের বাবার প্রতিচ্ছবি। সোজাসুজি নিজেকে আয়নায় দেখতে গিয়ে হঠাৎ সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সুকান্ত। ছেলের মাথায় কনফেশন বক্সের ব্যাপারটাই এত গভীর ভাবে গেঁথে গেল কেন? আশ্চর্য! এমনিতেই মুখে বুলি ফোটার পর থেকে জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলের যেন শেষ নেই টুকুনের। মাঝে মাঝেই এমন সব প্রশ্ন করে বসে, উত্তর দিতে সুকান্তর নাজেহাল অবস্থা। জয়া অবশ্য দিব্যি পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। ছেলে দ্বিতীয় প্রশ্ন করার আগেই ঝাঁঝিয়ে ওঠে, —জানি না যা। তোর বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্ গিয়ে। সুকান্ত লক্ষ্য করেছে ঠিক ঠিক উত্তর না পেলে ছেলের মুখ কালো হয়ে যায়। গাঢ় নিষ্পাপ চোখ ছলছল করে ওঠে অভিমানে। বড় অসহায় আর দুঃখী দেখায় তখন টুকুনকে।

কালই যেমন ব্যাণ্ডেল থেকে ফিরেই টুকুন প্রশ্ন করে বসেছিল, —কনফেশান বক্সে স্বীকার করলেই সব পাপ চলে যায় বাবা?

—যেতে পারে। সুকান্তও মাথা নেড়েছিল, —দেখ্লে না কাঠের জাফরির ওপাশে কেমন আরেকটা বসার জায়গা। ওখানে বসে ফাদার সব শোনেন।

—ফাদাররা কি ভগবান?

—না। ঠিক ভগবান নয়, ভগবানের খুব কাছের লোক।

—ফাদাররা কখনও পাপ করে না?

জটিল প্রশ্ন। সুকান্ত হেসে ফেলেছিল, —বোধহয় করেন না।

এরপর টুকুন আরও একটা আজব প্রশ্ন করে বসে, —আচ্ছা বাবা পাপ কাকে বলে গো? পাপ কবলে কি হয়?

সুকান্ত কি উত্তর দেবে ভেবে পায় নি। পাতলা ভুরু বেঁকিয়ে তার দিকে স্থির তাকিয়ে ছিল টুকুন। টলটলে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক রাশ রেশমি চুল। কালো চোখের পাতায় জিজ্ঞাসা থিরথির। সুকান্তর বুকটা চিনচিন করে উঠেছিল। যেন টুকুন নয়, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তারই ছোটবেলা! মাঝে মাঝেই এমন হয়। টুকুনের মধ্যে পরিষ্কার নিজের শৈশবকে দেখতে পায় সুকান্ত। তাজা ফুলের মত মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া একটা ঝাপসা ছবি চকিতে ফুটে ওঠে মনের পর্দায়। ...সবে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। পলেস্তারা ওঠা স্যাঁতসেতে এক ঘরের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধা। ঈষৎ ক্ষয়াটে শরীর ঘিরে সাদা থান। গলায় রুদ্রাক্ষ। মাথার ওপর ঝুলন্ত চল্লিশ পাওয়ারের বালবটা ধোঁয়া আর ধুলোয় লালচে। সেই ফ্যাকাশে আলোর নিচে কাশীদাশী খুলে বসে আছেন মহিলা। নাকের ডগায় ঘসা কাচের চশমা। অদ্ভুত একটানা এক সুরে মহাভারত আবৃত্তি করে চলেছেন। পাশেই ঘেরা বারান্দা থেকে রান্নার ছোঁক ছোঁক শব্দ উঠছে। দেওয়ালের অন্য পিঠে আরও আরও ভাড়াটেদের কথা বলার চাপা গুমগুম আওয়াজ। মাঝে মাঝে কলতলায় তীক্ষ্ণ কথা কাটাকাটি। সব কিছুকে ছাপিয়ে বৃদ্ধার গলার যাদুকরী সুর উপচে পড়ছে চতুর্দিকে। জানলার শিক পেরিয়ে গলির অন্ধকার। তা পেরিয়ে বড় রাস্তা। তারপর আকাশ। বৃদ্ধা দুলছেন নিজের সুরে। মৃদু মৃদু। তিনি ছাড়াও ঘরে রয়েছে আরেকজন। এক শিশু। সামনে তার বর্ণ-পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ।—কখনও কাহাকেও কুবাক্য বলিও না। কুবাক্য বলা বড় দোষ। যে কুবাক্য বলে ....পড়তে পড়তে বালক মুখ তুলল বই থেকে, —দিদা দোষ কেন হয়? দোষ কি গো?

বৃদ্ধা পাঠ থামিয়ে বড় বড় চোখে তাকালেন, —যা করা উচিত নয় তাই করাকেই দোষ বলে।

—কি করা উচিত নয় দিদা?

—এই যে এখখুনি তুমি পড়লে। কাউকে কটু কথা বলবে না। গুরুজনকে মান্যি করবে। না বলে কারুর জিনিসে হাত দেবে না ....

শিশু কিছু বুঝল, বেশিটাই বুঝল না। দিদার কোলে লাফিয়ে উঠে বসল। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকেছে শিশুর মা। ঘামতেল মাখা মুখে তার সিঁদুর লেপটে আছে। লালপাড় শাড়ির আঁচলে হলুদের ছোপ। মাথা থেকে আঁচল নামিয়ে সে ঘাড় গলা মুছল ভাল করে, —আবার তুমি দিদাকে জ্বালাতন করছ? দিদার শরীর খারাপ। কতবার বলেছি না ওভাবে কোলে চড়বে না।

বৃদ্ধা অপ্রস্তুত হাসলেন,—কান্ত কিন্তু আজ একটা ভাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে

বৌমা।

—ওর তো খালি সারাক্ষণ প্রশ্ন আর প্রশ্ন। মা'র মুখে কপট বিরক্তি, —আয়, খাবি আয়।

—না, বাবা আসুক আগে।

—বাবার আসতে দেরি আছে। তোকে খাইয়ে দিই আয়।

কান্তুর বাবা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। প্রতি মাসে ঠিক মত মাইনে পান না। পেলেও তাতে সংসাব চলে না। সন্ধ্যার পব ছাত্র পড়াতে যান।

সুকান্ত বাথরুম থেকে বিষণ্ন মনে বেরিয়ে এল। আজ কাল হঠাৎ হঠাৎ কেন যে এমন মন খারাপ হযে যায়! টুকুনটা কোন দিনই তার দাদু, ঠাকুমাকে কাছ থেকে দেখতে পেল না। ও জন্মানোর আগেই আলাদা হয়ে গেছে সুকান্তরা। জয়া কিছুতেই সুকান্তদের বাড়িতে মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারছিল না। এখন দিব্যি মনের মত নিরিবিলি সংসার। আমি তুমি আর আমাদের সন্তান। কখনও কখনও ছুটির দিনে বুড়ি ছোঁওয়ার মত একবার করে ঘুরে আসে বাবা মা'র ওখান থেকে। ভাই বোনদের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব। খুনসুটি। আর মাস গেলে মা'র হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে আসা। সত্যনারায়ণ পুজোর দিন মা অনেক করে যেতে বলেছিল। সুকান্তকে নিয়েই কি সব মানত টানত ছিল মায়ের। যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সে দিনই জয়ার বোনের পাকা দেখা পড়ে গেল যে।

—কি ভাবছ এত? কিছু হয়েছে নাকি আজ?

সুকান্ত হঠাৎ লক্ষ্য করল জয়া তার দিকেই সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে। —না। সুকান্ত হাসল অল্প।

—কনফেশন বক্সে বসে কি কি বলবে ভাবছ? জয়াও হাসছে ঠোঁট টিপে।

স্ত্রীর চোখে চোখ রাখল সুকান্ত, —তোমাকে একবারও বসায় নি?

—বসায় নি আবার। দুপুর থেকে আমাকেই তো বার বার টেনে বসাচ্ছে।

—কি কি কন্‌ফেস্ করলে?

—তোমাকে বলব কেন?

—অনেক তাহলে জীবনে দোষ করেছ বলো।

খুবই সাদা মন্তব্য তবু জয়া রেগে উঠল দপ করে, —সে কে না করেছে। তুমি করো নি?

—চটছ কেন? সুকান্ত তাড়াতাড়ি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল, —টুকুন কি বেড রুমেই বসে আছে নাকি?

জয়া উত্তর দিল না। তার ঝলমলে মুখ একটা মাত্র কথাতেই ভারী হয়ে

গেছে। সুকান্তর বুক ঢিপঢিপ করল। জয়ার এরকম মুখ দেখলে সে বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। হাত বাড়িয়ে সুকান্ত ছোঁয়ার চেষ্টা করল বউকে, — সরি।

জয়ার তবু ঠোঁট ফুলে আছে, —থাক, হয়েছে।

সুকান্ত খাবার প্লেট সামনে টেনে কথা ঘোরাতে চাইল, —আজ অফিসে নীলু এসেছিল। কি একটা ইন্টারভিউ দিতে দিল্লী যাচ্ছে। কিছু টাকা চাইছিল।

—কত? জয়া পলকে টানটান।

—শ পাঁচেক মত চাইছিল। বললাম, অত কোথায় পাব? গত মাসেই কালার টিভি কিনেছি।

—শুনে কি বলল?

—কি আর বলবে। শ খানেক টাকা ছিল তখন পকেটে, দিয়ে দিলাম।

সুকান্ত ঢোঁক গিলল। প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলাও কি পাপ? নীলুকে সে আজ পুরো পাঁচশ টাকাই দিয়েছে। কোন্ টাকা দিয়েছে সে'ই শুধু জানে। সব কথা সব সময় স্ত্রীকে বলা উচিৎ নয়। পার্টি শুধু মালই খাওয়ায় নি বিকেলে, অর্ডারটা পাইয়ে দেবার জন্যও....। আজকের দুনিয়ায় সাধু সেজে বসে থাকা নিতান্তই মূর্খামি। অনেক ঠেকে সুকান্ত এ কথা শিখেছে। যৌবনের প্রথমে তারও কিছু আদর্শ ফাদর্শ ছিল। ভাল ভাল কথা ভাবতে ভাল লাগত। দুর্নীতি মুক্ত সমাজ, শোষণহীন ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি। ধুস, যত্ত সব ফালতু আবেগ। একা সুকান্ত সমাজটাকে বদলাতে পারে না। যেমন চলছে চলতে দাও। কোনটাই বা আজকের দিনে খাঁটি? রাজনীতি? সরকার? ব্যবসা? ধর্মের নামেও ভেজাল বেসাতি এখন। পুরোপুরি মাৎস্যন্যায়। সুকান্ত উত্তেজিতভাবে খাবার টেবিলে একটা ঘুসি মেরে ফেলল।

—এমা। বাবা ঢিসুম ঢিসুম করছে।

সুকান্ত চম্‌কে তাকাল। টুকুন কখন বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। ডাইনিং টেবিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। —আমিও ঢিসুম ঢিসুম করব বাবা।

সুকান্ত লজ্জা পেল। জয়া রান্নাঘরে কি করতে গেছে। টুকুন দু হাতে ভর দিয়ে চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়েছে। অবিকল সুকান্তর ভঙ্গি নকল করে ঘুসি মারল টেবিলে। বাবা মার প্রভাব শৈশবকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করে। টুকুন যেমন। আচার আচরণ হাবভাব সব কিছুতেই জয়া সুকান্তকে নকল করার চেষ্টা। এর মধ্যে একদিন সুকান্ত তো ভারী অপ্রস্তুতে পড়ে গেছিল। লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার জোগাড়। কাশতে কাশতে মুখে থুতু আসতে কখন সেটা ছুঁড়ে দিয়ে ছিল বারান্দা থেকে, কিছুক্ষণের মধ্যে টুকুনও হুবহু তাকে নকল

করে। ব্যাস্, হাওয়ায় উড়ে আনাড়ি থুতু একেবারে সোজা এক তলার ফ্ল্যাটে। সুকান্ত জয়া ধমকে উঠতে ছেলে কাঁদ কাঁদ মুখে বলেছিল, —বাবা ফেলল যে!

কিম্বা আরেক দিন। কাজের লোক ছুটি চাইতেই অবিকল জয়ার গলায় বলে উঠেছিল,—না, ছুটিফুটি হবে না। রোজ রোজ তোমার বাচ্চার এত অসুখ করে কেন?

শিশুর মুখে আধো আধো শাসন দেখে জয়া হেসে কুটিপাটি।

সুকান্ত চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে ছেলেকে আদর করল, —আমার পাগল ছেলে।

—মোটেই আমি পাগল নই। আমি ফাদার। অল্পক্ষণের জন্য ভুলে থাকা খেলাটা টুকুনের আবার মনে পড়ে গেছে, —চলো বাবা, এবার সব কনফেস্ করবে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে সুকান্ত শোবার ঘরে এল। কি কনফেস করবে? কোন পাপ? বিকেলের মাত্র দুটো পেগে এখনও কেন মাথা ঝিমঝিম?

বাবা বলতেন, —অন্যায় করলে সব সময় তা স্বীকার করে নেবে। তাহলেই দেখবে তোমার বিবেক তোমার কাছে অনেক পরিষ্কার।

—ও বাবা, এসো না।

—একটু পরে টুকুন। আগে একটা সিগারেট খেয়ে নিই।

কি আশ্চর্য! সুকান্ত নিজের ওপরই বিরক্ত হচ্ছিল মনে মনে। একটা বাচ্চা ছেলের মজার খেলাকে সে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে? খেলাই তো। নিছক শিশু সুলভ খেয়াল। টুকুন এক মনে তার কনফেশন বক্স সাজাচ্ছে। ও কি তার বাবাকেই বলির পাঁঠা ভেবেছে? দূর, কি সব আবোল তাবোল ভাবনা। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সবই আপেক্ষিক। সুকান্ত জানলার ধারে এসে সিগারেট ধরাল। বোতলের ছিপি খুলে সোডা বেরিয়ে আসার মত আচমকাই মাথা জুড়ে অসংখ্য বুদবুদের বুজগুড়ি। মিথ্যাচার। স্বার্থপরতা। অসাধু বৃত্তি। নিষ্ঠুরতা। বিবেকের কাছে জবাব আছে কি সব প্রশ্নের? সেই যে শীতের রাতে একটা বুড়ি ফুটপাথে একা একা মরছিল, সুকান্ত তাকে দেখেও না দেখার ভান করে সরে এসেছিল তাড়াতাড়ি। মুমূর্ষু বুড়ির গায়ে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছিল আরও অনেকের মত। তার জন্য কিছু কি করার ছিল সুকান্তর? বুড়ির ফোলা নীলচে শরীরে মাছি ভন্‌ভন্ করছিল। চোখের কোলে ভীতু জীবনের মত থমকে থাকা কিছু নোন্‌তা জল। চার দিক থেকে জনতার টুকটাক মন্তব্য। সুকান্তও তো জনতার অংশ বৈ আর কিছু নয়। কিই বা করতে পারে সে? বুড়িকে তুলে নিয়ে যেত হাসপাতালে? কিম্বা নিজের বাড়ির উষ্ণ আশ্রয়ে?

একটা জীবনকে বাঁচানোর সৎ উদার প্রচেষ্টা? না। তার কোন দায় ছিল না। মরতই। তা মাঝে মাঝে এখনও কেন সেই বুড়িটা চলে আসে চোখের সামনে? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বুড়ির সঙ্গে কার খুব মিল? নাকি মা? মুখে গর্জন তেল। ঠোঁটে স্নেহমাখা হাসি। সুকান্ত ছটফট করে উঠল। ইদানীং মা'র শরীরটা খুব ভেঙে গেছে। কটা দিন কাছে এনে রাখতে পারলে ভাল হয়। সঙ্গে বাবাকেও। কদিন কিছু ভালমন্দ খাওয়া। একটু আবাম। বিশ্রাম। হায়রে জায়গা কোথায় সুকান্তর ফ্ল্যাটে? দুটো মাত্র ঘর। একটা শোবার। অন্যটা সোফা টেবিল ক্যাবিনেট টিভি শো কেসে ঠাসা। ডাইনিং স্পেসটাও বড় ছোট। তবু আনা যায়। তারপর? জয়ার অভিমানের কাছে সুকান্ত যে বড় অসহায়। জয়া একা থাকতে ভালবাসে। মানুষজন, ঝুট ঝামেলায় হাঁপিয়ে ওঠে। তাই তো আলাদা সংসার। কিন্তু জয়ার কি একারই দোষ ছিল? পৃথক হওয়ার জন্য? মা'ও তো জয়াকে সহ্য করতে পারেনি। বোনেরা কথায় কথায় দোষ ধরেছে। আজকের এই নীচতা, স্বার্থপরতার পিছনে আগের প্রজন্মেরও দায় কিছুটা আছে। পূর্বপুরুষের অসহিষ্ণুতা বোধহয় ধারাবাহিকতায় গড়িয়ে আসে উত্তর পুরুষে।

রাখাল দাস স্ট্রিটের সেই শাখা গলিতে সুকান্তদের দেড় খানা মাত্র ভাঙাচোরা ঘর ছিল। ড্যাম্প ধরা দেওয়ালে অজস্র মানচিত্র। অভাবের। যন্ত্রণার। দুঃখের। ছোট ঘরটা বাক্স, বাসন, টিন, কৌটো আর ইঁদুর আরশোলায় ঠাসা। সেখানে দিদা। মাঝে মধ্যে কচিৎ কখনও সুকান্তর মা, বাবা, টুলু, নীলু, সোনা। সুকান্তর আর নীলুর বয়সের তফাৎ প্রায় আট। বাকি তিন জন পিঠোপিঠি। দিদাকে বাবা মা কাছে রেখেছিল ঠিকই তবু পরের দিকে দিদাও তো অযত্নে, অবহেলায়....! মানুষ নিজের প্রয়োজনেই স্বার্থপর হয়ে যায়। সেটাই তো নিয়ম।

—এমা, টুকুন মাটিতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তুমি কি গো! জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোভা দেখছ?

সুকান্তর চিন্তা ছিঁড়ল। সত্যিই তো, খেয়ালই করেনি, খাটের গা বরাবর যেখানে ফাদারের বসার জায়গা সেখানে কখন বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে টুকুন। ঘুমোচ্ছে? নাকি ফুলের মত ফুটে আছে? সুকান্ত এগিয়ে গিয়ে ছেলের মাথার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। টুকুনের মুখে স্বর্গের সুষমা। এক মাথা রেশম চুল উড়ছে পাখার হাওয়ায়। চোখের পাতায় মৃদু কাঁপন। সেই ছোট্ট থেকেই ছেলেটা এরকম মাথার ওপর হাত ছড়িয়ে ঘুমোয়। ছোট, নরম মুঠি দুটো দেখতে দেখতে সুকান্তর গা শির শির করে উঠল। সব শিশুই এভাবে হাত মুঠো করে ঘুমোয়। সেও ঘুমোত। টুকুন তো তারই শৈশব। সুকান্ত

ছেলের মুখ থেকে চোখ সবিয়ে পিজবোর্ডের বাক্সটার দিকে তাকাল। বাক্সটার গর্তটার ওপারে কেউ নেই, কিছু নেই তবু সুকান্তর দৃষ্টি নিথর।

—কি দেখছ কি হাঁ করে? ছেলেটাকে ওঠাও।

--চুপ। সুকান্ত ঠোঁটে আঙুল চাপল। ফিস ফিস করে বলল, —এদিকে এসো। তাড়াতাড়ি।

জয়া অবাক।

—শোন, টুকুন জেগে ওঠার আগেই সরিয়ে ফেলতে হবে বাক্সটাকে। ওকে এখন ছুঁয়ো না। চলো আগে নিচের ডাষ্টবিনে....

এতক্ষণে জয়া স্বামীর ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে স্বর কেঁপে গেল তারও। —টুকুন খুব কাঁদবে কিন্তু।

সুকান্ত বলতে চাইল, কাঁদুক। তবু ধরা দেব না কিছুতেই। বলতে পারল না।

ডাষ্টবিনে বাক্সটা ফেলে আসার পর সুকান্ত বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। পাশে জয়া। ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল বাক্সটাকে। আবর্জনার মাঝে উপুড় হয়ে পড়েও সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন যেন। কলুষহীন।

জয়া সুকান্ত সেদিকে পলকহীন তাকিয়ে রইল। তাকিয়েই রইল।

দাগবসন্তী খেলা

সকাল সকালই বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়েছিল পৃথা। খুব দূরের পথ যদিও নয়, কাছেরও তো নয়। বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরলে চল্লিশ মিনিট। অবশ্য রেলকোম্পানির লিখিত সূচী যেমন। আদতে লাগে আরও বেশি। আজও লাগল। ঠিক আগের আগের স্টেশনটাতে শুধু শুধুই দশ মিনিটটাক থম্‌কে রইল গাড়ি। কি, না ট্রেনে ট্রেনে কাটাকুটি হবে ছেলেবেলার দাগবসন্তী খেলার মতন। ওপার থেকে আপ্‌ আসছে কুউউ দম বেঁধে বুকে। ডাউন রইল চোখ বুঁজে পড়ে। আপ্‌ এসে হাঁপ জিরোল খানিক। ফের ছুটল শ্বাস টেনে। শেষ দাগ সে পেরিয়ে গেলে তবে ডাউনেব নড়ার পালা। এরকমই নিয়ম খেলাটারও। দৌড়তে দৌড়তে আপ হয়ে যাবে ডাউন। তখন ডাউন নতুন করে আপ হয়ে ছুটে আসে দান দিতে। আপ ডাউনের এই খেলার মাঝেই কখন যে ঘড়ির কাঁটা দশের ঘর পার।

প্ল্যাটফর্মে পা রেখে পৃথা এদিক ওদিক তাকাল। ট্রেনটা তাকে ফেলে চলে যেতেই বুক জুড়ে আচমকা ডুবডুব ভয়। মাঘ সকালেও হাতের তেলো ঘামে বিজবিজ। সদ্য নামা ঝুড়ি, বস্তা আর কেজো হেটো মেয়েপুরুষ যে যার মত ব্যস্ত সবাই। চোখ যদিও উলুক ঝুলুক দামী মোড়কের পৃথার দিকে। ভাবটা এমন তুমি আবার কোন পৃথিবী থেকে এলে হে সুন্দরী? ডানামেলা শিরীষ গাছে ছায়ায় তাড়ির হাঁড়ির পাহারাদার এক কানাবুড়ো। চোখ দ্যাখো তার, এদিকেই স্থির। পৃথা ঘুরে দাঁড়াল। যেদিকে তাকাও শুধু অচেনা মানুষ, অদেখা আকাশ আর অনাত্মীয় গাছগাছালি। ধোপ দুরস্ত জনা চার পাঁচও নেমেছিল বটে। ফোলিও হাতে প্যাণ্ট সার্ট, ঝোলা কাঁধে পাজামা পাঞ্জাবী। একে একে তারাও এখন স্টেশন-শেষের ঢালের আড়াল। কাঁচা পাকা স্টেশন ঘিরে মরচে

লোহার ভাঙা বেড়া। বেড়া ছুঁয়ে এখান সেখান শিরীষ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া। তাদেরই এক গুড়ি ঘেঁসে আধবয়সী দুই মহিলা ঝগড়া করে চলেছে প্রাণভরে। বাপ রে বাপ, কী তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ। পৃথা মিছিমিছিই সেদিকে এগোল। কার কাছে যে হদিশ পাওয়া যায়? কানা বুড়োটাকেই ধরবে নাকি? একা একা ঠিকানা খোঁজা কি সহজ কাজ? তার ওপর সে ঠিকানা যদি হয় চেনা দেখা জগতটার বাইরে, এরকম এক ছবি-ছবি পৃথিবীর মেঠো রাস্তায়? যে রাস্তা গেছে তেপান্তরের মাঠের ভেতর দিয়ে। যে মাঠে শুধুই মাটির আঁচল কামড়ে ধরে হি হি হাসে শিশু ফসলের দল, বাতাস খোলাখুলি চুমু খায় গাছের শরীরে, হঠাৎ কোন একলা পাখি হারিয়ে যায় প্রকাণ্ড আকাশটায়। ভাবতে ভাবতে আরও একটু এগোল পৃথা। এগোতে এগোতে ফিরে তাকাল শূন্য রেললাইনটার দিকে। যেন বালিগঞ্জের ট্রেন নয়, তার শেষ পরিজনটি একটু আগে ছেড়ে চলে গেছে তাকে। মেয়েটাকেই না হয় জোর করে সঙ্গে আনলে হোত। কেউ একজন সঙ্গে থাকলেও অনেকখানি ভরসা পাওয়া যায়।

—কোথায় যাওয়া হবে গো দিদিমণি?

পৃথা ফিরে তাকাল। ময়লা ছেঁড়া মিলের শাড়ি যেমন তেমন, গায়ে মুখে শীতের খড়ি, কালোকুলো বাচ্চা কোলে বউটি খানিক দূরে তফাত রেখে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় এক গাড়িতেই ছিল। এক কামবায় ছিল কি? পৃথা ভাবার চেষ্টা করল। গরিব গুবরো মানুষগুলোকে তার সব কেমন একরকম লাগে। রুখুসুখু চুল, ছেঁড়াফাটা চামড়া আর চোয়ালভাঙা মুখের খাঁজে খাঁজে ক্ষিধে। আলাদাভাবে ওদের কারুরই কোন পরিচয় নেই। বিশেষ কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর জীবমাত্র যেন।

গায়ে পড়া বউটি কাছে এগোল, কখুন থিকে দেঁড়িয়ে আছ, তাই ভাবলম জিগিস্ করি। বিডু আপিস যেতি হলে কিন্তুন উদিকে যাও। সেই নাইনের ওপার......

যাক, একজনকে তবে পাওয়া গেছে। পৃথার শ্বাস প্রশ্বাস সহজ হোল। জংলা ছাপ পিওর সিল্কের আঁচল আলতোভাবে জড়িয়ে নিল কোমরে, নক্সাপেড়ে উলের শাল ছড়িয়ে দিল বুকের ওপর, ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাগখানা এহাত ওহাত, মনসাপুকুর গ্রামটা কোথায় বলতে পারো? সেই সাতবিবি না কি যেন ছাড়িয়ে যেতে হয়?

—ওমা, সে তো আমাদেরই গেরাম গো। সিখেনে কাদের ঘরে যাবেন তুমি?

পৃথা চোখ বুঁজল। নামটা ছাই আবার ভুলে গেছে। কি করে থাকবে মনে?

কিছু কিছু মানুষ যে আছে যাদের কোন নাম থাকতে নেই। থাকলেও জানে না কেউ। যেমন আলতাবৌ, বামুনদিদি কিংবা ঠাকুরমশাই। আদ্দিকালের পোস্টকার্ডে সেদিন নামটাকে দেখে বাড়িসুদ্ধ সবার তাই সে কি হাসি, ও বাবা, আলতাবৌ-এর এমন একটা দাঁত কাঁপানো নাম ছিল নাকি! বজ্রবালা দাসী!

কথা বলতে বলতে এগিয়েছে ওরা। প্ল্যাটফর্মেব ধুলো নাচিয়ে দোল দোল দুলছে হিমেল বাতাস। দোলনা দুলে একবার এদিকে আসে তো আবার ঘুরে সেই স্টেশনের ওপার, একেবারে ঝাঁকড়াচুলো গাছগুলোর মাথায়। তাদের ঝুঁটি ধরে নামিয়ে আনে রাশ রাশ শুকনো পাতাব ঝাঁক।

—তা হ্যাঁ গো দিদি, তোমার মতন মানুষ হঠাৎ পানগোপালের ঘরে কেন গো?

— কে প্রাণগোপাল ?

— তা জানোনি? সেই যে তোমার বজোবুড়ির ছেলে।

জড়াতে জড়াতে বৌটির চোখে ক্রমশ চাক বেঁধেছে কৌতূহল। এমন আজব ঘটনা বুঝি জন্মে একবারই ঘটে। কলকাতার বড়বাড়ির, বড়লোকেব বউ সে কি না এসেছে একা একা গ্রামেগঞ্জে? তাও এক গরীব বুড়ির খোঁজে?

—তা হ্যাঁগো, বজোবুড়ি শুনিচি এককালে কলকেতাতে খুব যেত। অনেক ঘর যজমান ছিল সিখেনে। তা তখুন থিকে চেনা বুঝি?

—ঠিক ধরেচ। পৃথার ঠোঁটে আলগা হাসি, আলতাবৌ আমাদের অনেকদিনের চেনা। সেই যখন ছোট আমি, এত্তটুকুন, তখন প্রায়ই যেত। কি সুন্দর যে গান গাইতে পারত। নখ কাটতে কাটতে গান, ঝামা ঘসতে ঘসতে গান, গুনগুন গান শুধু। এখন কেমন আছে গো সে?

--ভাল নেই গো দিদিমণি, মোটে ভাল নেই। একে বয়সের জোব কামড়, তার ওপর হাত গেছে, পা গেছে, কোমর গেছে। চোখেও তেমন দেখতি পায় না কো। যে ঠাঁয়ে খাওয়া, সিখেনেই গু মুত, সিখেনেই ঘুম।

— বলো কি? কেউ নেই তাকে দেখার?

—থাকবে নি কেন? সবই আছে। ছেলে, বউ, লাতি, লাতিন। তবে কেউ তেমন ফিরে চায় না। কারুর যদি মন হোল তো দিনমানে একবার সাপসুবত করে দিল বুড়িকে। নইলে যেমন ছিল রইল পড়ে। বউ তো সাঁঝ সকাল গাল পাড়তেচে। শুধু শাউড়ির মরণকামনা। দশবাব চাইলি তবে তেষ্টার জলটুকুন দেয়। তা শকুনিব শাপে কি আর গরু মরে গো দিদিমণি? সে যত গাল পাড়ে, পরমায়ু তত বাড়ে বজোবুড়ির।

— ছেলেটা কি করে? তোমাদের প্রাণগোপাল?

— সে আর কি বলবে? একে ঘরে অমন গনগনে বউ, তায় সোমসাবে

নিত্যি অভাব, নিত্যি যাতনা। পাঁচ পাঁচটা পেট হাঁ হাঁ জ্বলতেছে সব্বোসময়। মা মরলে তাও যদি কিছু সুরেহা হয়......। তার ওপরি নেশা ভাঙ-এর বিরাম বিছরাম নেই তার। আতদিন তাড়ি মদ গিলে....

পৃথা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। বউটির ঠোঁটে দুঃখ কাঁপছে — জগতের এমনই রীত গো দিদি। যে ক্যাঁথায় একদিন জাড় কাটাতে, তাই যখন পুরনো হোল, ছুঁড়ে ফেল তাকে।

ঠিক কথা, ঠিক কথা। এই হোল সাতকথার এক কথা। ছেঁড়া বাসির আদর নেই কোথাও, কোনখানেই। তা সে গরিবের ঘরই বলো আর বড়লোকের। চুপচাপ হাঁটতে থাকে পৃথা। অনেকখানি চলে এসেছে তারা। স্টেশন থেকে নেমে বেশ খানিক হাঁটাপথ, খোয়া বাঁধানো। শেষে ডানদিকে মোড় নিলে ডিগডিগে মজা খাল একখানা। খালের মাথায় বাঁশের সাঁকো। সাঁকো বলতে গোটা তিনেক কাঁচা বাঁশ গায়ে গায়ে ফেলা। তার ওধারে, শরীরে শরীর জড়ামড়ি আদ্যিকালের দুই সন্ন্যাসী বটগাছ। জটার ভার যেখানে এলোমেলো, ঠিক তার নিচে নিঝুম দাঁড়িয়ে গোটা তিনেক ভ্যান-রিক্সা।

—এখানে সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায় না?

—না গো দিদি, দরকারে নোক ভ্যানেই চাপে। তা হেঁটেই চলো না কেন? এমন কি আর পথ? সামনে হোল মাকালতলা, তা বাদে কারখানার চক, তা পেরোলে সাতবিবি। তারপর মনসাপুকুর আর কতটুকুন?

—নারে বাবা, পাগল নাকি? পৃথা মাথা ঝাঁকাল, আমার মোটে হাঁটার অভ্যেস নেই। তাছাড়া ফিরতেও হবে তাড়াতাড়ি.....

ভ্যান-রিক্সায় পা ঝোলাতেই মনটা হঠাৎ খুশি খুশি। শেষ পর্যন্ত ঠিকানাটা খুঁজে তো পাওয়া যাবে। না হয় হোল আলতাবৌ আজ অথর্ব, তবু তাকে খুঁজে পাওয়াটাই যে ছিল আসল কাজ। একা একা জেদ দেখিয়ে আসছে বলে কম ঠাট্টা ছুঁড়েছিল সবাই! পৃথা যেন কোন অসাধ্য কাজে হাত দিয়েছে! রূপক তো শুনে হেসেই অস্থির, তুমি নাকি যাবে সুদূর গাঁয়ে? তাও আবার একাই? অ্যাবসার্ড।

— কেন? এমন কিছু হিল্লি-দিল্লি তো আর যাচ্ছি না। শহরতলি পেরিয়ে গেলে কতটুকুই বা পথ?

— তা অবশ্য দূর নয়। তবে তোমার যা নার্ভের জোর, একা এখনও শ্যামবাজারেই যেতে পারো না। ঘাবড়ে টাবড়ে একসা হও। সেই তুমি যাবে কোথায় ধেধধেড়ে মনসাপুকুর!

— কি আর করি বলো, তুমি যখন যাবেই না আমার সঙ্গে দোকা হতে।

—উপায় নেই। অফিসে এখন বেজায় চাপ। ফাইনাল অডিট, ব্যালান্সশিট

....একদিনও কামাই করার জো নেই।

পৃথা কথা বাড়ায়নি! জোটাই বড় কথা নয়, ইচ্ছেও নেই কারুর। ভাইয়ার না, দাদাবৌদির না, তার আরামপ্রিয় স্বামীটির তো নয়ই। এমনকি মুনিয়া যে মুনিয়া, তারও নয়। একটা সাতকালে ঠেকা ঝরঝরে বুড়ির অবুঝ খেয়ালে ঠেকনা দিতে কোন বোকা আর মাথা বাড়ায়? একমাত্র কাদা কাদা মনের পৃথা ছাড়া? একটুতে যার মন তলতল, বুকভরা গরম বাতাস, আর চোখ ছাপিয়ে লেবুর জল!

বৌদি তো শুনে মুখ বেঁকিয়ে সারা, বলিহারি শখ যা হোক তোমাদের মায়েব। মানলাম ছেলের বিয়েতে নানারকম শখ আহ্লাদ করতে ইচ্ছে হয়, তা বলে....

দাদা হেসেছিল ঠোঁট চেপে, ভীমরতি, ভীমরতি, এ সব হোল ভীমরতির লক্ষণ। কত বয়স হোল রে মার? পঁচাত্তর পেরিয়েছে?

ভাইয়া আদৌ পাত্তাই দেয়নি, দূর, যত সব আবোল তাবোল ডিস্‌কাশন। কে কবে মরে হেজে পচে গেছে কবে.....মাঝে মাঝে এমন সব উদ্ভট বায়না ধরে মা....

—বায়না ধরে তো রাখলেই পারিস। পৃথা না বলে পারেনি, এতদিন ধরে যে তোদের বায়নাই শুধু রেখে এসেছে তার একটা মাত্র ইচ্ছেটাকে এভাবে উড়িয়ে দিবি? মনে রাখিস তোর বিয়েটাই মার জীবনের শেষ উৎসব। হয়ত.....

—জ্ঞান দিস্ না তো দিদি। যা খুশি শখ হোলেই হোল? কোথায় পাবি তুই এখন সেই বামুনদিদিকে? কিংবা পৈতে বুড়িকে? তারা তো কবেই পটল তুলে...

— আরও আছে রে আরও আছে। দ্যাখ্ গিয়ে হয়ত আলতাবৌই বেঁচে আছে এখনও। নয়ত ধূপওলি মাসি। মনে নেই তাকে? মাস পোহালেই ধূপের গোছা হাতে থেবড়ে বসত মেঝেতে.....। বলতে বলতে পৃথার চোখে ঝিকঝিক হাসি, তারপর কী ঘোঁট, কী ঘোঁট। এর হাঁড়ি, ওর হাঁড়ি, তার হাঁড়ি....

— আর সেই বাসনওলিটা? ঠিক কেমন পটিয়ে-পাটিয়ে বাসন গছিয়ে যেত মাকে!

— আর ব্ল্যাকজাপান মেছুনিটা? কতবার যে পচা মাছ নিয়ে ঠকেছে মা। মনে আছে বাবা কত বকাবকি করত মাকে? রাগ করত....

— মা কিন্তু বদলায়নি তাতেও।

— চিরকালই একরকম। ভালমানুষ, ফুল অফ সেন্টিমেন্টস।

— তবে?

— তবে কি?

— মার এই শেষ সেন্টিমেন্টটা বুঝব না আমরা? এমন কি আর ধন দৌলত চেয়েছে বল্? সাধ হয়েছে ছোট ছেলের বিয়েতে এক সময়ের সব মানুষগুলোকে.....

— তুই-ই তবে মেটা সে সাধ। আমাদের অত সময় নেই পাগলামিতে তাল দেওয়ার।

— বেশ তাই দেব। আমিই না হয় যাব আলতাবৌ-এর খোঁজে....

—তাহলে আগে ভুশণ্ডির মাঠে গিয়ে খোঁজ করে দ্যাখ। একসঙ্গে সকলের ঠিকানাই পেয়ে যাবি সেখানে।

ভুশণ্ডির মাঠ নয়, ঠিকানা পাওয়া গেল মার কাছেই। মায়ের বিয়ের পাওয়া মেহগনি আলমারি, তার ভেতরে চোরা খোপ, সেখান থেকে বেরিয়ে এল কাশ্মিরী কাজের গয়নার বাক্স। ডালা খুলতেই, ও মা গয়না কোথায়! এ তো দেখি শুধু কাগজ আর কাগজ। মখমলের ক্যাসকেটটা বোঝাই কেবল পুরনো চিঠি আর বিবর্ণ কাগজে।

মায়ের তখন ফোকলা গালে বালিকা হাসি,

— গয়না আর থাকবে কোথথেকে? তোর বিয়েতে দিয়েছিলাম দশভরি, বউমাকে পাঁচ, তোর মেয়েকে দুই, মানিকের ছেলে দুই, কত রইল আর?

— সে তো তুমিই বলবে।

— হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ছিল মোটে মটরমালা আর মকরমুখো বালা একজোড়া আর কটা আংটি। রেখেছিলাম ছোটর জন্য। তা ডিজাইন সব সেকেলে বলে এই তো সেদিন বউমা সেসব দিয়ে এল নতুন করে গড়তে।

পৃথা তখন কথা বলবে কি ! গলা ভেঙে কি যে টনটন ব্যথা তখন। চোখ ছাপিয়ে টিলটিল জল। চিরকাল মায়েরা বুঝি এভাবেই ভাগ করে দেয় নিজেকে। তারপর নিজের থাকে কি? থাকে গো থাকে। ওই তো গয়নার বাক্স আবার টইটুম্বুর কেমন। কত লোকের যে ঠিকানা সেখানে—হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া—বাবার চিঠিই দ্যাখো না কতগুলো। গোছায় গোছায় যত্নে বাঁধা। বিয়ের পর পর, সেই যখন মা বাপের বাড়ি, তখন লেখা। কিছু আরও পরে, কখনও সখনও। জমতে জমতে, জমতে জমতে, সুতো কাগজ সবই এখন হলুদ বরন। দূর পাগল, হলুদ কোথায়? হলুদ রঙ কোন ফাঁকে যে টুকরো টুকরো সোনা হয়ে গেছে—সাতনরী, সীতাহার, ব্রেস্‌লেট, মানতাশা।

আলতাবৌ-এর ঠিকানাও বেরোল সেই অলঙ্কারের স্তূপ থেকে। পঁচিশ বছর আগে লেখা পাঁচ পয়সার পোস্টকার্ড একখানা। না হয় তাতে বানান ভুল হাজার, হাতের লেখা কাকের ঠ্যাং, সবই এখন আবছা নীল মিনে করা কাজের মত।

মা বলল, একবার দ্যাখ না গিয়ে পাস কি না তাকে। পৈতেবুড়ি মারা গেছে কবেই। বামুনদি তো চলে গেল তোর বাবার যাওয়ার বছরেই। থাকলে আলতাবৌই আছে....এই না বলে চোখ মুছল কিছুক্ষণ, খোঁজ পেলে বলিস একবার যেন আসে। এ বংশের সব কাজেই তো আসত একসময়—বিয়ে, শ্রাদ্ধ আঁতুড়তোলা। তারপর কত যুগ যে কোন খোঁজ নেই আর। সেই যে কী একটা রোগে ধরল তাকে, তারপর থেকেই....

রোগের পর থেকেই কি তবে আলতাবৌ.....পৃথা নড়ে চড়ে বসল। ফাঁকা মাঠের সিঁথি ছিঁড়ে ছুটে চলেছে ভ্যান-রিক্সা। মাকালতলা পেরিয়ে গেল। কারখানার চক পেরোব পেরোব। এবড়ো খেবড়ো এঁটেল পথে মাঝে মধ্যেই ঝিকিড় মিকিড় ঝাঁকুনি। শুকনো মাটি এই উঁচু তো নিচু একহাত। শরীরটা হেলে পড়তেই পৃথা পাটাতন খামচে ধরল। অনভ্যস্ত পথে শরীর মন দুইই এখন সামাল দিতে ব্যস্ত। শরীর স্থির তো মন চঞ্চল। মন উদাস তো বেসামাল হাত, পা, কোমর। উদাসী চোখ আকাশ ছুঁল বারকয়েক। আকাশ যেন আকাশ নয়, মাথার ওপর মেলে ধরা ইয়া বড় ঝকঝকে নীল দৈত্যছাতা। তার নিচে আলগা পৃথিবীটা দুপুরবেলা একলা শোয়া খোলামেলা যুবতীর মত শরীরের আড় ভাঙছে। পৃথা নতুন পৃথিবীর শরীরে চোখ বোলাল বারবার। মাঘবেলার সূর্যিরাজা যদিও বেশ নরম সরম, হাওয়া কিন্তু তলোয়ার, ঝকঝকে ধারালো। শালটাকে ভালমতন সাপটে নিল গায়ে। মনসাপুকুরের রোগা বৌ দিব্যি কেমন নির্বিকার। আঁচলখানা যেট্‌কুনি শীতের আড়াল। তার ভেতরে গুটিসুটি দুধের শিশুটা চুকুর চুকুর দুধ টানছে মাঝে মাঝে। তার সঙ্গে তার মায়ের মুখও চলছে অবিরাম। এতাল বেতাল কত কথা, বকবক বকবক। জানারও তার আছে কত কিছু; হাজার প্রশ্ন, লক্ষ কৌতূহল।

— হায় মা, তোমার মোটে একটা ছাওয়াল? তাও কি না মেয়ে? ছেলে হবেনি? নাকি অ্যাপ্রশন করেচ? তোমাদের কলকেতাতে তো শুনি দুটো হলেই সব....এই তো আমার ভাসুরপো বউ, যাদবপুরের দিকি থাকে, যেই না তিনটে নামল পেট থেকে, ওমনি ছুট, ওমনি ছুট। কি, না এবার কাটাতি হবে।

বিরক্তি নয় পৃথার মুখে মজার হাসি, তা তোমার মোট কটা গো?

— কোলেরটাকে ধরলি পরে হয় মোট পাঁচ। তিন ছানা, দুই ছানি।

— আরও হবে?

— সে কথা কি কেউ বলতে পারে দিদি? সবই ভগমানের হাত। তবে গেরামেও এখুন হাওয়া ঢুকেছে গো। এই তো সেদিন কুমোর ঘরের নতুন বৌটা.... কি সাহস, কি সাহস,...... কাউকে কিছু জানতি দিলে না পর্যন্ত......করলে

কি না ভাতারকে সঙ্গে নে.....মরে যাই কি লজ্জা...... কথার ভেতর ঢুকতে ঢুকতে মনসাপুকুরের বউ কখন ধূপওলি মাসি হয়ে গেছে। ভরা দুপুরে পা ছড়িয়ে বসেছে মেঝেতে, এক গালে টোপলা পান, আরেক গালে রাজ্যের কেচ্ছা কথা। পৃথা হাসছে ঝিলিক ঝিলিক, স্বামী তোমার কি করে গো? জমি-জিরেত আছে কিছু?

— নাগো দিদি, তাইলে কি আর ভাবনা ছিল? ঘরে আমরা গুড় বানাই গো। নলেন গুড়, পাটালি গুড়। কারবার বলো কারবার, ওজগার তো ওজগার, তিন পুরুষের এই কাজ। ধরো জাড়ের মুখে ধারকর্জ করে বায়না নিলাম কিছু খেজুর গাছ। যখন যেমন খ্যামতা। তারপর অস নামাও, জাল দাও, পাক মারো.....

বারে বা, বারে বা, পৃথার চোখে সত্যিকারের মুগ্ধতা, ছেলেপুলে, ঘরদোর সামলেও তুমি এত কিছু করো?

— তা করি গো দিদি। ভাতার আমার অস পেড়ি আনে, আমি জাল দিই। ছাওয়ালগুলোও খাটে সঙ্গে। এই তো এলাম চাম্পাহাটি থিকে, মহাজনের ঘরে পাটালি দিয়ে।

কথায় কথায় কথা বাড়ে। পথ ফুরোলে কথা ফুরোয়। তারপরই জল ঢলঢল এত্ত বড় দীঘি একখানা। তারই নামে গ্রামের নাম মনসাপুকুর। পুকুরধারে শানঘাট। ঘাট বরাবর দাঁড়িয়ে যায় ভ্যান-রিক্সা। নামার আগেই বউটির নামকরণ করে ফেলেছে পৃথা—নলেন বৌ। নলেন বৌ গাঁয়ে নেমে মাথায় আঁচল টানে, 'তবে এসো দিদিমুণি, তোমাকে বজোবুড়ির ঘর দেখিয়ে দিই।

ঢোলকলমির ঝোপ বসিয়ে ঘর আর বার পৃথক করা। ঘর বলতে হাত ছয়েক উঁচু এমন এক কুঁড়ে। পুড়ে ভিজে খড়গুলো তার বাদাম কালো। কালো চালায় হামা টানছে লিকলিকে উচ্ছে লতা। মেটে দেওয়ালের পিঠজুড়ে যেখান সেখান ঘুঁটের মিছিল। বাতাস এলেই গন্ধ ঝাঁপায়। কাঁচা ঘুঁটের গোবরগন্ধ। দাওয়া বলতে তেমন কিছুই নেই। উঠোন ফেলে ঘর, ঘর পেরোলে উঠোন। ঘরের ভেতর একটু কোণে পোঁটলা মতন পড়ে আছে কেউ। চারপাশে তার নোংরা কাঁথাকানির ডাঁই। ওটাই আলতা বৌ নাকি? নাকি এ গাঁয়ের বজোবুড়ি? ভেজা ভেজা অন্ধকারে ভালমতন বুঝতে পারল না পৃথা। কিংবা চাইল না বুঝতে। হাসিলেপা ভরাট মুখখানা এখনও ভাসছে যে বুকে। কপালজোড়া মেটে সিঁদুরের টিপ, ঠোঁট দুখানা খয়েরলাল। বড়ি খোঁপায় আঁচল ওঠালে কী অপরূপ যে দেখাত আলতা বৌকে।

এক পা ঘরে, বাইরে এক পা, পৃথা দাঁড়িয়ে রইল খেজুরপাতার খোল্‌পাখানা ধরে। ঠিক তখনই রোগে ে া বৃদ্ধাকণ্ঠ ভেতর থেকে থরোথরো, কে এল রে? ওরে কে এল? বল্ না ৰউ কে এল?

প্রাণগোপালের বউ-এর গলায় ফিসফিসানি, যাও না কেন ভেতরে, ও দিদি।

যাই গো যাই। এর জন্যই তো আসা এতদূর। পৃথা ফিরে তাকাল। প্রাণগোপালের বউ কখন গামছা ছেড়ে কাপড় জড়িয়েছে শরীরে, সবুজ ডুরের সস্তা শাড়ি। তাও আবার শতেক ফাটা। ডাগর চোখ শান্ত নরম। ও চোখেও নাকি আগুন নাচে! কে জানে! কাক চিলও নাকি হাঁক শুনলে দৌড়ে পালায়! নলেনবৌ এরকমই বলেছিল বটে। পৃথার সামনে রূপ কিন্তু অন্যরকম। একটু আগে, এই তো কেমন নিজের হাতে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে দিল শাশুড়িকে। গন্ধ তাড়াতে ঘরে ধোঁয়া দিল গুগ্‌গুলের। ছেলে দুটোকে পাঠাল বাপের খোঁজে। পৃথাকেও কত খাতির, কদ্দুর থিকে এসেছ। জিরোও দিকিন আগে। এত পথ এলে, গরিব ঘরের জলবাতাসা টুকুনখানিক মুখে দাও দিনি।'

কোন মানুষ যে কখন কিরকম! এই যদি ভাল দ্যাখো তো, এই মন্দ। মন্দ ভাল মিশলে পরে তবে না মানুষ, মানুষ হয়। আহা বেচারী, দুঃখে অভাবে জেরবার হয়ত। অন্নের জন্য দুঃখ, বস্ত্রের জন্য দুঃখ, তাড়িখেকো মাতাল স্বামীটার জন্য দুঃখ। কতটুকুন ঘরটাতে কচিকাচা মিলিয়ে এতগুলো মানুষের থাকা। তায় দোসর ওই পঙ্গুবুড়ি।

আবার গলা কাঁপছে ঘরে, ও বউ, কেমন যেন বাস আসতেছে না? চেনা চেনা, পুরনো অনেক। কে এসেচে, বল্ না, ও বউ।

ভ্যানিটি ব্যাগের মুখ খুলে মিষ্টির বাক্সখানা বার করল পৃথা। বুদ্ধি করে খানদুয়েক সস্তা দামের শাড়ি আনলে হোত। কিংবা নিজেরই কোন পুরনো ছেঁড়া। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অবাকচোখ বাচ্চাগুলোরও নেই কিছুই। ভাবতে ভাবতে এগোল আলতাবৌ-এব কাছে, চেনা চেনা লাগছে নাকি সত্যি? দ্যাখো তো ভাল করে।

ভাঙা মাজা চেপে ধরে টান টান আলতাবৌ। কাদাগোলা ছানি চোখের পাতা দুটো পিটির পিটির, কে বলতো? ঠিক ঠিক চিনতি পারছি নি।

— সেই যে গো, একডালিয়ার বাগচী বাড়ি। ভুবনমোহন বাগচী নয়নমোহন বাগচী....

বুড়ি তবু উথাল পাথাল কথা হাতড়ায়, একডালিয়া? সে আবার কাদের গেরাম? কোন পথ দে যেতি হয়?

প্রাণগোপালের কিশোরী মেয়ে খিলখিল হেসে উঠল। পৃথা বুড়ির শরীর

ছুঁল, গ্রাম নয় গো। একডালিয়া সেই কলকাতায়। বালিগঞ্জে নামলে পরে এগিয়ে গিয়ে ডানহাত মোড়ো, তারপর আবাব ডান, আবাব ডান....

বুড়ির গলা প্যাঁ প্যাঁ বাজে এবার, অনেকটা ঠিক হার্মোনিয়াম রিডের মত, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পড়েচে গো, মনে পড়েচে। বউমাদের শউড় ঘব তুলল সেবার, সেই নড়াই-এর কালে। সব ত্যাখন পেইলে যাচ্চে কলকেতা ছেড়ে....

আরও ঝুঁকেছে পৃথা। ব্যগ্র মন ঝোঁকা শরীরে টলমল, চিনেছ তবে?

আলতাবৌ শিশুর মত কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে হাত বোলাল পৃথার মুখে। শক্ত বরফ কাঠি আঙুল, পুরনো বাসি মড়ার যেমন। কপাল থাবড়ায়, চুল থাবড়ায়, গালে হাত, চোখে এসে হাত টিপটিপ। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হাতে প্রাণ ফিরছে, ভাঙা মুখে আলোর আভাস,—চিনেছি গো চিনেছি। এ চোখ কি আর ভোলা যায় গো? তুমি আমার ছোটবৌদিদি, নয়নদাদার আহ্লাদী বউ, তাই নয়? একইরকম আছ দিকি! বদলাওনি!

পৃথা বুঝি ছিটকে গেল। হায় রে হায়, শেষে তাকে মা বলে ভেবে নিয়েছে আলতাবৌ।

—এতদিন পর কুথথেকে এলে গো ছোটবৌদিদি? কোথায় ছিলে গো এতটা দিন? কতদিন যে দেখিনি তোমাদের....

ধীরে ধীরে কান্না সুর হয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া সেই নখকাটানির সুর। পৃথার ভেতর সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। এমনটা যে হবে একটু আগেও কি ভেবেছিল? ভুলটাকে ভেঙে দেবে নাকি? মা বলে মেয়েকে চেনার ভুল? কি লাভ তাতে? একেবারে ভুল তো নয়। সব মা'ই তো একটু একটু করে একদিন ঢুকে পড়ে মেয়ের মধ্যে। ভাঙতে ভাঙতে, ভাঙতে ভাঙতে, কখন মেয়েরাই যে মা হয়ে যায়। যুবতী মা, যুবতী মা থেকে প্রৌঢ়া মা, প্রৌঢ়া মার দিন ফুরোলে বৃদ্ধা মা। অসম্ভব, এ ভুল ভাঙতে আর যে পারুক, পৃথা পারে না। যে সময়ে বেঁচে ছিল প্রাণভরে, সেই সময়টাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে বজোবুড়ি।

—হ্যাঁ গো ছোটবৌদিদি, ছেলেমেয়ে সব কেমন আছে? নয়নদাদা? এখনও সেই ছুটির দিনে আপিস করে?

আলতাবৌ কে ছিল মার? বোন, বন্ধু, কাছের আত্মীয় কোন? পৃথা দু আঙুলে কপাল টিপে ধরল। হারানো মানুষগুলো হঠাৎ হঠাৎ এমন হৃদয় মাড়িয়ে য়ায়!

—বড়বৌদিদি এলনি কেন? ভুবনদাদার বউ? শরীল থাকলি যেতাম তারে একদিন আলতা পরাতি। তোমাদের সক্কলকার বে'তে আমিই ছিলাম,

মনে পড়ে? সেই কর্তামার আমল থিকে....

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল পৃথা। মনে শুধুই জবাব সার সার। নয়নদাদা, ভুবনদাদা কোন দাদাই নেই যে গো আর। বড় বৌ তো কবেই চলে গেছে শেষ যাত্রার আলতা পরে।

বুড়ি ব্যস্ত হোল এবার, ও বউ, আমার নরুনখানা খুঁজে দ্যাখ না মা। আর আলতার শিশিখান। ছোটবৌদিদিকে কদ্দিন পর পরান ভবে আলতা পরাই।

এবার বুকের জবাব জল হয়ে নামছে চোখ বেয়ে। পৃথা দাঁতে আঁচল চাপল। ছোটবৌদিদি তোমার আর কোনদিনই আলতা পরবে না গো। আলতা পরার কাল কবেই তাব শেয হয়েছে।

খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করেছে প্রাণগোপালের বউ। নাকি হাতের কাছেই ছিল? নরুন, ঝামা, পেতলের ছোট আলতাবাটি, রাঙাজবার শিশি একখানা। ছেলের বউই শাশুড়ির কাজ করে নাকি এখন? নাকি নাপিতঘরে মজুতই থাকে এসব? ঠকঠকে হাত পা ছুঁয়েছে। পৃথার শরীর জুড়ে শিহরণ খেলে গেল। এ দৃশ্য দেখলে মুনিয়াটা হেসে কুটিপাটি যেত, মা, তুমি আলতা পরছ নাকি! কোনদিন তো দেখিনি!

— দেখিসনি তো কি আছে, দ্যাখ্। মানায়নি আমাকে?

— মোটেই না, মোটেই না। তোমার পায়ে আলতা! ওফ, হরিবল্। ব্যাপারটাই ভীষণ প্রিমিটিভ।

হ্যাঁ প্রিমিটিভ। সেই প্রিমিটিভ হাত এখন নরুন ধরেছে। নরুন ছুঁল নখ, নাকি নখই ছুঁল নরুনকে। দেখতে দেখতে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ছড়িয়ে গেল চারদিকে। আঙুল থেকে গোড়ালি, আবার আঙুল। আলতাবৌ এও ভুলেছে, এসব তাকেও ছুঁতে নেই আর। পৃথা উঠে দাঁড়াল। দুটো পায়ের গোটা পাতাই রক্তে রক্তে টসটস। এ রক্ত বড় সুখের রক্ত। এ রক্তে বাঁধা পড়ে মায়া। বোধহয় এরই নাম ভালবাসা।

ফেরার পথে পা পড়ছে এলোপাথাড়ি। এত দূরে ভেসে গেলে ফিরে যাওয়া কি সহজ হয়? ঢোল কলমির বেড়ার ধারে প্রাণগোপালের বউ দাঁড়িয়ে, একা। কচিকাচাগুলো গেল কোথায়? প্রাণগোপালও এল না তো?

— এ বৌদিদি, ইদিকপানে এসো এট্টু, কথা ছিল।

পৃথা চমকে তাকাল। একটু আগের দিদিমণি ডাক বদলে হঠাৎ বৌদিদি যে? নাকি ছোঁয়াচ লেগেছে শাশুড়ির? তা বলুক না হয়। বাগচী বাড়ির বউ না হোলেও, পৃথা বৌ তো বটে। আরেক বাড়ির।

— কি বলছ?

- জিগিস্ করতিচি শাউড়িকে কিছু বলতি এস্ছিলে নাকি?

— কেন বল তো?

—শাউড়ির মতন আমিও এখুন আলতা পরাই দোরে দোরে। এ ঘব ও ঘর থিকে ডাক আসে। প্রাণগোপালের বউ গলা নামাল, তা গেরাম দেশেব গরীব যজমানদের থিকি কত আর উপায় হয়। ঘরে এদিকে বড় অভাব.

প্রাণগোপালের বউ তাকিয়ে আছে আশায় আশায়। পৃথা নীরব। কথা বলবে কিভাবে? দুজন মানুষ যে ঢুকে গেছে বুকেব ভেতর। পৃথার মা হাসতে চাইছে মধুব করে, তবে এসো মাঝে মাঝে। বাড়ি এসে আলতা পরিযে যেও।

মুনিয়াব মা বলছে, পাগল নাকি ? ওসব এখন আউটডেটেড। দরকাব নেই।

প্রাণগোপালের বউ বলছে, তুমি ডাকলেই যাই গো বৌদিদি। কলকেতাতে দু চার ঘর যজমান যদি পাইয়ে দাও......

কলকাতাতে মানুষ কোথায় আলতা পরার? তেমন তেমন প্রয়োজনে বিউটি পারলার মোড়ে মোড়ে। তাছাড়া মানুষ এখন ... মুনিযার মা গুছিয়ে সাজিয়ে বলতে চাইল অনেক কথাই। তার আগেই কি করে যেন কথা বলে ফেলেছে পৃথার মা, আমি থাকি বাবুর বাগান, ঢাকুরিয়ায়।

উঠোন পেরিয়ে রাস্তা, রাস্তা পেরিয়ে মাঠ, তারপর আকাশ। দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঠিকানাটা — বাবুর বাগান, ঢাকুরিয়া। এই মাত্র ঢুকে গেল ঘরে ঘরে। এ ঘর থেকে ও ঘর, কুমোরপাড়ার ঘর, মালোপাড়ার ঘর......ও নলেন বউ, তুমিও এসো তবে। গুড় রাখব। ঝোলা গুড়, তালপাটালি, যখন যেমন। খেজুর রসও এনো শীতে। তারপর গল্প কোরো পা ছড়িয়ে। এর কথা, তার কথা।

এক ঠিকানা খুঁজতে এসে, এক ঠিকানা খুঁজে পাওয়া। মনে মনে তাই কুড়িয়ে পৃথা কোথায়, পৃথার মা ফিরছে যেন শেষে। ভ্যান-রিক্সায় একা একা। নীল সাদা শাল নেমে গেছে কোলের ওপর, জংলা আঁচল বাতাস বাতাস। বুকটা যখন তাপে তাপ, তখন কি আর ঠান্ডা লাগে? মাঘ-বিকেলেও?

যক্ষ

ছোট কাকার কাজে শেষ পর্যন্ত সব ভাই বোনই হাজির হবে, ভাবতে পারে নি দেবাশিস। কিছুটা কর্তব্যের খাতিরে, কিছুটা মানসিক তাড়নায় সে ছুটে এসেছিল এখানে। উঠতে বসতে তার জন্য কম কথাও শুনতে হচ্ছে না পরমার কাছে। মণিশংকরকে দাহ করে আসার পর সে যখন সিদ্ধান্ত নেয় একেবারে কাজ টাজ সব সেরে কলকাতায় ফিরবে, তখনই ফেটে পড়েছিল পরমা, —কেন, তোমার এত কিসের ঠেকা শুনি? তুমি ছাড়াও তোমার কাকার আরও ভাইপো ভাইঝি আছে! তুমি কেন একা করে মরবে?

দেবাশিস এ কথার উত্তব দিতে পারে নি। আসলে তার চরিত্রের একটা বিশ্রী দুর্বল দিক আছে। সে বড় সহজেই নরম হয়ে যায়। পরমা বলে, চিরটাকাল লোকে শুধু তোমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করে নেবে। তুমি একটি রামবোকা।

দেবাশিস এ ধবণেব কথায় যথেষ্ট আঘাত পায়। ছোটবেলা থেকে আত্মীয় মহলে কর্তব্যপরায়ণ ভাল ছেলে বলে তার একটা সুনাম আছে। সব বুঝেও কারুর মুখের ওপর না বলতে পারে না সে। মণিশংকরের অসুখের খবর পেয়েই কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিল। স্বামীর পুণ্যে স্ত্রীর পুণ্য অর্জন করার লোভে পরমাও।

বেশ কিছুকাল ধরেই নানান রোগব্যাধিতে ভুগছিলেন মণিশংকর। বয়সও হয়েছিল। শেবের দিকে লাঙস্ হার্ট কিডনি সবই বিগড়ে বসেছিল এক সঙ্গে। এখানকার জ্ঞাতিরাও বাব বার খবর পাঠাচ্ছিল কলকাতায। দেখাশোনা করার লোক নেই, চিকিৎসার জন্য টাকা পয়সাও দরকার। খবর পেয়ে দু একজন অবশ্য এসে দেখে গেছে। বাকিদের কর্তব্য দুশো একশো টাকা পাঠিয়েই সারা।

এই তো কিছুদিন আগে রাজীব আর ঝুমারা এসেছিল। তখনও অনেকটা ভাল ছিলেন মণিশংকর। তারপর হঠাৎ যে এতটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে কে জানত! দেবাশিস আর পরমা যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন প্রায় কথা বন্ধ হয়ে গেছে মানুষটার।

দেবাশিসের মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কী ভীষণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন মানুষটা! আশপাশের জ্ঞাতিরা এসে দেখাশোনা করে যায়, পাড়ার একটি ছেলে রাতে থাকে পাশে। ছোটকাকার মতো দাপুটে মানুষের কী অসহায় অবস্থা! খুব বেশি আত্মনির্ভর আব জেদী ছিলেন ছোটকাকা। বিয়ে থা করেন নি, এখানকারই এক গ্রামীণ ব্যাংকে কাজ করে গেছেন আজীবন। দাদারা যে যার চাকরি নিয়ে কলকাতা চলে যাওয়ার পর একা একাই থেকেছেন এত বড় বাড়িটায়। বড় গভীর মায়া ছিল তাঁর এই প্রাচীন পরিবেশটার ওপব। বছরে একবার করে কলকাতা যেতেন। যেতেনই। পালা করে ভাইপো ভাইঝিদের বাড়ি উঠতেন।

কাকাকে দেখে এত কষ্ট হয়েছিল দেবাশিসের যে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে সে চব্বিশ ঘন্টার জন্য দুটো নার্সের বন্দোবস্ত করে ফেলে। মণিশংকরের যে ডাক্তার বন্ধুটি শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কল দিয়ে ফেলে এখানকার সবচেয়ে নামীদামী ডাক্তারকে। পরমার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই। ছোটকাকার ওপর তার যে খুব টান ছিল, তা নয়। তবু তার বুকটা কেমন টনটন করছিল। মনে হচ্ছিল একটা পুরনো সময় যাকে এতকাল গভীর যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ছোটকাকা, তা যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে কালের গর্ভে। এই যে সাবেকি আমলের খানদানি বাড়িটা, অযত্নে অবহেলায় যার চতুর্দিকে নোনা ধরে গেছে, শ্যাওলাধরা কার্নিশের বুকে লক্ষ আগাছা, বার্মা টিকের দরজা জানলায় মলিন বর্ণহীনতা, রঙিন শার্সিতে অজস্র বাদামী ছোপ, এই যে বড় বড় ঘর, উঁচু উঁচু সিলিং, কড়িবরগা —এ সবই কি পূর্ব প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেয় না? এরা কি শুধুই কালের স্বাক্ষর? উত্তর পুরুষদের তারা কি ডাকে না হাত বাড়িয়ে?

পরমা বলেছিল, —তুমি কেন এত আদিখ্যেতা করছ বলো তো?

দেবাশিস আলতো হেসেছিল, —কাউকে না কাউকে তো একটা করতেই হয়।

—তাবলে তুমি একা সব করে মরবে কেন? আরও যারা আছে তাদেব খবর পাঠাও, তারাও দেখুক এসে। কাকা কি তোমার একার?

এ কথার কোন সদুত্তর নেই। দেবাশিস ভাল মতোই জানে আব কোন

ভাইবোনই স্বেচ্ছায় টাকা ঢালতে এগিয়ে আসবে না এখানে। ছোটকাকার জন্য কারই বা এত টান আছে!

শুকনো মুখে দেবাশিস বলেছিল,—কি করি বলো তো? মানুষটাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাব?

পরমা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তবে কথাও বাড়ায় নি আর। পরদিন বিকেলে মণিশংকর যখন মারা যান, দেবাশিস তখন বউ নিয়ে নদীর ধারে একটু হাওয়া খেতে গেছে। নার্স রয়েছে পাশে, সকালে ডাক্তারও চলে গেছে, অবস্থা সামান্য উন্নতির দিকে, দেবাশিস ভেবেছিল ভূতের মতো বাড়িতে বসে না থেকে একটু বেড়িয়েই আসা যাক।

শ্মশান থেকে ফিরে দেবাশিস প্রথমে স্থির করেছিল, পরদিনই ফিরে যাবে। পারল না। জ্ঞাতিরা বলল, ছেলের কর্তব্যটা যে তোমাকেই করতে হবে দেবু। তুমি মুখে আগুন দিয়েছ তাছাড়া ভাইপোদের মধ্যে তুমিই সব থেকে বড়।

অগত্যা দেবাশিসই সকলকে খবর পাঠিয়ে ছিল। যদি কেউ আসতে চায় আসুক।

এগারো দিনে কাজ। আট দশ দিনের মাথায় একে একে সকলে আসতে শুরু করল, প্রথমে এল রাজীব আর রাজীবের বউ। টুটুল বউ বাচ্চা নিয়ে গাড়িতে এল সোজা। সঙ্গে খুকু আর তার দুই মেয়ে। কাজের আগের দিন বিকেলে এল বাবু, বাবুর বউ আর ছেলে। তুলতুলি, তুলতুলির মেয়ে আর কুমকুম। খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইবোন মিলে বাড়ি একেবারে সরগরম। আসে নি কেবল রুনু আর ঝুমা। ঝুমার মেয়ের সামনে পরীক্ষা, তার পক্ষে আসা এখন অসম্ভব। আর রুনু তো বউ বাচ্চা নিয়ে সেই কুয়েতে। পরমাও এ কদিনে প্রাচীন পরিবারের গৃহিনী পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। বাড়িঘর পরিষ্কার করানো থেকে শুরু করে সমস্ত রকম কাজকর্মে তদারকি করছে। শুধু ছোটকাকার ঘর সাফ করতে গিয়েই কত কি যে বেরোল!

নানান রকম শৌখিন জিনিস কিনে জমিয়ে রাখার বাতিক ছিল মণিশংকরের। লাইটার ঘড়ি রেডিও টর্চ কী নয়! বাক্স আলমারি খুলে পরমার চক্ষু চড়কগাছ। শুধু দেশি বিদেশী লাইটারই রয়েছে পঞ্চাশ রকমের। পকেট ট্রানজিস্টার আর নানান মাপের রেডিও গোটা পনেরো। টেবিলঘড়ি গোটা আটেক, দেওয়াল ঘড়ি ছটা, রিষ্টওয়াচ খান দশেক। এ ছাড়া রুমাল তোয়ালে তো রয়েছে গোছা গোছা। সবই নতুন। সুটকেস ভর্তি একদিনও ব্যবহার না করা ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবী শাল দোশালা। একটা টিনের বাক্স বোঝাই শুধু খুচরো পয়সায়। আরও টুকিটাকি কত কি তার ইয়ত্তা নেই।

পরমা বাছাবাছি করে কূল পায় না। চকচকে চোখে একবার এটা ঘাঁটে, তো

একবার ওটা। নাড়ানাড়ি করে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। ছুটে এসে দেবাশিসকে বলে, —এই ডিমশেপের টাইমপিস্‌টা কিন্তু আমি সরিয়ে রাখলাম। ভাইবোনেদের কাছে তুমি আবার যেন ব্যাকব্যাক করে বলে দিও না।

দেবাশিস উদাস গলায় বলে, —ছোটকাকা এত কিছু জমিয়ে রেখেছিল কেন বলো তো?

—কেন আবার। শখ ছিল, তাই।

—শুধুই শখ? আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না, এত কিছু আঁকড়ে থাকার পেছনে মানুষটার কোথাও একটা ভীষণ একাকীত্ব ছিল?

—কি জানি বাবা, অত শত বুঝি না। পরমা ঠোঁট ওলটায়, —তবে যাই বলো বাপু, আচ্ছা কিপটে ছিলেন তোমার ছোটকাকা। প্রাণে ধরে কিছুটি ব্যবহার করেন নি, শুধু জমিয়েই গেছেন।

দেবাশিস আরও আনমনা হয়ে যায়। সত্যি তো, ভোগ না করে শুধুই কেন সঞ্চয় করেছেন মণিশংকর? এই সঞ্চয় কি শুধুই নিঃসঙ্গতার অবলম্বন, নাকি আরও কোন গূঢ় মানসিক কারণ আছে এর পিছনে? আগেকার দিনের মানুষ, ছোটবেলা থেকে কোনদিনই তাঁকে কোন রকম বিলাসিতা করতে দেখেনি দেবাশিস। নেশার মধ্যে ছিল বিড়ি। বাড়িতে থাকলে পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। শীতকালে একটা ছাই রঙের মলিদা জড়াতেন গায়ে। বাইরে বেরোলে ধুতি আর ঝোলা ফুলশার্ট। অথচ আলমারিতে থরে থরে দামী ধুতি, গরদ তসরের পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী শাল। তবে কি ছোটকাকার মনেও আধুনিক জীবনের সাধ আহ্লাদ ছিল? রক্ষণশীলতার মুখোশে আড়াল করে রাখতেন নিজেকে? আত্মীয় স্বজন মহলে চিরকাল রসকষহীন একাঘেঁড়ে মানুষ বলে বদনাম ছিল ছোটকাকার।

যত নতুন নতুন জিনিস আবিস্কার হয়, ছোটকাকার সম্পর্কে কৌতূহল তত বাড়ে দেবাশিসের। কাজের আগের দিন রাতে ভাইবোনেরা যখন মণিশংকরকে নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে, তখনও সকলের কথার মাঝে আসল মানুষটাকে খোঁজার চেষ্টা করে চলেছে সে।

খুকু বলে, —ছোটকাকা শেষদিকটায় বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। আহা, একা মানুষটাকে সেবা করার জন্য কেউ ছিল না গো।

টুটুল গম্ভীর মুখে সিগারেট ধরায়, কে নিজের সংসার ফেলে, কাজকর্ম ফেলে এখানে পড়ে থাকতে পারত বল?

—ঠিক বলেছিস। আমরা এতগুলো ভাইবোন ছিলাম. ছোটকাকা ইচ্ছে করলে দিব্যি আমাদের কাছে পালা করে থাকতে পারতেন। এই ভাঙা প্রাসাদে পড়ে থেকে কী সুখ যে পেতেন কে জানে!

—আসলে বড় বেশি বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। বিয়ে টিয়ে না করলে যা হয় আর

কি। বাবুর বউ এর খোলাখুলি মন্তব্য এবার।

—রাজীব ছাদে পায়চারি করছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, —ছোটকাকার জমানোব বাতিক ছিল জানতাম, তাবলে এতটা ভাবতে পারি নি।

-- কেন ওভাবে জিনিস জমাতেন, আমি বলব? টুটুলের বউ চোখ ঘোরায়, —আসলে ওই সব জিনিসের ওপব কাকাব খুব লোভ ছিল।

—তাছাড়া আবার কি? তুলতুলি ফুট কাটে, —মারা গেছেন, এখন আর বলা উচিত নয়, তবু বলি। ছোটকাকার কিন্তু প্রিটেনশান কম ছিল না। এমন ভাব দেখাতেন যেন কত সাদামাটা জীবন পছন্দ করেন, এদিকে তলে তলে....

—আমার কি মনে হয বলব? বাজীবের বউ বলার আগেই হেসে কুটিপাটি, —তোমাদের কাকার বোধহয় মনে মনে বিয়ে করার খুব শখ ছিল মুখ ফুটে বলতে পারতেন না। আব তাই দুঃখ ভুলতে ... ..

—উঁহু, আমার তো মনে হয়, এ এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা। সেলফিসনেস্।

—ঠিক বলেছিল। এত কিছু করেছেন অথচ আমাদেরতো দূরের কথা, আমাদের বাচ্চাদেরও কখনও হাতে করে কিছুটি দ্যান নি। বাড়িতে গেলে একগাদা শুধু লজেন্স বিস্কুট কিনে নিয়ে যেতেন। খুকুর মুখে বাঁকা হাসি।

—যাহ্ ঝুমাকে ছোটকাকা খুব ভালবাসতেন। পরমার গলায় স্পষ্ট ব্যঙ্গ এতক্ষণে, —ওকে যা দেওয়ার ঠিক দিতেন। বিয়ে হয়ে ইস্তক তো দেখছি, ছোটকাকা আজীবন ঝুমা বলতে অজ্ঞান।

—ঝুমার কিন্তু আসা উচিত ছিল। টুটুল দেবাশিসের দিকে তাকায়, —আসার আগের দিন ফোনে কত করে বললাম, খালি অ্যাভয়েডিং টেণ্ডেন্সি!

—ঝুমা মাঝে একবার এসে ছোটকাকাকে দেখে গেছে না? দেবাশিস নিজের বোনের দোষ আড়াল করার চেষ্টা করল। এতক্ষণে।

—হ্যাঁ, ওই তো আমরা যখন এসেছিলাম। ও আর ওর বর.....

—ছোটকাকা নাকি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওর নামেই তখন ট্রান্সফার করে দিয়েছে? সত্যি?

—কি জানি বাবা। পবমার মুখ সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে গেছে, —এদিকে চিকিৎসার জন্য তোমার দাদার তো বেশ মোটা টাকা খরচ হয়ে গেল।

—কেন, তোমার দেওর তো মানি অর্ডার করেছিল! বাবুর বউ চটপট বলে উঠল।

—আমিও তো কিছু পাঠিয়েছি। টুটুলের স্বরে ঈষৎ বিবক্তি।

দেবাশিস তাড়াতাড়ি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল, —ওসব কথা এখন থাক না। টাকা সকলেরই কিছু কিছু খরচ হয়েছে। তবে তাতেও কিন্তু আমরা ছোটকাকাকে ধরে বাখতে পারি নি।

—মারা গেছেন একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। একা কষ্ট পাচ্ছিলেন...

—হ্যাঁ, এখন এই এত জমিজমা আর বাড়িঘর নিয়েই সমস্যা।

জমিজমার কথা উঠতে বাবু ঝুঁকল দেবাশিসের দিকে, —বড়দা, সেই ভদ্রলোকেব সঙ্গে তোব কথা হয়েছে?

—মোটামুটি। দেবাশিস ছাদে পাতা মাদুরে শুয়ে পড়ল, — ভালই দর পাওয়া যাচ্ছে।

—পরশু ভদ্রলোককে একবার ডেকে পাঠা না।

—ওটা পরে করলে হয় না? দেবাশিস ইতস্তত করল, —অনেক দিন কামাই হয়ে গেছে। ভাবছিলাম পরশু সকালেই ফিরব।

টুটুল সোজা হল, —তুমি চলে যাও না। আমরা তো এসে গেছি। আমরাই সব ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করে....

পরমা বলে উঠল, —না না, তোমার দাদাও থাকবে। এতদিন থাকতে পারলাম আর দুটো দিন....

দেবাশিস বলল, —দেখা যাক। কাল আগে ভালয় ভালয় কাজটা তো চুকুক।

রাতে দেবাশিসকে একা পেয়ে ধমকে উঠল পরমা, —সব ব্যাপারে ভালমানুষি দেখাতে যেও না তো। তোমার ভাইবোনেদের আমি একটুও বিশ্বাস করিনা। সব কটা এসেছে নিজের ধান্দায়।

দেবাশিসের মনটা খারাপ লাগছিল। কতদিন পর সব ভাইবোন একসঙ্গে হয়েছে, সেই বোধহয় ঝুমার বিয়ের পর। কত গল্প হচ্ছে, কত আড্ডা, এর মধ্যে কেন যে স্বার্থ এসে হানা দেয়। তাছাড়া সবে দশ দিন হল ছোটকাকা মারা গেছেন, এখন কোথায় সবাই তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি ভাল ভাবে করার কথা ভাববে, তা নয়.....!

বিস্বাদ মুখে দেবাশিস বলল, —এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে? কাগজপত্র সব আছে, কেউ কাউকে ঠকাতে পারবে না। আর ইচ্ছে করে ওরা আমাদের ঠকাবেই বা কেন?

পরমা বলল, —হ্যাঁ হ্যাঁ, উচিত কথা বললেই আমি খারাপ। এত তো ভাইবোন করে মরো, ওরা তোমার সম্পর্কে কি বলছে জানো?

—কি বলছে?

—আমরা এতদিন ধরে আছি বলে একশো কথা উঠছে। বলে কিনা আমরা নাকি আগে ভাগে এসে সব ভাল ভাল মাল সরিয়ে ফেলেছি।

—কে বলেছে?

—সব্বাই। তোমার ভাই বোন ভাই এর বউরা... । সামনে অবশ্য বলে নি। দুপুরে বড়ঘরে আলোচনা হচ্ছিল, আমি শুনে ফেলেছি।

—হুঁ।

—সামনাসামনি অবশ্য বলার সাহস নেই কারুর। পরমা গলা নামাল হঠাৎ, —হ্যাঁগো, শ্রাদ্ধের খরচাপাতি কেউ কিছু দেবে বলল?

দেবাশিস ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চোখ বুজে বলল, —বলছে তো খরচ যা হচ্ছে সকলে ভাগাভাগি করে দিয়ে দেবে।

—দিলেই ভাল। যা ছোট মন তোমার ভাইবোনদের। রেডিও ঘড়ি লাইটারগুলো নিয়ে কী কামড়াকামড়িই না করছে!

দেবাশিস মনে মনে বলল, করুক গে। তুমিও তো কম হাতিয়েছ বলে মনে হয় না।

খুকু তুলতুলি আর কুমকুম বড় ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়েছে। রাজীব টুটুল বাবু যে যার বউ বাচ্চা নিয়ে আলাদা আলাদা ঘরে।

কোলের মেয়েটাকে চাপড়াতে চাপড়াতে খুকু বলল, —বউদির কাণ্ডখানা দেখলি? কতগুলো ফরেন লাইটার পুটপুট ব্যাগে ভরে ফেলল। আমার খুব ইচ্ছে ছিল জার্মান লাইটারটা তোর জামাইবাবুর জন্য নিয়ে যাওয়ার.....

কুমকুম উত্তেজনায় উঠে বসেছে বিছানায়, —তাও বাবুর বউএর হাতানো তো দেখিস নি। হাপুস হুপুস যা পারছে কিটব্যাগে ভরছে। চওড়া জরিপাড় ধুতি একখানা আমার চোখের সামনে দিয়ে গায়েব করে দিল।

—ওদের উচিত ছিল ছোটকাকার সব কিছু আমাদেরই দিয়ে দেওয়া। আমরা তো আর সম্পত্তির টাকায় ভাগ বসাতে যাচ্ছি না।

—কেন যাচ্ছি না? জমি বাড়ি বিক্রির টাকায় আমাদেরও সমান ভাগ।

—নিশ্চয়ই। আমরা কিন্তু একদম ভালমানুষি দেখাব না বলে দিলাম। তুলতুলি ছেলেকে ঠিক করে শোওয়ালো, — যে যেমন খুশি হাতিয়ে নেবে, হকের জিনিস আমরা চাইলেই দোষ?

—ইশ, ছোট বউদিকে তো সকালে দেখিস নি! কী নির্লজ্জের মতো গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটা দেওয়াল থেকে পেড়ে বেঁধে ছেদে নিল!

—আর বড়টি? তিনি যে কত সরিয়েছেন তার হিসেব আছে!

—কাজটা শেষ হোক, কাল ঠিক ওদের মুখের ওপর আমি কথা শুনিয়ে দেব, দেখিস।

হ্যাঁ, কাজটা শেষ হোক। পাশের ঘরে টুটুলের বউও একই সময়ে কথাটা বলে স্বামীকে, —আমাকে মুখরা বলুক আর যাই বলুক, আমি ছেড়ে কথা বলব

না।

টুটুল বলে, —একটা ভাল ট্রানজিষ্টার পারলে ম্যানেজ কোরো তো।

—একটা কেন, দুটোই নিয়েছি। ছোট্ট পকেট ট্রানজিষ্টারটা নেওয়ার খুব শখ ছিল, খুকু তার আগেই ওটা হাতিয়ে নিল।

রাজীব বাবুরাও যে যার ঘরে একই কথায় রাত বাড়ায় তখন।

পরদিন সকালেই অবশ্য যে যার মুখোশ পরে অন্য রকম। দল বেঁধে কাজ করছে, হাসছে, গল্প করছে। জনা সত্তর জ্ঞাতি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, দুপুরে সব চুকে বুকে যাওয়ার পর দেবাশিস একা ঘরে চুপচাপ শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। মেজাজটা তার কাল থেকেই বিগড়ে আছে। অসুস্থ বৃদ্ধের মৃত্যু হবে এ তো অবধারিত ঘটনা, তবু একটা মানুষ চলে গেল পৃথিবী থেকে, তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না কেউ? বউগুলো নয় পরের বাড়ির মেয়ে, কিন্তু তার ভাইবোনেরা? দেখে মনে হয় সকলেই ছোটকাকার সঞ্চিত সম্পত্তির লোভেই ছুটে এসেছে, ছোটকাকার জন্য এক বিন্দু ব্যথা নেই কারুর। কেন নেই?

ভাবতে ভাবতে দেবাশিস উঠে বসল। একে শারীরিক ক্লান্তি, সঙ্গে মানসিক অবসাদ, দেহটা যেন খুলে পড়তে চাইছে। সকাল থেকে উপোস আছে, তবু যেন ক্ষিধে তেষ্টা ধারে কাছে ঘেঁষছে না দেবাশিসের।

পায়ে পায়ে দেবাশিস টানা বারান্দায় এল। দোতলায় এখন কেউ নেই, সবাই নীচে খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত, চিৎকার হাসির শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। টানা লম্বা বারান্দা ধরে হাঁটতে লাগল দেবাশিস। হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। কোণার দিকে ছোটকাকার ঘরটা কী ভীষণ খাঁ খাঁ করছে। আসবাবপত্র সব সরিয়ে এ ঘরেই কাজ হয়েছে আজ। সমস্ত দরজা জানলা হাট করে খোলা। শূন্য ঘরে জলচৌকির ওপর মোটা গোড়ের মালা পরে ছবি হয়ে আছেন ছোটকাকা। মেঝেতে ধূপের ছাই, ফুলের টুকরো, প্রদীপের পোড়া তেল।

দেবাশিস ঘরের মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল। কদিন পর কোথাওই ছোটকাকার স্মৃতি থাকবে না আর। বাড়ীটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শীগ্গীরই। একটা সময় হারিয়ে যাবে কালের অন্ধকারে। আঁতিপাতি করে চারদিক হাতড়াতে থাকল দেবাশিস, যদি এক টুকরো সময়ও খুঁজে পাওয়া যায়। সিমেন্টের তাকে এক তাড়া কাগজ। প্লাষ্টিকে মোড়া। কেউ বোধহয় টেনে বার করেছিল বাক্স থেকে, হাবিজাবি ভেবে ফেলে গেছে অবহেলায়।

কাগজের গোছা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল দেবাশিস। ইলেকট্রিকের বিল, মাসকাবারি হিসাব, ছোট ছোট চিরকুটে লেখা অজস্র ঠিকানা। নীচের দিকে

এক তাড়া চিঠি। দেবাশিস একটা চিঠি খুলল।

আদরের কুমকুম, বিয়ের পর বরকে নিয়ে একবারও এলি না কেন? আমি সংসারী নই, কিভাবে ভালবাসতে হয় জানি না, তবু তোদের কাছে পেতে খুব ইচ্ছে করে। খুকুর জণ্ডিস হয়েছে শুনলাম, সাবধানে থাকতে বলিস। ছোটবেলা থেকেই ওর লিভারটা খারাপ।

কুমকুমের তো অনেকদিন বিয়ে হয়েছে, কবে এই চিঠি লিখেছিল ছোটকাকা!

দেবাশিস দ্বিতীয় চিঠি খুলল। স্নেহের দেবু, তোমাদের অনেকদিন দেখি নি। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। শরীরটা খারাপ বলে এবার আর পুজোয় কলকাতা যাওয়া হল না....

তৃতীয় চিঠি খুলল দেবাশিস। ইন্‌ল্যাণ্ড লেটারে লেখা। স্নেহের বাবু, ছোটকাকাকে কি একেবারে ভুলে গেলি? রুনুটাও কুয়েত যাওয়ার আগে একবার দেখা করে গেল না। আমি নিজেকে তেমন ভাবে প্রকাশ করতে জানি না। কি করে বোঝাই...

কোন চিঠি শেষ করতে পারছিল না দেবাশিস। বাষ্পে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অক্ষরগুলো। নাম করে করে সকলের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতেন মনিশংকর, কিন্তু একটা চিঠিও কখনও ডাকে দেন নি! নিজের দাদা বউদির লেখা চিঠিও আছে। মা বাবাকেও। কিছু চিঠি হলদে হয়ে গেছে, কিছু পোকায় কাটা, সাম্প্রতিক কালেরও আছে কিছু কিছু। ঘড়ি ট্রানজিস্টার রেডিওর মতো এগুলোও মণিশংকরের গোপন সঞ্চয়।

কি করা যায় এখন? যাদের চিঠি তাদের হাতে দিয়ে দেবে? দিলেও কি পৌঁছবে সঠিক অর্থে? ঠিক ঠিক জায়গায় সব চিঠি পৌঁছে দেওয়ার মতো ডাকঘর কি এই দুনিয়ায় আছে!

দেবাশিসের হঠাৎ বড় রাগ হচ্ছিল ছোটকাকার ওপর। সত্যিই বড় কৃপণ ছিলেন ছোটকাকা। নিজের হৃদয়ের অনুভূতিগুলোকে পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছেন লোভী যক্ষের মতো।

সবাই তো অনেক কিছু হাতাল, এই সঞ্চয়টা নয় দেবাশিসের-ই অধিকারে থাক। দ্রুত প্যাকেটশুদ্ধু কাগজগুলোকে ব্যাগে ভরে নিল দেবাশিস।

লুকোচুরি

দরজায় বেল বাজতেই মনটা নেচে উঠল নন্দিনীর। দরজা খুলে খুশির ঝরনা হয়ে গেল। ওরা এসে গেছে।

সকাল থেকেই আজ হানটান করছে নন্দিনী। নিজের হাতে বাজার করেছে, রেঁধেছে, খেটেখুটে গুছিয়েছে ফ্ল্যাটটাকে। ড্রয়িংরুমের সোফা, সেন্টার টেবিল, টিভি স্ট্যান্ড, টেবিল ল্যাম্প, সব কিছুর ধুলো ঝেড়েছে পরিপাটি করে। অনেক দিন ধরে শোকেসে কাচের পুতুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে ছিল, সেগুলোকে দাঁড় করিয়েছে সার সার। রান্নাঘর সাজিয়েছে, বাথরুম তকতকে করেছে। নোংরা পর্দা পাল্টে দরজা-জানলায় ঝুলিয়েছে একরঙা ভারী পর্দা। বাবলার জিনিসপত্র রাখার কোনো ছিরিছাঁদ নেই, এখানে জুতো পড়ে রইল তো ওখানে মোজা, দেওয়ালের পাশে খেলার সরঞ্জাম, যত্র তত্র বইখাতা -- সব আজ যথাস্থানে। এক ফুলদানিতে রেখেছে হাইব্রিড রজনীগন্ধা, অন্যটায় গ্ল্যাডিওলা আর অ্যাস্টাব। নরম সুবাসে ম-ম করছে চারদিক। শোওয়ার ঘরেও আজ জমকালো বেডকভার। নিজেদের ঘরে নীল সাদা, ছেলের ঘরে সূর্যহলুদ। ড্রেসিং টেবিলেও প্রতিটি প্রসাধনী টিপটপ সাজানো, যেমনটি কালেভদ্রে ঘটে থাকে। বাবলা তো স্কুল যাওয়ার আগে ঠাট্টাই ছুঁড়ে গেল, — সত্যি কি তোমার বান্ধবীরা আসছে মা? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা জাপানের সম্রাট নয় তো?

তা সে ঠাট্টা গায়ে মাখেনি নন্দিনী। কতকালের পুরনো বন্ধুরা আজ আসছে বাড়িতে, এ কি কম উত্তেজনার কথা! ছেলে এখনই এর মর্ম বুঝবে কি করে। গত রোববার স্কুলের গোল্ডেন জুবিলি ছিল, প্রাক্তনীরা সবাই মিলেছিল সেখানে। নন্দিনীদের ব্যাচের সবাই অবশ্য আসেনি, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে শুধু কল্পনা আর

রত্না। সেদিনই প্ল্যানটা ছকেছিল তিন বন্ধু। কতকাল একসঙ্গে বসে মনের প্রাণের কথা বলা হয় না রে। একটা দিন আমরা তিনজন বসতে পারি না? তা শুধু বসা কেন, নন্দিনী ওদের নেমন্তন্নই করে দিল। খাওয়া-দাওয়া হবে, গল্প আড্ডাও হবে, সারা দুপুর ধরে কলকল করা যাবে মনের আনন্দে। ভাবতেই কী সুখ।

সেই সুখের চাবিকাঠি নিয়ে এসে গেছে কল্পনা আর রত্না। দুজনের হাতে দুটো প্যাকেট। মিষ্টির।

নন্দিনী প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে কৃত্রিম অভিমান আনল গলায়, — তোরা আবার এসব আনতে গেলি কেন?

— বেশি কিছু আনিনি রে। প্রথম দিন তোর বাড়ি এলাম.....

— আমাদের মধ্যে কি ফর্মালিটির সম্পর্ক নাকি? কোনো মানে হয় না।

— ইহুঁহ্, তারপর তোর বর আব ছেলে বলবে, ইশ কী বন্ধু গো তোমার! হাতে করে একটা আলপিনও আনল না!

কল্পনা আর রত্না হাসছে খিলখিল। নন্দিনীও হাসল, কিন্তু ততটা উচ্ছলভাবে নয়। সুব্রত ওরকম কথা বলে না বটে, তবে একটু-আধটু কি আর বেঁধায় না? এই তো সেদিন নন্দিনীর মামাতো বোন সীমা এল বর-মেয়ে নিয়ে, সারাটা দিন কাটিয়ে গেল, ওরা চলে যাওয়ার পর সুব্রত বলেনি, তোমার বোন-ভগ্নিপতি বেশ চিপ্পুস আছে! ছাতা না কিনে হাত দিয়েই মাথা ঢেকে রাস্তায় বেরোতে পারে, আঙুল গলে বৃষ্টির জল ঢুকবে না! অপরাধ তো এইটাই ছিল, খালি হাতে আসা।

নন্দিনী তবু বিস্ময়ের ভাব ফোটাল মুখে। বন্ধুদের বলল, — ওরে বাবা, তোদের বরেরা এসব বলে নাকি? তোদের বাড়ি গেলে তাহলে তো আমাকে চাল-ডাল বেঁধে নিয়ে যেতে হবে।

— যাহ্, তা কেন? দুই বন্ধু যেন কোরাসে কথাটাকে চাপা দিতে চাইল, — তুই মিষ্টি খেতে ভালবাসতিস, সেই জন্যই আমরা....

— খুব করেছিস। আয়, ভেতরে আয়।

চল্লিশ ছোঁয়া দুই বান্ধবী বসেছে সোফায়। সিঁড়ি ভেঙে চারতলা উঠতে হয়েছে, তাই বুঝি হাঁপাচ্ছেও অল্প অল্প। কল্পনার শরীর একটু বেশি ভারী, তার দশাই বেশি কাহিল। আঁচল তুলে ঘাড়-গলা মুছছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে ফ্ল্যাটখানা, দুজনেই।

ফুল পাতা আঁকা সুদৃশ্য ট্রেতে দু' গ্লাস সরবত নিয়ে এল নন্দিনী। সেন্টার টেবিলে আজ কুরুশে বোনা ঢাকনা, তার ওপরে ট্রেখানা রাখল সাবধানে।

কল্পনা গ্লাস হাতে তুলতে গিয়ে থামল, — তুই নিলি না?

— আমার মিষ্টি খাওয়া বারণ রে। সুগার। নন্দিনী রত্নাব পাশে বসল, — তাই তো ভাবছি, তোরা ভালবেসে এত মিষ্টি আনলি, একটাও আমি মুখে তুলতে পাবব না।

রত্না ভুরু কুঁচকে তাকাল, — তুই এর মধ্যে সুগার বাধালি কোথ্‌থেকে?

— ও আমাদের হেরিডিটারি। বাবা-মা-দাদা সব্বার আছে।

— বেচারা। কী আর করবি? বব-ছেলেকেই খাওয়াস্‌।

— সে গুড়ে বালি। ছেলে মিষ্টি দেখলেই নাক সিঁটকোয়, আর বর তো বসে আছে গিয়ে বোকারোতে। ফিরতে সেই নেক্সট উইক।

-- বোকারোতে কেন?

— অফিস ট্যুর। মাসে চোদ্দ দিন এই করেই কাটে।

কল্পনা গ্লাসে চুমুক দিল। হাল্‌কা চালে বলল, — ট্যুরের চাকরি তো ভাল রে। সংসারে পয়সা আসে। আমার মেজ ননদাই সেল্‌সে আছে, ওদের তো শুনি ট্রাভেলিং অ্যালাউন্সেই সংসার চলে যায়। আর মাইনের টাকা ব্যাংকের গর্তে বসে ডিম পাড়ে।

কথাটায় কি কোনো শ্লেষ আছে! বান্ধবীর মুখ দেখে নন্দিনী ঠিক বুঝতে পারল না। হয়তো নেই। এমনিই কথার কথা। তবু কথাটা যেন ফুটল একটু। বলল, — পয়সা যে নেই তা বলব না। তবে ধকলও যায় খুব। আমার ভাল লাগে না। কত বার বলেছি এবার হেড অফিসে একটু থিতু হয়ে বোসো....শোনেই না। বলে ও না দৌড়লে কোম্পানির ব্যবসা নাকি অর্ধেক হয়ে যাবে। কথাটা বলতে পেরে নন্দিনী মনে মনে বেশ তৃপ্তি পেল। মুখ টিপে বলল, — তোরা ভাল আছিস। আমার মতন বর নিয়ে টেনশান করতে হয় না।

—কী বলছিস! রত্না সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়েছে, — ও কাজে বেরোলেই আমার বুক ঢিপঢিপ শুরু হয়ে যায়। শেয়ালদা মেনে পোস্টিং, ওখানে তো নিত্যি গণ্ডগোল লেগে রয়েছে। কোথায় এক ঘন্টা তার ছিঁড়ে পড়ে আছে, ট্রেন চলছে না, ওমনি চেকারকে পেটাও, টিকিট কেটে কেউ ট্রেনে উঠবে না, ধরতে গেলেই মারো চেকারকে। এই তো গেল মাসে কি একটা ঝামেলা হলো, পুলিশ স্টেশনে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ল, আমার বরের চোখ ফুলে ঢোল।...... সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে অবশ্য আমাদের মধ্যে কল্পনাটাই সুখী। বর দিব্যি ঘরের ভাত খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে ইস্কুলে চলে গেল....

— যাওয়াটাই দেখছিস তোরা, ফেরাটা তো আর দেখিস না। কল্পনা খুশি খুশি মুখে আলগা ঝামটা দিল, — তিনি বেরোলেন তো আল্লার নামে বেরোলেন।

ফিরবেন সেই রাত দশটায়।

— অনেক টিউশনি করে বুঝি?

— ও করতে চায় না, কিন্তু উপায় কি! দুটো টিউটোরিয়ালের মালিক হত্যে দিয়ে বাড়িতে পড়ে ছিল। স্যার আপনি এত ভাল পড়ান, দুটো দিন কবে আমাদের জন্য দিতেই হবে। এর সঙ্গে আছে ছেলেমেয়েরা, তারা তো চিনে জোঁকের মতো লেগে আছে। সকাল সাতটা থেকে উৎপাত শুরু করে দেয়। মাঝখান থেকে সকালের ব্যাচটা টানতে গিয়ে বেচারার জলখাবার পর্যন্ত খাওযা হয় না।

নন্দিনী চোখ টিপে বলল, — ভালই তো, তোর বরের মালটুস আসছে।

— তেমন আর আসে কোথায়! আমার বরটির তো আবার দয়ার প্রাণ, ছেলেমেয়েরা হাতে-পায়ে ধরলেই রেট কমিয়ে দেয়। কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে কল্পনা, — তোর বাথরুম কোন দিকে রে নন্দু? ঘাড়ে-গলায় একটু জল দিয়ে আসি। বাইরে যা তাত আজ।

সূর্য আজ সত্যিই বড় প্রখর। বৈশাখের তেজ ফেটে পড়ছে শহরে। জানলায় মোটা পর্দা টান টান, পাখা চলছে ফুলস্পিডে, তবু যেন ঝলসে যায় গা।

নন্দিনী বাথরুম দেখিয়ে ফিরে এল।

হঠাৎ গলা নামিয়েছে রত্না, — চালবাজির কথা শুনলি! বরের নাকি দয়ার প্রাণ, কম পয়সায় পড়িয়ে দেয়! কসাই, এক্কেবারে কসাই। আমার বরের বন্ধুর ছেলে ওর বরের কাছে পড়ে, ছ' মাসের টাকা আগাম জমা দিলে তবে ওব কোচিং-এ বসতে দেয়।

নন্দিনী ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, — একবার কি কোয়েশ্চেন লিক হওয়ার ব্যাপারে ওর বরের নাম উঠেছিল না? কার কাছে যেন শুনেছিলাম?

— উঠেছিল কিরে! পুরোই জড়িয়ে ছিল। পড়ানোর সুনাম না হাতি, ওই জন্যই তো ওর কোচিং-এ অত ভিড় হয়।

— যাক গে, বাদ দে। যে যা বলে আনন্দ পায়। নন্দিনী থামাল রত্নাকে, — আমরা কি শুধু বরেদেরই গল্প করে যাব নাকি? তা হ্যাঁরে, আমাদের ব্যাচের আর কারুর সঙ্গে তোর দেখা হয়?

— কই আর।....... ও হ্যাঁ, একদিন বুলবুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রত্না সোফায় হেলান দিল, — কী ভাল বিয়ে হয়েছে রে বুলবুলের! ডাক্তার বর, ছেলে নৈনিতালে পড়ে, দু' দুটো গাড়ি। একটা গাড়ি তো সবসময়ে বুলবুলের জন্যই রাখা আছে।

নন্দিনী ঝটিতি বলে ফেলল, —গাড়ি তো আমার বরও কিনতে চাইছে,

আমি জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছি। যা তেলের দাম! ও তো ওসব শুনতেই চায় না। বলে, ভিড় বাসে তোমার কষ্ট হয়। বলে, পথে বেরিয়ে ট্যাক্সিঅলার পায়ে ধবার চেয়ে নিজের গাড়ি থাকা ভাল।.. .. এবার বোধহয় কিনেই ফেলবে।

সহসা রত্না যেন খানিকটা অন্যমনস্ক। বিমর্ষও কি? নন্দিনী সামলানোর চেষ্টা করল নিজেকে। বলল, — এসেই তো থ্যাপন জুড়ে বসে পড়লি, আমার ফ্ল্যাটটা দেখবি না?

— তুই দেখালেই দেখব।

— চল্ চল্ ওঠ্।

নিজেদের শোওয়ার ঘর, ছেলের ঘর, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে নন্দিনী। উত্তরের ছোট্ট ব্যালকনিতে গোটা চার-পাঁচ টব রয়েছে, পাতাবাহার গাছের, তাদের সঙ্গেও পরিচয় করাল বন্ধুর। রান্নাঘর দেখাল, লফট্ দেখাল, নিজের ছোট্ট পুজোর জায়গাটা দেখাতেও ভুল হলো না।

রত্না মুগ্ধ চোখে বলল, — কী সুন্দর রে! তুই সাজিয়েও রেখেছিস খুব ভাল।

কল্পনাও এসে গেছে। সেও ঘুরে ঘুরে দেখছে ঘরদোর। প্রশংসার সুরে বলল, — আমাদের সেই পাগলি নন্দিনী কী রকম গিন্নিবান্নি হয়ে গেছে।

নন্দিনী লজ্জা পেল, — আহা, তোরা যেন হোসনি!

— আমাদের কথা আর তোর কথা? এই রত্না, মনে আছে নন্দিনীটা কেমন ন্যালাক্ষ্যাপা ছিল? অর্ধেক দিন স্কুলে আসত, দুটো বিনুনির একটা বাঁধা একটা খোলা, স্কার্টের নিচে ব্লাউজ গোঁজা থাকত না.....। বাংলার দীপ্তিদির কাছে তো রোজ বকুনি খেত, এমন অগোছালো হলে ভবিষ্যতে তুমি ঘরসংসার করবে কি করে!

নন্দিনী যে এখনও খুব গোছালো, তা নয়। নেহাত বন্ধুদের দেখাতে হবে তাই আজ....। নন্দিনী হাসিমুখে বলল, — রত্নাটাই বা কী কম ছিল? মাথায় বই-এর পাহাড় নিয়ে ব্যালেন্স করতে করতে স্কুল থেকে ফিরত.......। একদিন একটা তালসিড়িঙ্গে ছেলে যেই সিটি বাজিয়েছে, ওমনি সব বই হুড়মুড় করে রাস্তায়।

চল্লিশের রত্না পলকে চপলা কিশোরী, — হিহি, তোর এখনও মনে আছে?

— নেই আবার! সেই ছেলেটাই তো আবার বই কুড়িয়ে দিতে এল। আমরা কটমট করে তাকাতেই ভোঁ দৌড়। এই কল্পনা, তুই ছেলেটাকে জুতো দেখিয়েছিলি না?

— আমিই তো তোদের গার্জেন ছিলাম।

— গার্জেন না হাতি, তুই ছিলি ডানপিটে। যত সব ধিঙ্গিপনা তোর মাথায় ঘুরত। মনে আছে নন্দু, কল্পনা সেই মংলু দারোয়ানের পেয়ারা গাছটায় চড়ে বসে আছে, নামছে না, আ[illegible] মংলুর ঘেয়ো নেড়িকুত্তাটা সমানে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে।

—-ইশ্, আমার হাতে সেদিন যদি একটা পেয়ারা থাকত, আমি টিপ করে ছুঁড়ে ওর মুখ বন্ধ করে দিতাম।

— সত্যিই, পেয়ারা সব তো তখন আমাদের কোঁচড়ে। গাছ পুরো ন্যাড়া। বুলবুল আমি নন্দু ঝর্ণা সরমা....

কথা চলছে। ফুলঝুরি ছুটছে। এসব রোমন্থন করতেই তো আজ জড়ো হওয়া। পুরনো দিনের রূপ-রস গন্ধকে নতুন করে খোঁজা। তবু যেন কেমন অসহিষ্ণু বোধ করছিল নন্দিনী। কথা বলতে বলতেই পর্দার কাপড়টা আঙুলে ঘষে জরিপ করল কল্পনা, কিন্তু কই কিছু মন্তব্য করল না তো! রাজস্থানী বেডকভারটায় হাত বোলাল রত্না, বিশেষ কোনো কৌতূহল দেখাল না! এই ফ্ল্যাটটা নিয়েও কি আরও দু'চারটে কথা বলতে পারে না বন্ধুরা!

নন্দিনী ঝুপ করে বলল, — এই, তোরা একটু কথা বল্, আমি ততক্ষণ ফিশফ্রাইটা ফ্রিজ থেকে বার করে আনি। ফিলেগুলোতে অনেকক্ষণ আগে বিস্কুট মাখিয়ে রেখেছি।

— রান্না তুই নিজেই করিস নাকি?

— লোক একটা আছে। টুকুস করে একটা মিথ্যে বলল নন্দিনী, — সে আজ মশলা-টশলা করে দিয়ে চলে গেছে। আমি আজ তোদের খাওয়াব বলে নিজের হাতে সব......। খেয়ে যেন নিন্দে করিস্ না।

— মেন্যু কি করলি?

— গরীবের বাড়ির সামান্য শাক-ভাত। বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে এগোল নন্দিনী, — খেতে বসেই দেখতে পাবি।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দু' পলক ভাবল নন্দিনী। আঙুল ডুবিয়ে পরখ করল মাংসের ঝোল, এখনও গরম আছে। ঘিভাত থেকেও ভাপ উঠছে উষ্ণ। সাড়ে বারোটা তো বাজে, এখনই খাইয়ে দিলে কেমন হয়?

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দিনী গলা উঠিয়েছে, — এই, ফিশফ্রাই ভেজে ফেলব? তোরা এখন খাবি?

— সেই ভাল। খেয়েই নিই আগে। তারপর চুটিয়ে গল্প করা যাবে।

কল্পনা আর রত্না বসেছে শোওয়ার ঘরে। ছ্যাঁকছোক শব্দ হচ্ছে কড়ায়। ও ঘর থেকেও ছিটকে আসছে শব্দ, হাসি। নন্দিনী কান খাড়া করল। তাকে

নিয়েই কি আলোচনা হচ্ছে কিছু? গাড়ি কেনার কথাটা বলা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। বাড়াবাড়ি কিসেব? সত্যি তো একদিন কথটা তুলেছিল বাবলা, সুব্রত নন্দিনী অবশ্য আমল দেয়নি। এই ফ্ল্যাটের দেনাই এখনও জগদ্দলের মতো ঘাড়ে চেপে আছে। মাস মাস চারটে হাজার টাকা ধ্বসে যায়। বার বার ট্যুব না নিয়ে সুব্রতর উপায় কি। বত্না বাড়াবাড়ি ভাবল তো বয়েই গেল। ওর ববটা কি? টিকিট চেকার মানে নির্ঘাৎ এক রাশ সিকি আধুলি নিয়ে বাড়ি ফেরে। তাতেই তো দিব্যি বাড়ি হাঁকিয়ে ফেলেছে। হোক না একটু গ্রাম গ্রাম জায়গায়, টাকা তো লেগেছে। ওই বাড়িব গল্প শোনাতে স্কুলে সেদিন রত্না একেবারে পঞ্চমুখ। ওর বরের চোখ টিয়ার গ্যাসে ফুলে ঢোল হয়েছে, না ঘুষ নিতে গিয়ে ধোলাই খেয়ে, তা কে যাচাই করতে গেছে!

ছি ছি, এসব কি ভাবছে নন্দিনী? বন্ধুদের না ভালবেসে ডেকে এনেছে আজ? কোন সে সুদূর শৈশব কৈশোরের মিতা সব, তাদের নিয়ে এরকম চিন্তা কি শোভা পায়?

বাবলা স্কুলে যাওয়ার পর সুন্দর করে স্যালাড কেটেছিল নন্দিনী, ইংরিজি রান্নার বই-এর ছবির মতো। শশা পেঁয়াজ গাজর ধনেপাতা দিয়ে। টোম্যাটো থাকলে আরও খুলত। কি আর করা, অসময়ে এখন টোম্যাটোর যা দর!

প্লেট সাজিয়ে বন্ধুদের ডাকল নন্দিনী। একসঙ্গে খেতে বসেছে তিন বান্ধবী। চলছে লঘু আলাপচারিতা। কল্পনার বর ফিশফ্রাই মুখে তোলে না, তার রোজ কম করে একশো গ্রাম মৌরলা মাছ ভাজা চাই। তাতে নাকি ব্রেন টাটকা থাকে। রত্নার বর আবার মাংস খাওয়ার যম, কিবা মুরগি কিবা খাসি। নন্দিনীর বর নন্দিনীর হাতের এই ঘিভাতটার জন্য পাগল, চেটেপুটে খায়। বলতে বলতে অকারণ হাসিতে ভেঙে পড়ছে তিন বন্ধু। ছেলেমেয়েদের বিচিত্র সব খেয়ালিপনা নিয়েও হাসির ফোয়ারা উঠছে বার বার।

কথায় কথায় এক সময়ে কল্পনা বলল, — তোর ফ্ল্যাটটা কত স্কোয়্যার ফিট রে?

— ছশো সত্তর। প্রিয় প্রসঙ্গ পেয়ে নন্দিনী ঝলমল কবে উঠল,

— তাতেই পাঁচ লাখের ওপর পড়ে গেল।

— নিলি তো নিলি, চারতলায় নিলি? গরমকালে তো খুব কষ্ট।

দোতলা-তিনতলায় নিলে পার স্কোয়্যার ফিট আরও তিরিশ টাকা করে বেশি পড়ত, তার মানে আরও পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা। এই যে হয়েছে তাই না কপাল।

নন্দিনী ঢোক গিলে বলল, — আমার তো দোতলাই ইচ্ছে ছিল। আমার

বরের জন্য হলো না। যা পিটপিটে। ধুলোবালির বাতিক, মশার বাতিক। ছেলেরও খুব উঁচুতে থাকার শখ।

— আমি তো বাবা মরে গেলেও চারতলায় নিতে রাজী হতাম না।

রত্না জিজ্ঞাসা করল, — তোরাও কি কিছু কেনা-টেনার চেষ্টা করছিস?

— ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু বুড়ি শাশুড়িকে ফেলে যাই কি করে বল্?

— শাশুড়িকে নিয়ে যাবি।

— ও বাবা, বুড়ি ওই মান্ধাতার আমলের বাড়ি ছেড়ে নড়বে? তার শ্বশুরভিটে বলে কথা। ওর বন্ধুরা তো কো অপারেটিভ করে কত বার সাধল, আমার বর মাকে ছেড়ে নড়বে না।

নন্দিনী ফিক করে হাসল, — মাস্টারমশাই তাহলে মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ!

রত্না বলল, — বিদ্যাসাগরও বলতে পারিস্। নেহাত কলকাতায় একসঙ্গে আছে বলে এখনও দামোদর পার হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। আমার বরের বাবা ওসব নেই, আমি যা বলব তাই হবে। আমি না চাপ দিলে কোনোদিন বাড়িঘব হতো!

— আমার বরের ভাই উপায় ছিল না। আমার শ্বশুরবাড়ির গুষ্টি যা বড়, ওর অফিসের লোক এলে বসতে দেওয়ার জায়গা পাওয়া যেত না। বলতে বলতে একটু টেনে দিল নন্দিনী, — আমার বরকে আবার মাঝে মাঝে বাড়িতে পার্টি দিতে হয় কিনা।

ঘুরে ফিরে আবার সেই একই গর্তে ঢুকে পড়েছে তিন জন। বেরোনর জন্য আঁকুপাঁকু করছে। খাওয়া শেষ হতে একটু যেন স্বস্তি পেল।

নন্দিনীর খাটে শুয়ে পড়েছে রত্না আর কল্পনা। মৌরির কৌটো নিয়ে ঘরে এল নন্দিনী। বালিশ বার করে দিল বন্ধুদের। নিজেও আধশোওয়া হয়েছে, — শরীরটা আর চলে না রে আজকাল। খাওয়া-দাওয়ার পর আইঢাই করে।

— বয়স তো কম হলো না। ফরটি প্লাস। হিহি।

— সময় যে কোথা দিয়ে চলে যায়! এই তো সেদিন টিফিনে হজমিঅলার সামনে ভিড় করে থাকতাম।

— হুঁ, স্কুলের মাঠে সেই দুপুর রোদে লমবিধাস্‌সি খেলা। ক্লাসের বেল পড়ে গেছে হুঁশ নেই, বড়দিমণি বারান্দা থেকে ধমকাচ্ছেন....

— অত দাপুটে বড়দিমণি কী কষ্ট পেয়ে মারা গেলেন! সেরিব্রাল হয়ে দু'বছর বিছানায় শয্যাশায়ী, শেষের দিকে কাউকে চিনতেও পারতেন না।

— হ্যাঁরে, সেদিন স্কুলে গিয়ে শুনে যা খারাপ লাগল। ছেলে নাকি খোঁজখবর রাখত না। একটা বুড়ি আয়া মতন ছিল, সে ই....

— আমার কাছে বড়দিমণির একটা ছবি আছে। সেই যে সেবার বড়দিমণি শিক্ষক দিবসে প্রাইজ পেলেন, তার পরদিন প্রত্যেক ক্লাসের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে ছবি তোলা হলো..... আমার কাছে একটা কপি আছে।

— ওমা তাই ! দেখি দেখি দেখি।

নন্দিনী আলমারি থেকে অ্যালবাম বার করল। উপুড় হয়ে ঝুঁকেছে তিন বন্ধু। বড়দিমণির থেকেও ছবিতে নিজেদের খুঁজছে বেশি। নিজেদের কিশোরী রূপ দেখে উদ্বেল, উন্মন।

— এই দ্যাখ্, কল্পনাটা কী রোগা ছিল।

-- নিজেকে দ্যাখ্, কেমন টোসা টোসা গাল। যেন মুখে কমলালেবু পুরে রেখেছিস। ওই গাল কি করে অত চুপসে ফেললি রে রত্না?

— তোব কী চুল ছিল দ্যাখ্ নন্দু।

বদল কি শুধু চুলে, গালে আর বপুতেই ঘটেছে? নন্দিনী একটা ছোট শ্বাস ফেলে অ্যালবামের পাতা উল্টে দিল, — এই হলো গিয়ে আমার বর। বিয়ের পর পর তোলা।

— তোর বর তো বেশ হ্যান্ডসাম ছিল!

— ছিল কি, এখনও আছে।

— খুব যে গুমোর! তাই বুঝি আমরা আসার আগে বরকে বাইরে পাঠিয়ে দিলি?

সুব্রতর ঈষৎ টাক পড়া, অল্প মেদ জমা, মধ্য চল্লিশের চেহারাটা পলকের জন্য নন্দিনীর চোখে ভেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, — পুরুষ মানুষ বলে কথা, একটু সামলে-সুমলে রাখাই তো ভাল। বলেই আড়চোখে একবার তাকাল রত্নার দিকে। বছর পাঁচেক আগে নিউ মার্কেটে সরমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সরমা বলেছিল রত্নার বরের নাকি এক মহিলা অফিস কলিগের সঙ্গে দারুণ লটঘট তাই নিয়ে রত্নার মনে নাকি খুব অশান্তি। খবরটা কতটা সঠিক জিজ্ঞাসা করবে রত্নাকে?

তার আগে রত্নাই প্রশ্ন করল। যেন ঘুরিয়ে দিল স্বামী প্রসঙ্গটা। একটা ছবি দেখিয়ে বলল, — এই গোলগাল গ্ল্যাক্সো বেবিটা কে রে?

— ওই তো আমার ছেলে। বাবলা।

— তোর ছেলে যেন এখন কোন ক্লাসে পড়ে বলেছিলি?

— নাইন।

— মাধ্যমিকের পর কি পড়বে ছেলে? সায়েন্স নিশ্চয়ই? আমার বড় মেয়ে তো এবার জয়েন্টে বসছে।

নন্দিনী মনে মনে একটু প্রমাদ গুনল। বাবলার অঙ্কের মাথা একদম ভাল না। ছোটবেলায় খারাপ ধরনের টাইফয়েড হয়েছিল, ডাক্তার ছেলের পড়াশুনো নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে বারণ করে দিয়েছে। তবু বন্ধুর কাছে হেরে যাওয়া ভারী লজ্জার ব্যাপার। সামান্য সময় নিয়ে নন্দিনী বলল, — ওর বাবার তো ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার করার ইচ্ছে, কিন্তু ছেলের আবার লিটেরেচারে ভীষণ ন্যাক।

কল্পনা বলে উঠল, — আমার ছেলে বাবা তোদের ছেলেমেয়ের তুলনায় শিশু। এই সবে ফাইভ হলো। তবে এর মধ্যেই ওর বাবার ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। সায়েন্সের থেকে এখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির লাইনটাই ভাল।

— না না, ম্যানেজমেন্টের এখন দাম বেশি। আমার ছোট মেয়েটাকে ওই লাইনেই দেব।

— টুবলুর বাবা তো ছেলেকে একটা কম্পিউটার কিনে দেবে ভাবছে। এখন থেকেই অভ্যেস করুক।

বিকেল হয়ে এল। খানিক আগেও মাথার ওপর যে সূর্যটা ঝকমক করছিল, সে এখন পশ্চিমে হেলেছে। পুবের জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে এক মায়াবী ছায়া ঢুকে পড়ছে ঘরে। তারই মাঝে কাল্পনিক সংলাপে মেতে আছে তিন বন্ধু। সব গল্পই ঘুরে ফিরে চলে যায় স্বামীতে ছেলেতে মেয়েতে। এসব গল্পে কোন আনন্দ নেই, তবু তিনজনই যেন ভারী খুশি। তাদের কারুর জীবনেই যেন কোনো ক্লেদ নেই, গ্লানি নেই, অভাব নেই, দুঃখ নেই, লজ্জা নেই। যেন তিনজনই পরিপূর্ণ, তিনজনই সুখী। সংসারের রূঢ় বাস্তব তিনজনকেই নিখুঁত অভিনেত্রী করে দিয়েছে।

শুধু একটা কথা ভেবেই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে তিন বন্ধু। তাদের এখন নিজেদের আর কোনো কথা নেই। মনের কথা। প্রাণের কথা। অথচ তারাই একদিন ক্লাসের রচনায় লিখেছিল, একজন গ্লোব ট্রটার হতে চায়, একজন বৈমানিক, আর একজন পর্বত-আরোহী।

আশ্চর্য! সেই মনের কথাটা তারা কেউ বলছিল না। কল্পনা না, রত্না না, নন্দিনীও না।

কোন একদিন

ক'দিন ধরেই ভাঙো ভাঙো অবস্থায় ছিল। স্নান সেরে এসে পরতে গিয়ে মুট করে ভেঙে গেল ডানদিকের ডাঁটিটা। কালও সন্ধেবেলা একবার চশমাটা সারিয়ে নেবার কথা ভেবেছিল অনিরুদ্ধ। এক হাতে ভাঙা ডাঁটি, অন্য হাতে বাকি অংশটা ধরে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে বাস না ধরতে পারলে কিছুতেই এগারোটার আগে ডালহৌসি পৌঁছন যাবে না। এদিকে চশমা ছাড়া সে একরকম অচলই। সাধারণত যাদের চোখের অবস্থা এরকম তারা ডুপ্লিকেট একটা করিয়ে রাখে। বহুদিন ধরেই আরেকটা নতুন করিয়ে নেবার কথা ভাবছে অনিরুদ্ধ। আজ এই রকম একটা মুহূর্তে ওটা ভেঙে যাবে কল্পনাতেও আসেনি। প্রথমটা তাই কেমন থতমত খেয়ে যায়। কয়েক সেকেণ্ড। তারপরই হতভম্ব ভাবটাকে ছিটকে দিয়ে একটা অদ্ভুত সংকেত খেলে যায় তার মাথার ভেতর। সকাল থেকে বুকে জমে থাকা চাপ চাপ অস্বস্তি নিমেষে উধাও। সে পরিষ্কার টের পায় এ চাকরিটাও তার হবে না।

—এমা, চশমাটা ভাঙলি কী করে? মা ঘরে ঢুকে আর্তনাদ করে ওঠেন।

অনিরুদ্ধ অপ্রস্তুত ভাবে হাসে।

—সর্বনাশ, কি হবে এখন? মা'র চোখমুখ কাঁদ কাঁদ হয়ে ওঠে। অনিরুদ্ধর মনে হয় তার শরীর থেকে এক্ষুনি হাত বা পা খসে পড়তে দেখলেও বুঝিএতটা ভেঙে পড়তেন না মা। ভাঙা ডাঁটিটা চোখের খুব কাছে এনে পরীক্ষা করে। নাঃ, কিছু করা যাবে না। একেবারে গোড়া থেকে গেছে।

—চশমা ছাড়া পরীক্ষা দিতে যেতে পারবি তুই? মা ব্যস্তভাবে তার বুকে হাত রাখেন। হাতের মুঠোয় প্রতিবারের মতই কিছু ফুল বেলপাতা। বুকের ওপর মায়ের হাতের কাঁপুনি দেখতে দেখতে সে ম্লান হাসে, এ চাকরিটা আমার

হোত না মা।

মা ছিটকে সরে যান। কান্না ভেজা মুখ পলকে শুকিয়ে খটখটে, — তার মানে তুই আজ যাবি না?

অনিরুদ্ধ আবার গভীর মনোযোগে চশমার ডাঁটি পরীক্ষা করে।

—সুরেনকে আমি মুখ দেখাব কি করে? চিৎকার করতে গিয়ে মার স্বর ভেঙে আসে।

কয়েক মুহূর্ত আগের সেই অদ্ভুত সংকেতটা এখনও অনিরুদ্ধর ভেতর টরেটক্কা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ ব্যাপারটা এখন মাকে বোঝাতে গেলেও তিনি বুঝতে চাইবেন না। সে তাই এখন মা'র কথার কোন উত্তর না দেওয়াটাই সমীচীন মনে করে। নির্দ্বিধায় গিয়ে শুয়ে পড়ে চৌকিতে।

মা ফেটে পড়েন, ছি ছি, লজ্জা করে না তোর? বাপ-মরা বোনটা মুখের রক্ত তুলে চাকরি করে খাওয়াচ্ছে, তোর কি এতটুকু বিবেক নেই? মান অপমান নেই?

পুরনো খোঁচা। অন্যান্য দিন শুনলে প্রচণ্ড রাগ হয়, দুঃখ হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে সে টের পায় ও ধরনের কথা শুনেও তার কিছুই মনে হচ্ছে না। সে খুব নির্বিকার ভাবে ভাবতে চেষ্টা করে খুকুর বদলে আজ সে চাকরিটা পেলে মা ঠিক এভাবেই খুকুকে খোঁচাতেন কি না।

—তুই তবু শুয়ে থাকবি?

না। ভদ্রমহিলার সামনা সামনি এখন আর থাকা যাবে না। অনিরুদ্ধ খুব ধীরেসুস্থে উঠে বসে। ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে আসার মুখে শুনতে পায় মার কঠিন গলা পলকে মমতায় ভিজে গেছে। ছেলের পেছনে আসতে আসতে তিনি গাঢ় গলায় বলে চলেছেন, — রাগ করে চললি কোথায়? পরীক্ষাটা দিতে যাস বাবা। একটু কষ্ট করে দিয়ে আয়।

বাড়ির বাইরে এসেও মার গলা শুনতে পায়। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর উদ্দেশে প্রাণপণে প্রণাম জানিয়ে চলেছেন। অনিরুদ্ধর বুকটা ঈষৎ চিনচিন করে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে চশমা নামক দু টুকরো কাচ যে তার জন্য কী পরিমাণ জরুরী তা আবার টের পায় অনিরুদ্ধ। চোখ দুটো আপনা থেকে কুঁচকে ছোট হয়ে আসে। আলো সইয়ে নিয়ে সে দু-চার পা এগোয়। অসম্ভব হাল্‌কা হাল্‌কা লাগছে মাথাটা। নিজের শরীর নিজের কাছে আল্‌গা, পলকা যেন। একটু থমকে দাঁড়ায়। কেন এমন হচ্ছে? এটা কি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা নামক অকারণ উদ্বেগটা কেটে গেল তাই? নাকি একান্তই সেই একজোড়া কাচের অভাব? বেরোনর সময় চশমাটা চৌকির ওপরই ফেলে এসেছে। নিয়ে আসার

জন্য পেছন ঘুরেও মত বদলায়। দেখাই যাক না, একদিন চশমাবিহীন ঘুরে বেড়াতে কেমন লাগে। তাছাড়া শুধু শুধু ওটা নিয়ে বেরিয়েই বা লাভ কি? সারাতে গেলে পাঁচ-ছ টাকার ধাক্কা। একটা টিউশনির টাকা আজ সন্ধেবেলা পেলেও পাওয়া যেতে পারে। বাকি দুটোর টাকা দিতে বড় দেরী করে। মাসের মাঝামাঝি প্রায়ই টেনে নিয়ে যায়। অবশ্য তেমন হলে খুকু বা মার কাছে চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু পারত পক্ষে বোন বা মা'র কাছে হাত পাততে ইচ্ছে হয় না তার। এই অস্বস্তিটা বছর কয়েক আগেও ছিল না। আজকাল হয়। এমন কি রূপার কাছেও ইদানিং সে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারে না।

গলির মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। মোড়টা ঘুরলেই রূপাদের বাড়ি। সেদিকে না ঘুরে অন্যদিকে হাঁটা শুরু করে। কিছুদিন অবধি রূপার ধারণা ছিল অনিরুদ্ধর একটা কিছু হয়ে যাবেই। এখন নিজেই চাকরির চেষ্টা করছে। খুকুর মত হয়ত পেয়েও যাবে। সে চাকরি না করে, রূপা তার বদলে রোজগার করে আনছে ভাবলে কেন যে তার এত কষ্ট হয়! আসলে তার কিছু মৌলিক যন্ত্রণা আছে। রূপার সঙ্গে একটা সুন্দর মানসিক বোঝাপড়া থাকলেও, এ ব্যাপারে তার যন্ত্রণার মূল উৎসটা কোথায় তা কোনদিনই রূপা খুঁজে পেতে পারে না। অসম্ভব।

অনিরুদ্ধ এখন খুব ধীরে সুস্থে হাঁটছে। চোখের সামনে মাকড়সার জালের মত ঝাপসা ভাব। নিজের অজান্তেই দুটো হাত বার বার উঠে আসছে বুকের মুখোমুখি। অন্ধ মানুষ যেভাবে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলে অনেকটা সেই ভঙ্গি। সামনের ঘরবাড়ি মানুষজন সব কিছুর ওপর কটা পাতলা সর। সে লক্ষ্য করে হাঁটার সময় তার পা দুটো অনেকটা উঁচু হয়ে উঠে তারপর পড়ছে রাস্তার ওপর। চাঁদের ওপর মানুষের পা ফেলে হাঁটার মতন। নীচব বাঁধানো ফুটপাথের দিকে চকিতে একবার চোখ রেখেই আকাশের দিকে মুখ তোলে। রাস্তা নীচে নেমে গেছে, না সে নিজেই লম্বাটে হয়ে গেছে বুঝে উঠতে পারে না। আকাশও অন্য দিনের চেয়ে আজ অনেক বেশী উঁচুতে। শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো বড় ধ্যাবড়া, পাঁশুটে। দুহাতে চোখের কোলে জমাট কিছু ঘন জল মুছে নেয়। একটা সিগারেট খাওয়া দরকার। চটপট পকেটের অবস্থাটা হিসেব করে ফেলে।

—চারটে সিগারেট দে তো।

ছোটু মোটা কাচের বয়ামে কালো লাল লজেন্স সাজাতে ব্যস্ত। আড়চোখে অনিরুদ্ধকে একবার দেখে নিয়েই হাঁক মারে, এই বাবু কি চাইছে দ্যাখ্।

ছোটু তাকে চিনতে পারে নি। নইলে এতক্ষণে বকবকানি আরম্ভ হয়ে যেত। সে লক্ষ্য করে ছোটু খালি প্যাকেটে সিগারেট ভরতে ভরতে হাঁ করে দেখছে তাকে। যেন খুব চেনা চেনা, চিনতে পারছে না।

তার হঠাৎ ব্যাপারটা ভারি মজার লাগে। একটু আগেব ঘুণ ধবা মেজাজ নিমেষে উধাও। চশমা ছাড়া এরা কেউই তাকে দেখে নি বা দেখে না। ছোটবেলা থেকে চশমা পরে পরে তার মুখের আদলটাই এক ধরনের হয়ে গেছে। এখন অন্য রকম লাগতেই পারে। এই ব্যাপাবটা, মানে চশমা ছাড়া তাকে কেমন লাগে, আদৌ চেনা যায় কিনা, এ ধবনের মজার ভাবনা একটু আগেও তার মাথায় আসে নি। আরেকটু নিশ্চিন্ত হবার জন্য সে গলা খাকারি দেয়,—এই ছোটু, একটা লজেন্স দে তো।

ছোটু মুখ তুলে কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপব বোকা বোকা মুখে বলে, আরে অনিদা না? তোমার চশমা কোথায গেল?

দু গাল ছড়িয়ে হাসে অনিরুদ্ধ, খুব চমকেছিস?

—সত্যি অনিদা। চশমা ছাড়া একদম তোমায় চেনা যায় না। কেউ চিনতে পারবে না।

অনিরুদ্ধর চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে, একদম চিনতে পারবে না? অন্য কেউ ভাববে?

হলদে দাঁত বার করে হাসে ছোটু, কিছুক্ষণ ভালভাবে দেখলে অবশ্য চেনা যাবে। হঠাৎ চেনাই যায় না।

কৌতুকটা খুব মনে ধরে অনিরুদ্ধর। ফূর্তি ফূর্তি মেজাজে সে অনেকটা দূর হেঁটে চলে যায়। রূপা আজ তিনটের সময় মেট্রোর সামনে আসবে। গত মাস থেকে মোটা টাকার টিউশনি পেয়েছে। কাল মাইনেও হয়ে গেছে। সেই খাতিরে আজ তাকে এসপ্লানেডে খাওয়াবে। বেদম হাসি পায় অনিরুদ্ধর। রূপা যদি আজ তাকে চিনতে না পারে? অন্য কেউ ভাবে? দারুণ হবে।

চোখের কাছে কব্‌জি তুলে সে ঘড়ি দেখে। সবে এগারোটা কুড়ি। এতটা সময় কী করা যায়? কোন বন্ধুবান্ধবের কাছে যাবে? নীলুর অফিসে গিয়ে তিনটে অবধি কাটিয়ে দেওয়া যায়। সরকারি অফিস। আড্ডা দেওয়ার অসুবিধে নেই। প্রথমে দেখা যাক, নীলু তাকে চিনতে পারে কিনা।

এগোতে গিয়ে পিঠের ওপর আল্‌গা থাপ্পড়,

— কি রে বাচ্চু? এ পাড়ায় এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? অফিস নেই?

অনিরুদ্ধর সমবয়সীই একজন। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য ছেলেটার মুখ ভালভাবে দেখতে একটুও অসুবিধে হয় না। নাঃ, কস্মিন কালেও দেখে নি। চকিতে মনস্থির করে নেয়। তারপর অনায়াসে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখে, কেমন আছিস বল?

— ভালই। তোর খবর কি? অনেকদিন আড্ডায় আসিস না।

কি আশ্চর্য! তার মত চেহারার আরেকজন তাহলে আছে যাকে তাব বন্ধু

এক হাত কাছ থেকে দেখেও চিনতে ভুল করে? অনিরুদ্ধর মনে হয় ছেলেটাব ভুল ভাঙিয়ে দেয়। কিন্তু নিজেকে একবার বাচ্চু বলে স্বীকার করে ফেলায় সাহসে কুলায় না। একটা ডবল-ডেকার এসে স্টপে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটাকে আর কিছু বলা বা করার সুযোগ না দিয়ে সে বাসে উঠে পড়ে, কাল থাকিস। যাব।

চশমা না থাকায় তার একটাই অসুবিধে হচ্ছে। একটু দূরের কোন কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ এই অসুবিধেটাই দারুণ ভাল লেগে যায় তার। বাসটা বেশ ফাঁকা। সামনে এগিয়ে বসার সিটও পেয়ে যায়। গোলপার্ক ঘুরে বাস সাদার্ণ অ্যাভিনিউতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গতি বেড়েছে। ফাঁকা রাস্তায় তেজী ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে বাস। বাঁদিকে অলসভাবে পড়ে থাকা লেকের নরম শরীরে চোখ বোলাতে বোলাতে মনটা তার ফুরফুরে হয়ে যায়।

রাসবিহাবীব কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে এক ভদ্রলোক টোকা দেন পিঠে, এই যে দাদা, ওই ভদ্রমহিলা আপনাকে ডাকছেন।

সে প্রথমটা অবাক হয়। ভদ্রলোকের পাশ দিয়ে ঝুঁকে কোণাকুনি লেডিজ সিটের দিকে তাকায়।

—কি রে খোকন, তোর মা কেমন আছে? জলপাইগুড়ি থেকে ফিরেছে?

ভদ্রমহিলার মুখ এত দূর থেকে আবছা আবছা। আন্দাজ করা যায় মায়েরই বয়সী। সুখী সুখী চেহারার গোলগাল ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়েই পরম আত্মীয়ের হাসি হাসছেন।

খেলাটা আস্তে আস্তে জমে উঠছে মনে হচ্ছে। অনিরুদ্ধ আরও ঝুঁকে সুন্দর বিনয়ী হাসি ফোটায় মুখে—হ্যাঁ। মা ভালই আছেন। আপনারা সব ভাল তো?

—এই কেটে যাচ্ছে। তোর মাকে একদিন আসতে বলিস। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। তোর বাবার শরীর ভাল তো?

অনিরুদ্ধ নিখুঁত ঘাড় নাড়ে। ভদ্রমহিলা কোলের ওপর পড়ে থাকা কৌটো খুলে পান মুখে পোরেন। অনিরুদ্ধ সেই ফাঁকে চিন্তা করে নেয়, খোকন নামক ব্যক্তিটি এই ভদ্রমহিলাকে কি বলে ডাকতে পারে। মাসীমা? না পিসীমা? মায়ের বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে। বোন-টোনও হতে পারে।

জানলা দিয়ে পানের পিক ছুঁড়ে মুখ খোলেন ভদ্রমহিলা—হ্যাঁ রে দিদিব কি হোল? ছেলে না মেয়ে?

আচ্ছা মুশকিল। বাসশুদ্ধ লোক হাঁ করে কথা শুনছে! ভদ্রমহিলার পাশে বসে থাকা একটি মেয়ে তো প্রশ্ন শুনে রীতিমত মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে। ভাবি ঝামেলায় পড়া গেল তো খোকনের মা'র বান্ধবীকে নিয়ে।

—ছেলে হয়েছে। নির্বিকার মুখে উত্তরটা দিয়েই উঠে দাঁড়ায় অনিরুদ্ধ।

আর বসে থাকা যায় না। বাস হাজরা, হরিশ মুখার্জি রোডের কাছাকাছি এখন। নামতে গেলে ওই খোকনের মা'র বান্ধবীর সামনে দিয়েই নামতে হবে। উপায় নেই। সে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে আসে, আমি এখানেই নামব।

ভদ্রমহিলা এক গাল হাসেন, আয়। মাকে নিয়ে একদিন আসিস আমাদের বাড়ি, কেমন?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে হেসে ফেলে অনিরুদ্ধ। এখনও নিজেকে কেমন খোকন মনে হচ্ছে। সে প্রথমটা ভেবেছিল তাকে লোকে অনিরুদ্ধ বলে চিনতে পারে কি না পরীক্ষা করবে। এখন অচেনা লোকরাই তার মুখে চেনা লোকের আদল পাচ্ছে। বেশ নাটকীয় হয়ে উঠছে ব্যাপারটা।

হাজরা বাস স্টপে একজন ভীষণ গোমড়ামুখো লোক বার বার নাক মুখ কুঁচকে নিজের প্রয়োজনীয় বাসটা আসছে কিনা দেখছেন। হঠাৎ ভদ্রলোকের সঙ্গে মজার খেলাটা খেলার ইচ্ছে জাগে অনিরুদ্ধর। তার মত দেখতে বাচ্চু বা খোকন যদি থাকতে পারে এই শহরেই, তবে ওই ভদ্রলোকের মত আরেকজন থাকবে না কেন? সে ভদ্রলোকের গা ঘেঁসে দাঁড়ায়, আরে পঞ্চুদা না? কেমন আছেন?

ভদ্রলোক ভয়ংকর বিরক্তিতে ঘুরে তাকান, আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার পঞ্চুদা নই।

—যাঃ, হতেই পারে না। ঠাট্টা করছেন। নিজের রসিকতায় এবার নিজেই মুগ্ধ অনিরুদ্ধ, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি মন্টু। গোড়ালি উঁচু করে বাস আসছে কিনা দেখছেন ভদ্রলোক, না মশাই। বলছি তো আমি পঞ্চু-ফঞ্চু নই।

ভদ্রলোকের কোথাও যাওয়ার বিশাল তাড়া আছে বোঝা যাচ্ছে। মুখে কপালে হাজার চিন্তার কাটাকুটি। এক লাখ সমস্যায় ডুবডুবু ছা পোষা মধ্যবিত্ত মানুষের চেহারা।

না। ঠিক জমবে না। ভদ্রলোকের ওপর অনিরুদ্ধর করুণা হয়। তার মত করে খেলাটার রস গ্রহণের ক্ষমতা নেই মানুষটার। নইলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিজেকে হালকা করতে পারতেন।

একটা বেজে বারো মিনিটে ধর্মতলার মোড়ে পৌঁছে যায় অনিরুদ্ধ। এখনও ঘণ্টা দুয়েক কাটাতে হবে। চশমা ছাড়া হাঁটা চলা করতে এখন আর তেমন অসুবিধে হচ্ছে না, বরং ভালই লাগছে। নতুন নতুন মনে হচ্ছে সব কিছু। নিজেকেও। আবছা আস্তরণ ভেদ করে দেখার দরুন কলকাতার এই মধ্যমণি অঞ্চলটি আজ তার কেমন মায়াময় লাগে। মেট্রোর ফুটপাথ ধরে মানুষের

ভিড় সাঁতরে হেঁটে বেড়াতে দারুণ রোমাঞ্চ জাগে তার। একটু দূরের যা কিছু সব যেন ফিনফিনে মসলিনে ঢাকা। শুধু একদম কাছাকাছি দু এক হাতের মধ্যে অস্পষ্টতা নেই। জনসমুদ্রে নিজেকে একটা ছোট দ্বীপ মনে হয় তার। নিজেকে এবং নিজের কাছাকাছি পরিমণ্ডলকে ঘিরে কেমন একটা আত্মীয় পরিবেশ রচনার অনুভূতি। সে এই পরিবেশেই বুঁদ হয়ে যেতে চায়। হাঁটতে হাঁটতে নিউমার্কেটের দিকে এগিয়ে চলে। সুবেশা সুগন্ধা তরুণীরা ঝলক আলোর মত তার খুব কাছাকাছি এসেই অস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটা বড়সড় দোকানের সামনে সে খুব কাছ থেকে শো-কেসে ঝোলানো দামী পোশাকগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। দেখতে দেখতে রূপার জন্য, খুকুর জন্য, এমনকি মায়ের জন্যও খুব দামী শাড়ি আলাদা আলাদাভাবে পছন্দ করে ফেলে।

নাকের কাছে সেই সময় আচমকাই টাটকা গোলাপের গন্ধ। অনিরুদ্ধ সচেতন হয়। বুঝতে পারে এইমাত্র তার পাশে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। খুব ইচ্ছে হয় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার। কতদিন যে টাটকা গোলাপের গন্ধ পায়নি।

ঠিক এই রকম সময়, তাকে হতবাক করে দিয়ে মেয়েটির ভোরের সানাইয়ের মত মিষ্টি গলার আওয়াজ ভারি সুন্দর ছন্দে বেজে ওঠে —পার্থদা না?

অনিরুদ্ধর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। গলা শুকিয়ে খরার ক্ষেত। মেয়েটা কি তাকেই ডাকল? কই, আশে পাশে আর কেউ তো নেই?

—পার্থদা না?

মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করায় অনিরুদ্ধ ভালভাবে চারধার দেখে নেয়। না, তাকেই বলছে। কত আশ্চর্যই না আছে পৃথিবীতে। বাচ্চু বা খোকন ছাড়াও সে এখন এই মেয়েটির পার্থদা হয়ে যেতে পারে। সারা শরীরে কেমন একটা চোবা কাঁপুনি। সে ঘুরে মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়ায়। পরনে খুব হালকা রঙের চুড়িদার কামিজ। গাঢ় মেঘ রঙ ওড়না ভারি সুন্দর ভঙ্গিতে বুকের ওপর ছড়ান। চকচকে কালো দুটো বেণী কাঁধের দুপাশ ছুঁয়ে হাঁটু পর্যন্ত নেমে গেছে। গায়ের রঙ নরম মাখনেব সঙ্গে হালকা লাল মিশিয়ে দিলে যেমনটা হয় তেমনি।

চোখাচোখি হতেই মেয়েটি দুগালে গভীর টোল ফেলে, আমি রিমঝিম। সেই যে মল্লিকপুরের পিকনিকে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। বাবাঃ, কতক্ষণ ধরে ডাকছি, চিনতেই পারছ না।

রিমঝিম! কী মিষ্টি নাম। ঝর্ণার মত, বৃষ্টির ধারার মত, একবার শুনলেই যেন ঝিরঝিরিয়ে বয়ে চলে মনের ভেতর।

—তাই তো। আরে, একদম লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ নিজেকে ভুলে নিজের স্বভাব ভুলে অন্য মানুষের মত হয়ত বা রিমঝিমের পার্থদার মত হৈ হৈ করে

ওঠে অনিরুদ্ধ।

--মেয়েদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কি দেখছ হাঁ করে? বিমঝিম আরও কাছে সরে আসে। আঃ, কী ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ রূপ। কী কোমল মসৃণতা উজ্জ্বল মুখে, হাতে, শাঁখের মত গলার খাঁজে। রূপা কিংবা খুকুদের ত্বক কেন এমন হয় না?

—কি দেখছ?

— তোমাকে। তুমি কত সুন্দর হয়েছ। নিজের মুখ থেকে বেবিয়ে আসা অচেনা শব্দগুলো নিজের কানেই মধুর হয়ে বাজে অনিরুদ্ধর।

--তুমি কিন্তু আগের চেয়েও রোগা হয়ে গেছ পার্থদা। আমি তো প্রথমটা ভাবছিলাম অন্য কেউ বুঝি।

অনিরুদ্ধ মনে মনে ছটফট করে ওঠে। না, না বিমঝিম, আমি অন্য কেউ নই। আমি তোমার পার্থদাই।

—কই বললে না কার জন্য শাড়ি পছন্দ করছিলে? বিশেষ কারুব জন্য বুঝি?

নিখুঁত অভিনেতার মত কাঁধ ঝাঁকায় অনিরুদ্ধ, তেমন বিশেষ কেউ আর এল কই?

—ইস। কী দুঃখ রে। রিমঝিম পাতলা ঠোঁট দুটো মেলে দেয়। কী সুন্দর নরম হালকা গোলাপী ঠোঁট। ও কি কোন রঙ লাগিয়েছে? না সত্যিই ও দুটো গোলাপ পাঁপড়ি? অনিরুদ্ধর ভারি ইচ্ছে হয় ছুঁয়ে দেখার।

রিমঝিম আলতো করে ধাক্কা দেয়,—থাক, চলো আর শাড়ি দেখতে হবে না। আমার টুকটাক কিছু শপিং আছে, যাবে সঙ্গে?

—চলো। মেয়েটার কাঁধে আলতো হাত রেখে খুব সুন্দর করে হাসে অনিরুদ্ধ।

রূপসী নিউমার্কেট তার নিজস্ব ঐশ্বর্য আর রঙ নিয়ে ঝলমল করছে। কিছু দেখে না, কাউকে দেখে না অনিরুদ্ধ। চোখ ভরে শুধু রিমঝিমকেই দেখে যায়। আলো আর রঙ ছড়িয়ে সরে যায় দোকানের পর দোকান। সেই সব মদির রঙের ভেতর পরীর মত ভেসে বেড়ায় তার স্বপ্নের রাজকন্যা।

ঘন্টা দুই সময় যে কোথা দিয়ে চলে যায়! এক সময় রিমঝিম বলে, আমি এবার ফিরব পার্থদা। বিকেলে এক বন্ধুর জন্মদিনে নেমন্তন্ন আছে। যেতে হবে। তুমি একদিন চলে এসো না আমাদের বাড়ি।

—খুঁজে পাব না যে। অলৌকিক স্বপ্নের ভেতর থেকে কথা বলে ওঠে অনিরুদ্ধ।

রিমঝিম ঝর্ণার মত হাসে, ফোন কোরো তাহলে। তাছাড়া অলকদা তো চেনে। অলকদাকে নিয়ে একদিন চলে এসো।

মন-পাগল-করা কিছু গন্ধ অনিরুদ্ধর কাছে গচ্ছিত রেখে মিনিবাসে উঠে যায় রিমঝিম।

তিনটে বারো। মেট্রোর কাছাকাছি আপন মনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অনিরুদ্ধ লক্ষ্যই করেনি কখন রূপা একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে।

আঁচল তুলে ঘাম মোছে রূপা, কতক্ষণ এসেছ? বাবাঃ দুপুরবেলা বাস পাওয়ার যা ঝামেলা।

অনিরুদ্ধ সামনের হোর্ডিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়েই থাকে।

—কি হোল? রাগ করেছ? আসার সময় তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। মাসীমা বললেন চশমা ভেঙে গেছে বলে তুমি নাকি আজ রাগ করে পরীক্ষাই দেবে না ঠিক করেছিলে?

অনিরুদ্ধ এক ঝলক রূপাকে দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—কি বাচ্চা ছেলে রে। মার কাছে বকুনি খেয়ে এখনও ঠোঁট ফুলিয়ে আছে।

এবার রূপার দিকে সোজাসুজি তাকায় অনিরুদ্ধ, আপনি কি আমায় কিছু বলছেন?

—মানে? রূপার চোখ গোল গোল হয়ে ওঠে।

—আপনি যাকে ভাবছেন আমি সে নই। ভুল করছেন। গট-গট করে রূপাকে ফেলে এগিয়ে যায় সে।

রূপা পেছন পেছন আসতে থাকে, এই, কী ছেলেমানুষী করছ? দাঁড়াও।

অনিরুদ্ধ জোর পা চালায়।

— যেও না, শোন। এই দ্যাখো, আসার সময় তোমার চশমা আমি সারিয়ে এনেছি। পরে নাও লক্ষ্মীটি। হোঁচট খেয়ে পড়বে যে।

আরও জোরে পা চালায় অনিরুদ্ধ। রূপা নাছোড়বান্দার মত তার চশমাটা হাতে নিয়ে পেছন পেছন আসছে। একদম ফিরে তাকায় না। এই মুহূর্তে তার অনিরুদ্ধ হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। সে রিমঝিমের পার্থদা হতে চায়। নিদেনপক্ষে সেই খোকন কিংবা বাচ্চু। তাও না হলে অন্য যে কেউ। অশোক, অমল, নির্মল যে কেউ।

অনিরুদ্ধ প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে।

বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়

ট্রেজার হান্টের প্রথম কটা পাতায় সেই কখন থেকে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে রুমি। বোলাচ্ছে তো বোলাচ্ছেই। এখনও পর্যন্ত একটা লাইনও পড়ে ওঠা গেল না। কোন শব্দই মাথায় ঢুকছে না। একরাশ কালো দাগের দিকে তাকিয়ে থাকা শুধু। কা'ল রাতে সেই মারাত্মক কথাগুলো কানে যাওয়ার পর থেকে কি যেন হয়ে গেছে মস্তিষ্কের ভেতর। মাথা ছাড়িয়ে হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ড ছাড়িয়ে আবার মাথায় গড়িয়ে ফিরছে গুমোট কষ্ট। ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দে একটা চাপা রাগও গুটি পাকিয়ে চলেছে। যে কোন মুহূর্তে সেই রাগ বুঝি কান্না হয়ে ফেটে বেরোয়।

ডিভানে চিত হয়ে শুয়ে রুমি বইটাকে উল্টে রাখল বুকের ওপর। ভাল লাগছে না। কিছু ভাল লাগছে না। এনিড ব্লাইটন, হার্ডি বয়েজ, এমন কি মিল্‌স্‌ অ্যাণ্ড বুন্‌স্‌ পর্যন্ত না। সন্দেহটা কদিন ধরেই মনে মনে চরকি খাচ্ছিল। খুব শিগগিরই কিছু যে একটা হতে চলেছে তার গন্ধ ক্রমশ তীব্র হচ্ছিল এ বাড়ির বাতাসে। নিচু গলার আলোচনা, দাদুর অধৈর্য পায়চারি, রাতে ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে মায়ের স্থির দাঁড়িয়ে থাকা আর মাঝে মাঝে দিদানের ফোঁচ ফোঁচ কান্না। সব কিছুকে মিলিয়ে দিলে অনেক কিছুই বুঝে ফেলা যায়। কপালের ওপর শুয়ে থাকা চুলগুলোকে আঙুল দিয়ে পাকাতে থাকল রুমি। নাইটি থেকে অকারণে টেনে ছিঁড়ল দুগাছা নীল নাইলনের সুতো। ঘুম থেকে উঠে আজ নাইট-ড্রেস পাল্টানো হয়নি। ব্রেক-ফাস্ট খেতে হয় তাই খাওয়া। কোনরকমে একটু কিছু গিলে শুয়ে পড়েছে। তারপর থেকে এই অবিশ্রান্ত শুয়ে থাকা। এর মধ্যেই শুনতে পেল মা আর সোনামামা বেরিয়ে গেল। দিদান বোধ হয় রান্নাঘরে।

দাদুর তো সাড়াশব্দই পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে। রুমি নাইটি থেকে আরেকটা সুতো ছিঁড়ল। মা দেখলে বকত, নাইটি রাতের পোশাক রুমি। ঘুম থেকে উঠে ওটাকে চেঞ্জ করতে হয়। তাছাড়া তুমি বড় হচ্ছ, নাইটির ওপর অন্তত হাউসকোট পরতে শেখো।

মা নির্ঘাত আজ লক্ষ্য করেনি তাকে। করবেই বা কখন? নিজেকে নিয়েই যা ব্যস্ত। রুমি সজোরে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরল। নরম পাতলা ঠোঁট দাঁতের চাপে জমাট লাল। বেশ করেছে বদলায়নি। এবার থেকে কোনদিন পাল্টাবে না নাইটি। সারাদিনই ঘুরবে নাইটি পরে। বড়দের যদি যা খুশি করার অধিকাব থাকে, তারই বা থাকবে না কেন ? ঝুম এবার দুষ্টুমি করলে কেউ এসে বকে দেখুক, কথা শোনাতে রুমিও জানে। ঝুমের কথা মনে পড়তে বুকের পাঁজরগুলো নতুন করে চিন্‌চিন্ করে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে গাঢ় চোখে তাকাল বোনের দিকে। আহা, বেচারী এখনও কিছুই জানে না। মেঝেতে উপুড় হয়ে একমনে ছবি এঁকে চলেছে। চোখের ব্রাশ ব্রাশ পাতাগুলো ড্রইং পেপার ছুঁই ছুঁই। চারদিকে এলোমেলো ছড়ানো কাগজ, প্যাস্টেল, ফেল্ট পেন। সব সময়ই ঘর জুড়ে এইভাবে বসে ছবি আঁকে ঝুম। পা মুড়িয়ে কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে রাখে ড্রয়িং পেপারের গায়ে। বই পড়ার সময়ও তাই। চোখ আর কাগজে দূরত্ব থাকে না বড়।

—ঝুম, অ্যাই ঝুম। বিষণ্ণ গলায় ডাকল রুমি।

ঝুম মাথা ওঠাল না। কাঁধ-ছোঁয়া থোকা থোকা চুলের রাশি দুলে উঠল সামান্য। বাঁ হাতের উল্টোপিঠে কপাল চুলকোল।

—কি কালা রে বাবা। ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না?

—উঁঃ ?

— দেখে আয় তো দিদান কি করছে। সঙ্গে দাদুকেও।

—কি হবে?

—আঃ, যা বলছি শোন্। রুমি অধৈর্য হোল।

ঝুম আবার চোখ ডোবাল আঁকায়, আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি। তুই গিয়ে দেখে আয় না।

এই কারণেই বোনের ওপর রাগ হয় রুমির। কি যে ছাইপাঁশ আঁকে দিনভোর। স্কুলে না যেতে হলেই হয় খেলা, নয় স্পাইডারম্যান. সুপারম্যান, নয় এই তুলি পেন্সিল নিয়ে বসা। দিন দিন আদরে বাঁদর হচ্ছে। এত বেশি মুখ আর এমন অবাধ্য। চোখ পাকিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। কাল যা শুনেছে তা যদি সত্যি হয় ঝুম হয়ত চিরদিনের মত....। রুমির গলা মমতায়

ভিজে গেল, লক্ষ্মীসোনা, একবারটি দেখে আয়।

এবার পুরোপুরি চোখ তুলেছে ঝুম। বড় বড় দুচোখ ছড়িয়ে একদৃষ্টে দেখছে দিদিকে। এভাবে কেন তাকিয়ে আছে ? ও'ওকি তবে খবরটা জানে ? রুমির বুক শিরশির করে উঠল, যা না। প্লিইইজ।

ড্রয়িং পেপারটাকে আস্তে আস্তে গোল করে মোড়াল ঝুম। সযত্নে হলদে গার্ডার জড়াল গায়ে, আমার কোন জিনিস টাচ করবি না কিন্তু।

রুমি আবার গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। অস্থির অস্থির লাগছে। দাদু দিদানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। সাহস হচ্ছে না। এমনও তো হতে পারে কাল রাতে সে ভুল শুনেছে। হয়ত অন্য কাউকে নিয়ে কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে ? তাই বা কি করে হয় ? দাদু তবে এত গম্ভীর কেন ? মার মুখও সকাল থেকে রেক্টর আন্টির মত স্টিফ। সোনামামাই যা একটু কথা টথা বলছিল। মন ভোলানোর চেষ্টা আর কি। রুমি কি কিছুই বোঝে না ?

মনে মনে একের পর এক প্রশ্ন শানাতে থাকল রুমি। দাদু না হোলে দিদানই উত্তর দিক,

—মা আর সোনামামা খেয়েদেয়ে কোথায় বেরোল ?

দিদান সহজে সত্যি কথা বলতে চাইবে না। বড়রা সব সময়ই ছোটদের মিথ্যে দিয়ে ভোলায়।

— কেন, তোর মা অফিস গেল। মামাও কাজে যাবে।

—লাই। আমি সব জানি।

—কি জানিস ?

—আজ কেসের রায় বেরোবে। ওরা কোর্টে গেছে।

দিদান কি খুব চমকে উঠবে? নাকি মুখে আঁচল চেপে কাঁদতে বসবে কাল রাতের মত ? সেই সময়ই রুমি শেষ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেবে, শুনলাম আমরাও ভাগ হয়ে যাচ্ছি ? ঝুম একজনের দিকে আর আমি আরেকজনের ? কে অপ্ট করেছে আমাকে? মা, না বাবা ? ঝুমই বা কার ভাগে যাবে ?

দু'হাতের তালুতে মুখ ঢেকে কান্না চাপবার আপ্রাণ চেষ্টা করল রুমি। ভেতরের কষ্টগুলো বাষ্প হয়ে চোখের পাতায় দানা বাঁধছে। না, কিছুতেই কাঁদবে না সে। কাঁদা মানেই তো বোকা হয়ে যাওয়া।

দুই

একটু একটু করে আকাশ বেয়ে নেমে যাচ্ছে সূর্য। বড় ধীর, মন্থর তাব গতি। দুপুরটা ঠিক দুপুরের মতই শান্ত। সময়ও শুয়ে পড়েছে তার পাশে। রুমি আরেকবার ভেতব থেকে ঘড়ি দেখে এল। সবে দুটো পনেরো। সময় বুঝি ঠিকই করেছে আজ কিছুতেই নড়াচড়া কববে না। শুধুই ঝিমোবে সন্ধেবেলা আফিমখাওয়া করালীর ঠাকুমার মত। কেস নিশ্চযই এতক্ষণে উঠে গেছে কোর্টে। বাইরে থেকে অনেকগুলো কোর্ট সে দেখেছে। কোর্টসিন দেখেছে নানান ফিল্মে। একই রকম হয় কি সত্যিকারের দৃশ্যগুলো? সেই টানা টানা কিছু বেঞ্চি! কাঠের রেলিংতোলা এভিডেন্স বক্স! আসামীর কাঠগড়া! লাল শালুতে মোড়া জজের ডায়াস! যে জজ একবার রায় দিলেই জীবন ওলোট-পালোট হয়ে যায়! ভেঙে যায় মানুষের সম্পর্ক! চুলচেরা হিসেবে ভাগাভাগি হয় জমি, বাড়ি, বিষয়সম্পত্তি অথবা গরু, ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগি। অথবা রুমিরা। ভাবতে ভাবতে পেছন ফিরতেই রুমি দেখতে পেল ঝুম কখন উঠে এসেছে ঘুম থেকে।

রুমি হাসার চেষ্টা করল, কিরে, ঘুমোলি না?

ঝুম দুদিকে মাথা নাড়ল। ঠোঁট দুটো সামান্য ফোলা ফোলা, আমাকে একটা কাজ কম্‌প্লিট করতে হবে।

—কি কাজ রে?

—আছে। আচ্ছা দিদি, ডাইভোর্সের ঠিক মানেটা কী রে?

রুমি দেওয়ালের পাশে রাখা বেতের মোড়ায় বসল। মুখে চিন্তার কুয়াশা। ঝুম তবে আজকের ব্যাপারটা জেনে গেছে। কতটা জানে? সবটাই কি? নইলে আজ যে বড়ো নিজে থেকে তাকে 'দিদি' বলে ডাকল! হাজার চেষ্টাতেও ওর রুমি ডাকটা বদলাতে পারেনি মা।

—বল্ না দিদি।

—কি করবি জেনে ?

—দরকার আছে। ঝুম কাছে এগিয়ে এল, ডাইভোর্সের মানে যে ছাড়াছাড়ি হওয়া তা আমি জানি। তবে ঠিক কি কি যে আলাদা হয়ে যায়...

—সব কিছু আলাদা হয়। যা এখন, ভাগ এখান থেকে। রুমি আচমকা চিৎকার করে উঠল, আমাকে আর একদম ডিস্টার্ব করবি না।

অন্যদিন হোলে এ ধরনের উত্তর শুনে ঝুম ভেংচি কাটে। কিম্বা কথা শোনায় কুটকুট করে। আজ সে সব কিছুই করল না। হতবাক চোখে ছলছল তাকিয়ে

রইল কিছুক্ষণ। তারপর ছোট্ট ছোট্ট আঙুলগুলো দাঁতে কামড়ে ঢুকে গেল ঘরে। রুমি ওকে ডাকতে চাইল। কোন শব্দই এল না জিভে।

ঝুমটার হাঁটাচলা, ভাবভঙ্গি অবিকল বড়দের মত। সবসময় মাকে নকল করে। খালি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেতে চায়। চোখের কাছে বই নিয়ে পড়ে বলে বাবা একদিন বলেছিল, ঝুমের মনে হয় চোখ খারাপ হয়েছে। চশমা লাগবে।

কবে যেন বলেছিল বাবা ? দিদানের বাড়ি তারা চলে এসেছে সেই শীতকালে। তারও আগে। তারপর এই ক'মাসে বেশ কয়েকবার বাবার কাছে গেছে দুজনেই। বাবাই আসে নিতে। ওপরে ওঠে না। রাস্তা থেকে হর্ন বাজায়। কই, এর মধ্যে তো একবারও বাবা বলল না চোখ দেখাবার কথা। ভুলেই গেছে হয়ত।

সেদিন চশমার নাম শুনে ঝুমের সে কি ফড়িং নাচ, আমি একটা কালার্ড কাচের চশমা পরব বাপি। আলোয় নীল, অন্ধকারে সাদা।

রুমি হেসেছিল চোখ টিপে, দূর ও তো ফটোসান। ওগুলো বড়দের জন্য।

—আমি কি কিছু ছোট আছি নাকি ? ঝুম গাল ফুলিয়েছিল। বোকা মেয়ে, জানে না বড় হওয়া কি বিশ্রী ব্যাপার। শরীরটাকে ভেঙে দুমড়ে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে হঠাৎই একদিন দুম করে বড় হওয়া আসে। কয়েকমাস আগে রুমি তা প্রথম টের পেয়েছে।

নাঃ, ঝুমটাকে বকা ঠিক হয়নি। যতই পাকা সেজে থাকুক, ছেলেমানুষ তো বটে। তাছাড়া.....। রুমি ঘরে উঁকি দিল। ঝুম আবার ঘাড় গুঁজে ছবি এঁকে চলেছে। বুক নিংড়ে একঝলক কাঁপা কাঁপা বাতাস গড়িয়ে এল। আহারে, ডলপুতুলের মত এত্তটুকু ছোট্ট বোনটা তার। ওকে ছেড়ে কী করে যে থাকবে রুমি! কেন এমন হয় ? সম্পর্ক যদি ভেঙেই যাবে, তবে তা তৈরি হয় কেন ? রুমির দু চোখ টলটল করে উঠল।

সোজাসুজি ঘরটাতে দাদু খাটে ঠেস দিয়ে বসে বই পড়ছে। থমকে দাঁড়াল। আজ থেকে বাবা আর মার ভেতর কোনঁ সম্পর্ক থাকবে না। সে যদি বাবার ভাগে পড়ে তবে এই দাদু, দিদান সোনামামারাও পর হয়ে যাবে জন্মের মত। আর মা ? যতই এখন রাগ হোক মার ওপর....

— কে রে ওখানে ? রুমি নাকি ?

রুমি চমকে তাকাল। দাদু তাকে দেখতে পেয়ে গেছে।

—ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ? এদিকে আয়।

রুমি পায়ে পায়ে এগোল। নিজেকে জোর করে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

—কি বই পড়ছিলে ?

—জুকভের মেময়ার্স। দাদু চোখ থেকে চশমা নামাল, দারুণ ইন্টারেস্টিং বই।

—জুকভ কে ? রুমি আলতো প্রশ্ন ছুঁড়ল। অনেকক্ষণ পর কথা বলতে পেরে বেশ ভাল লাগছে। দমবন্ধ ভাব একটু কম যেন।

দাদু বইয়ের পাতা মুড়ল, জুকভ হচ্ছেন সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের একজন রাশিয়ান জেনারেল....

— তোমার যুদ্ধের বই পড়তে ভাল লাগে দাদু ? যত সব বোমা, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আর কাতারে কাতারে লোক মরে যাওয়া। বিচ্ছিরি।

—তুই এত সব জানলি কোত্থেকে ? দাদু হাসল, পড়িস তো যত লাইট অ্যাডভেঞ্চারের বই।

—বারে ক্লাসে আমাদের ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি পড়তে হয় না? দাদুর খাটে গিয়ে এবার বসল রুমি, হিরোসিমা, নাগাসাকিতে কত লক্ষ লক্ষ লোক মরে গিয়েছিল বলো তো।

—হুঁ। দাদু আবার চশমা পরল, তার থেকে হাজার হাজার গুণ শক্তিশালী বোমা এখন রাশিয়া আমেরিকার হাতে। যদি দুজনে যুদ্ধ বাধে....

—আমাদের হিস্ট্রির আন্টিও বলছিল, এবার যুদ্ধ বাধলে এই গ্লোবটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

—তাহলে তো সব চুকেই গেল। দাদু ভুরু কুঁচকোলেন — হিরোশিমাতে বোমা পড়ার পর কত মানুষ বিকলাঙ্গ হয়েছিল জানিস? যুদ্ধের পরও জন্ম হয়েছিল কত বিকলাঙ্গ শিশুর।

—কি নিষ্ঠুর এই পৃথিবীটা, তাই না? রুমির নরম মুখ জুড়ে দুঃখ ঝেঁপে এল, বেচারা শিশুগুলো। কিছু জানে না, বোঝে না, তারা পর্যন্ত....

—এটাই দুনিয়ার নিয়ম রে। দুই শক্তিমানে যুদ্ধ হোলে মরে নিরীহ মানুষেরা। শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়। এখন রাশিয়া আমেরিকার লড়াই হলে নিরপেক্ষ দেশগুলো সব...

রুমির শরীর শক্ত হয়ে আসছে। দাদুর কথাগুলো মিসাইল হয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। পৃথিবীর নিয়ম বুঝি সব ক্ষেত্রেই এক। তা দুটো মহাদেশই হোক কিম্বা তাদের বাবা মা। আজও সেই দুই শক্তিমানেরই যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি হতে চলেছে। রুমি চোখ বুঁজে ফেলল। বাবা মা'র মধ্যে রাশিয়া কে? কেই বা আমেরিকা?

রাশিয়া বলছে, এভাবে আর চলতে পারে না। তুমি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে

গেছ।

আমেরিকা বলল, সহ্যের সীমা আমি ছাড়াইনি। তুমি ছাড়িয়েছ। তোমার সঙ্গে আর কোনরকম অ্যাডজাস্টমেন্টআমার সম্ভব নয়। একটা কিছু ফাইনাল হয়ে যাওয়া দরকার।

— বেশ। রাশিয়ার কণ্ঠস্বর চড়ছে, মেয়ে দুটোকে রেখে দিয়ে তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পার।

—অসম্ভব। আমেরিকা হিসহিসিয়ে উঠল, রুমি ঝুম আমার। আমিই ওদের নিয়ে যাব।

— তোমার মত একটা নোংরা মেয়েছেলের হাতে আমি আমার মেয়েদের কিছুতেই তুলে দেব না। দরকার হলে....

— তোমার মত একটা ডিবচের কাছেও আমার মেয়েরা থাকবে না। আমি কালই ওদের নিয়ে চলে যাচ্ছি।

রুমি একছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ঝাঁক ঝাঁক গুলিতে এক্ষুনি বুঝি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে শরীর। কার মেয়ে আমি? কার মেয়ে ঝুম? বাবার? মার? সত্যি সত্যি তারা আসলে কাদের?

তিন

খাবার ঘরে টাঙানো বড় ঘড়িটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ঝুম। এখনও সে ভালমতন সময়ের হিসেব বোঝে না। ছোট কাঁটাটা যদি চার আর পাঁচের মাঝখানে থাকে আর বড় কাঁটা আটের ঘরে তবে যেন ঠিক কটা বাজে? অধৈর্য ভাবে ঝুম দুধের গ্লাস সরিয়ে রাখল। একটু আগে দাদু বেরিয়ে গেছে বাড়ির থেকে। তাকে খেতে দিয়ে দিদান গেল ঠাকুরঘরে। মা আর সোনামামার ফেরার সময় বুঝি হয়ে এল। ঝুম তার ছোট্ট ছোট্ট হাতে কপাল চেপে ধরল। রুমিটা কিছুতেই কথা বলছে না। ব্যালকনিতে বসে আছে তো বসেই আছে। দিদানের বাড়িটা তাদের ফ্ল্যাটের থেকে অনেক বড়। একদিকে এলে অন্যদিকে কি হচ্ছে বোঝাই যায় না। এই মুহূর্তে গোটা বাড়ি ভূতুড়ে রকমের থমথমে। নিশ্বাস ফেললেও শব্দ শোনা যায়। ঝুমের গা ছমছম করে উঠল। একটু বাদেই মনে হয় সেই দম্‌কা হাওয়াটা উঠবে। সাইরেনের মত কেঁদে কেঁদে শব্দ বাজবে আকাশ থেকে। আর সেই শব্দ চিরে হি হি হাসির তালে নেমে আসবে ভূতগুলো। তাদের কখনই স্পষ্ট দেখা যায় না। আবছা নীল ছায়ার মত তারা নেচে বেড়ায় চারদিকে। আচমকা দরজা জানলা ঝনঝন কেঁপে ওঠে। দেওয়াল দোলে

নাগরদোলার মত। পাগলা বাতাসে লণ্ডভণ্ড হতে থাকে ঘরের সব জিনিসপত্র। ঝুমের মনে হোল, সে রকমই যদি কিছু একটা হয়ে যায় ভাল হয়। হলুদ আলো ছড়িয়ে ফ্লাইং সসার থেকে নেমে আসুক মিস্টার স্পক। ইয়া লম্বা চেহারা। লম্বাটে মুখ। খরগোসের মত খাড়া খাড়া কান। মিস্টার স্পককে সে অনুরোধ করবে তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। সঙ্গে রুমিকেও নেবে। থুড়ি, দিদি। তারপর যেমন করে আকাশের ওপার থেকে একদিন নেমে এসেছিল পৃথিবীতে, সেভাবেই চলে যাবে অন্য কোন গ্রহে। সেখানে বাবা মা থাকে না। মা বাবাদের নিয়ে এত সমস্যাও থাকে না। থাকেনা বাড়িঘর, টিচার, স্কুল আর খারাপলাগা এরকম হিজিবিজি সময়। সে আর দিদি দিব্যি সেই ধূধূ বালির দেশে কিম্বা বরফের পাহাড়ে জীবন কাটিয়ে দেবে।

ঝুম হঠাৎ চমকে লাফিয়ে উঠল। ভয়ানক শব্দ তুলে ঝনঝন বেজে উঠেছে কলিংবেলটা। ওরা তবে এসে গেছে। হোঁচট খেয়ে, চেয়ার উল্টে ঝুম দৌড়োতে শুরু করল। দৌড়, দৌড়, দৌড়। খাবার ঘর থেকে প্যাসেজ, প্যাসেজের পর দাদু দিদানের ঘর, তারপর সোনামামার। তারপর আরও কিছুটা গেলে তবে ড্রয়িংরুম। দরজা অবধি পৌঁছে ঝুম ভীষণ হাঁপাতে লাগল। আতঙ্কে ফর্সা মুখ কাগজের মত সাদা। ঘোলাটে দুচোখ শুধু রুমিকে খুঁজছে।

রুমিও শুনেছে শব্দটা। আবার বেল বাজল। আবারও। ধাতব ধাক্কায় দেওয়াল দরজা সব যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে অজানা ভূমিকম্পের অনুভূতি। এখ্খুনি অ্যাটম বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এতদিনকার শৈশব, ভালবাসা, কাছে টানা। রুমি ছুটে ধরতে চাইল বোনকে। তখনই মেঝেতে চোখ আটকে গেল। সমস্ত সকাল ধরে, সারা দুপুর ধরে এ কী ছবি এঁকেছে ঝুম? তাদের ফ্ল্যাটটার ছবি। খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, সোফা, টিভি, ফ্রিজ সবই আছে। বইপত্র, খেলনাগুলোও। সব কিছুর মাঝখানে তারা দুই বোন হাত ধবে দাঁড়িয়ে। ছবিটা তুলতে যেতেই দু বোন ছিটকে গেল দুদিকে। পুরোটা আঁকার পর ব্লেড দিয়ে ড্রয়িং পেপারটাকে নিপুণভাবে দু ভাগ করে রেখেছে ঝুম।

নীচে দরজা খোলার শব্দ হোল। রুমি হঠাৎ টের পেল ঝুম তার হাতেব আঙুলগুলোকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে। দুজনেই স্থির নিস্পন্দ। এখন শুধু বিস্ফোরণের প্রতীক্ষা।

একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে

গলার স্বর সপ্তমে তুলে গান ধরেছিল গিরিধারী। বেলাশেষের গান। আঙুলের ফাঁকে পাথরের টুকরো বোল্ তুলছে টক্‌টক্। ঘোলাটে চোখ বেয়ে ঝাঁক ঝাঁক মানুষের আনাগোনা। এ সময় ভিড় হয় বটে পথে-ঘাটে। মানুষ নয় যেন চাকভাঙা পিঁপড়ের দল ছুটে মরছে এলোপাথাড়ি। এ ওকে গুঁকছে, ধাক্কা মেরে ছুটে যাচ্ছে নিজের তালে। গান গাইতে গাইতে গিরিধারী আড়চোখে টিনের কৌটোটার দিকে তাকাল। এত মানুষ আসে যায়, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে গানও শোনে কেউ কেউ। পয়সা দেওয়ার বেলা সব লবডঙ্কা। দশ, পাঁচ মিলিয়ে সাকুল্যে পাঁচ টাকাও হয়েছে কি হয়নি। মানুষের হৃদয় বড় কৃপণ। একটা লোক একদলা থুতু ছড়িয়ে গেল সামনে। গিরিধারী ন্যাকড়ায় গাল হাত মুছে নিল। বিড়বিড় গালও দিয়ে নিল খানিক। তারপর আবার নতুন করে সুর ধরল,

আসিতে হবে মন বারে বারে
এই ভবেরই মা—ঝা—রে.....

ঘুরে ফিরে বার কয়েক গাইল কলিটা। চড়ায় উঠে গলা তিরতির।

আর না হবে মোর মানব জ অ ন অ অ ম,.......
পাষাণে কুটিলে...........

পদ শেষ হোল না। আচমকা থমকে গেল গান। ওপাশের চাতাল ধরে এগিয়ে আসছে এক আজব মেয়েমানুষ। গিরিধারীর খোলা মুখ খোলাই রইল। চোখ গুটিয়ে এতটুকু। এ শালী আবার কোথ্‌থেকে জুটল? কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গটুকু ঘিরে শুধু একফালি ন্যাকড়া। আর কোনও সুতোটি নেই শরীরের

কোনখানে। শুকনো খড়ের মত চুলের আঁটি ঝুলে রয়েছে মুখের ওপর। ঝাঁপ কাটছে কাঁধে, পিঠে, উদোম বুকে। কাঠি কাঠি বুকের মাচায় দুখানা কুমড়ো ফুল ফুটে আছে। মেয়েমানুষটার খোলা শরীরে চোখ ফেলে জোর একচোট হাসি পেল গিরিধারীর। পাগলীর সাজেরও বাহার আছে। মাথায় লাল নীল রাংতার ঝিলমিল মুকুট। গলায় একরাশ সুতো আর পুঁতি। ডিগ্‌ডিগে হাতে সার সার প্লাস্টিক চুড়ি। কপাল জুড়ে ইয়া বড়ো ভেল্‌ভেটের টিপ। শালীর এদিক নেই, ওদিক আছে। গিরিধারী দাঁতে ঠোঁট চাপল। কোমর ভেঙে হাঁটছে দ্যাখো যেন রাধারাণী লীলেয় নেমেছে, পাগলী কাছাকাছি আসতেই গিরিধারী গেয়ে উঠল,

কাদের কুলের বউ গো তুমি,
কাদের কুলের আ —আ —নী?

পাগলী ফিরেও তাকাল না। আনমনে আকাশে চেয়ে ভুরু নাচাল কিছুক্ষণ। আঙুলে ধরা রুমালের ফালি বাতাসে ওড়াল। ফোয়ারার ধারে দাঁড়িয়ে রইল উদাস। তারপর সাউথ স্টেশনের ওদিক দিয়ে, গাছের দোকানটা ফেলে, কারবারী আর মানুষজনের চোখ মাড়িয়ে সোজা হেঁটে গেল বাস রাস্তার দিকে।

পাগলী চোখের আড়াল হতে গিরিধারী হাতের কটকটি নামাল। হাসি ধরা মুখে একটু যেন চিন্তার ছাপ। পাগলীটাকে এ চত্বরে কখনও তো দেখা যায়নি। বেটি এল কিভাবে! বাস রাস্তার দিক থেকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে অন্ধকার। স্টেশনের আলোগুলো পুট্‌পাট্ জ্বলে উঠল। গিরিধারী নড়ে বসল। পাগলীর চিন্তা মুছে গিয়ে মাথায় এবার ভর করছে অন্য ভাবনা। আঁধার নেমে এল, কুড়ানটা এখনও ফিরল না কেন? ভাবনা থেকে ভয়। ভয় থেকে রাগ। দিনভোর ছেলেটা কোন্ ভাগাড়ে পড়ে থাকে কে জানে! সেই কোন্ সকালে বসিয়ে রেখে গেছে। দিন মানে একবারও ঠুঁটো মানুষটার খোঁজ নিতে আসে না হারামজাদা। অথচ প্রথম দিকে কত টান ছিল, কত মায়া ভালবাসা। দিনের মধ্যে কিছু না হোক বার দশেক খোঁজ নিয়ে যেত ধরম-বাপের। এমনিই হয়। কোকিলের ছা'র কাকের ঘরে মন টেঁকে না। ডানা যেই শক্ত হোল, অমনি উড়ু উড়ু। গিরিধারীর বুকটা হঠাৎ টিপটিপ করে উঠল। ফিরবে তো কুড়ান? রোজই এমন ধারার চিন্তায় কুটকুট করে মন। ইদানীং ছেলেটার সঙ্গীসাথী জুটেছে। জুতো পালিশঅলা ছেলেটার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব। প্রায়ই টাকা চায়। কি, না জুতো পালিশের বাক্স কিনবে। ব্রাশ চাই দুজোড়া। আর লাল কালো কালি। টাকা পয়সার টোপ গিলিয়ে এখন বশে রাখতে হয় কুড়ানকে। ছল ছুতোয় ভোলাতে হয়। গিরিধারীর বুক ফের মোচড় দিয়ে উঠল। একাশিব ভাঙনে এক থোক্ মানুষের সঙ্গে কিভাবে যেন এসে পড়েছিল ছেলেটা। নাম

বলতে পারে না। ধাম বলতে পারে না। রাতদিন শুধু চিঁ চিঁ কাঁদে। সেসময় ক্যানিং লোকাল দুবেলা ঝাঁকঝাঁক ডিম পেড়ে যেত। হেলে সাপের মত শরীর দুলিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢোকে আর ঝরঝর খসে পড়ে বানভাসি মানুষ। স্টেশনের এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল ছেলেটা। ঠিক যেন জলে ভেজা শালিখ ছানা। কাঁপে আর কাঁদে। এক রাত দু রাত করে তিন রাতের মাথায় রাজ্যের মায়া হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল গিরিধারীর হৃদয়ে। ব্যস্ সেই থেকে সে ধরমবাপ। সে সময়ও কিছু জোর ছিল কোমরে। কাটা ঠ্যাঙ্ দুটোর পাশে লাঠি লটকে চলে যেত মৌলালি মোড়। আজকাল সে ক্ষমতাও নেই। ঠিকমত দাঁড়াতে চাইলে কোমর হড়্কে যায়। মাজা জুড়ে কট্কটে যন্ত্রণা। দিনের বেলা সাউথ আর মেনের ফাঁকটুকুই এখন তার পৃথিবী। সকাল হোলে বাঁধা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে যায় কুড়ান। সন্ধে হোলে তুলে নেয় প্ল্যাটফর্মে। খাবার জোগাড় করে তারপর। জল তোলে। বাসন ধোয়। ও না থাকলে গিরিধারী এখন একেবারে অচল।

পাঁচমেশালি আওয়াজে গমগম চারদিক। লাল নীল বাহারী আলোয় শুরু হয়ে গেছে ঝিকমিক খেলা। গিরিধারী ঝোলার ভেতর কৌটোবাটা পুরে নিল। অনেকক্ষণ পর স্বস্তির বাতাস ফিরে এসেছে বুকে। ওই আসছে কুড়ান। হলুদ বন্যায় পাতলা সরের মত ভেসে যাচ্ছে অন্ধকার। সেই সর কেটে কেটে এগিয়ে আসছে ছেলেটা। মাঝে মধ্যে ডুবে যাচ্ছে মানুষের স্রোতে। আবার ভাসছে। ভাসছে। আবার ডুবছে।

গিরিধারী পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল, আর কেন, না ফিরলেই হোত।

কুড়ান হাসল দাঁত ছড়িয়ে, শালা একটা পাগলী লাচতেছে বটে উদিকে। জব্বর লাচ। সকলে ভিড় করে দেকতিছে।

—তুইও শালা তাই দেকছিলি নাকি?

—না তো কি? একটা ফুলদোকানী মালা দেছে। তাই নে কি অগড়।

কোমর ঘষে কাঠের চাকাগাড়িতে উঠে বসল গিরিধারী, পাগলী কোথ্থেকে এল বল্ দিনি?

—কে জানে। কুড়ান ঠোঁট ওল্টাল, ধরমতলা না বড়বাজার কোন দিক থিকে যেন।

—হুঁ। কুড়ানের ঠেলায় গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলল গিরিধারী, বড়বাজার থেকে ধরমতলা। ধরমতলা থেকে শেয়ালদা। পাগল মানুষ কোথ্থেকে কোথায় যায় কে তার খবর রাখে!

তা গিরিধারী খবর না জানলেও, পাগলী নিজেই খবর হয়ে এল। পরদিন ময়নুদ্দিনের বেটা এসে জানান দিল, ও চাচা, তোমাদের ঠাঁয়ে পাগলীটা সেই

কখুন থিকে শুয়ে আচে।

গিরিধারী তখন গান ধরেছে,

ও আমি মানুষ হইয়া জনম লইয়া
মানুষের করিলাম কি!

আবেশে দুচোখ বোজা। সেভাবেই জবাব দিল, থাক না শুয়ে। আমরা তো এখন যাচ্ছি না। পাগল মানুষ রইল নয় দুদণ্ড।

বুক বড় করে তখনকার মত বলল বটে কথাগুলো, সন্ধেবেলা ডেরায় ফিরেই মন অন্যরকম। তাদের বাঁধা জায়গাটুকু পুরোপুরি দখল করে চিৎপাত পড়ে আছে পাগলী। মরা ব্যাঙের মত ছেতরানো হাত-পা। নিশ্বাস ছুটছে গরগর শব্দে। প্রথম চোটে গিরিধারীর মাথা ঝিম্ঝিম্। তারই বিছানায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে একটা গোটা মেয়েমানুষ। গায়ে চাপ চাপ কাদা মাটি। গলায় দুলছে শুকনো জুঁই মালা। বুকের ওপর থেঁতলানো লেবুর গড়াগড়ি। মুকুটের মাথায় নেতিয়ে আছে লাল-হলুদ পালক। গিরিধারীর চোখ বারকয়েক পাক খেল পাগলীর বুকে। কুড়ানও চোখ ছড়িয়ে জরিপ করছে পাগলীর খোলা শরীর? ঘোর কাটতে গিরিধারী দাবড়ে উঠল ছেলেকে, হাঁ করে দেক্ছিস্ কি? অনেক হয়েছে। এবার তোল্ মাগীকে।

গিরিধারীর লাঠিগাছ তুলে কুড়ান খোঁচা মারল, হেই, হ্যাট্ হ্যাট্।

পাগলী এলোমেলো ঢেউ তুলল শরীরে। মোচড় মেরে পাশ ফিরে শুল। গিরিধারী হেঁকে উঠল, দে কষিয়ে এক ঘা। শালী ঘুমোচ্ছে দেখ যেন মরণ ঘুম।

বারকতক লাঠির বাড়ি খেয়ে উঠে বসল পাগলী। চোখ রগড়ে তাকাল চারদিকে। বোবা চোখের শূন্য দৃষ্টি। তারপর ভারী অলসভাবে উঠে গেল টিকিট ঘরের দিকে। বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে তখন গাড়ি ঢুকছে। মানুষে মানুষে থৈ থৈ চারধার। চাটাই-এ আয়েস করে বসে গিরিধারী চোখ ঘোরাল। ভিড়ের পেটে সেঁধিয়ে গেছে পাগলী। আর দেখা যাচ্ছে না।

—শালী এখানেই থেকে যাবে মনে হয়। গিরিধারী কোমরের খুঁট থেকে বিড়ি বার করল।

গোবিন্দর বউ হেসে উঠল খিলখিলিয়ে, তোর বিছ্না আঁকড়ে পড়েছিল দিনভোর। তোকে খুউপ্ মনে ধরেছে।

—হি হি, বউ পছন্দ হোল, গিদ্দার ভাই?

গিরিধারী চোখ টিপল, শোয়াচ্ছি ভাল করে। আর একদিন দেখি শালীর বারোটা বাজিয়ে দেব .... ।

কুড়ান ইঁটের ফাঁকে কাগজ গুঁজে উনুন সাজাচ্ছে। ঘাড় তুলে বলল, নাতি

মেরে বার করে দোব ইস্টিশান থিকে।

দুই

দিন শেষ করে আঁধার নেমে এল তবু বৃষ্টিব বিরাম নেই।

সকাল থেকে একটানা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি। স্টেশনের চালে পাগলের মত লাফালাফি করছে আকাশ। বাইরের চাতাল জলে জলময়। আঁশটে গন্ধ ঝাঁপ কাটছে বাতাসে। ভেতরচাতাল জল,.কাদা আর কফ থুতুতে মাখামাখি। কোনরকমে প্লাস্টিক কটাকে জোড়া দিয়ে জলের ধারাকে বেঁধেছিল কুড়ান। ভিজে চাটাই-এর ওপর সেখানে গিরিধারী চুপচাপ বসে। ফুলো শরীরখানা গুটিয়ে মুটিয়ে এতটুকু। মন-মেজাজও খারাপ। সারাদিন আজ রোজগারে বার হওয়া গেল না। যাবেই বা কোথায়? পথঘাট চলে গেছে বৃষ্টির দখলে। পৃথিবীকে খামচা ধরে ঝুলছে আকাশ। ছাতাপড়া একখানা পাউরুটি কোথা থেকে জোগাড় করেছিল কুড়ান। তাই গিলে এবার কোনরকমে চোখ বোজার আয়োজন করা। গোবিন্দদের বাসনকোসনে কামড় বসিয়েছে জল। ওরা দল বেঁধে গেছে রেলবাবুদের অফিসঘরের সামনে। একটু আগে গুলে, মোহনরাও কচিকাচা নিয়ে সরে গেল। মাথা বাঁচাতে মানুষজন হুটোপুটি করে মরছে। গিরিধারী স্থিব বসে রইল। বাইরে সিঁড়ির ধাপগুলো একটা একটা করে ডুবে আসছে। জল এবার থাবা বসাচ্ছে শেষ ধাপিতে। খল্‌খল্ হাসছে শয়তানীর মত। সেই হাসিতে গলা মিলিয়ে দুমদাড়াক্কা এসে গেল ওরা। পায়ে গামবুট, শরীর মাথা আড়াল নিয়েছে কালো বর্ষাতির তলায়। আঙুলের ডগায় বনবন রূপোলি চেন্। গিরিধারী টান্ হল। এত ঝড় জল মাথায় নিয়েও ঠিক তোলা তুলতে বেরিয়ে পড়েছে লট্‌কার সাঙ্গোপাঙ্গোরা। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে। ভেজা মানুষগুলো ছটফটানি ভুলে সব জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে। ব্যাঙা শকুনের মত ঝাঁপিয়ে ছন্নুর ঘেঁটি চেপে ধরল, কি বে, কাল কোথায় ছিলি? মাল ছাড়।

বিপদের গন্ধ বুঝে গিরিধারী আগেই ইশারা করে দিয়েছে কুড়ানকে। গুনে গুনে পয়সাগুলো সে তুলে দিল পঞ্চার হাতে। তাই দেখে খুকখুক হেসে উঠল ব্যাঙা. দ্যাখ্ ব্যাটা, নুলোটাকে দ্যাখ্। আমাদের কত ভক্তি ছেরেদ্দা করে। আসতেই মাল রেডি।

—তুই শালা বড় ভ্যান্‌তাড়া করিস। মার না লাথ্ হারামীটাকে। পঞ্চা উদাস মুখে কথা কটা ভাসিয়ে এগিয়ে গেল বেঁটে জি আর পি-টার দিকে, কি দাস্‌দা, আমদানি কেমন?

দাস চকচকে চোখে তাকাল টিকিটঘরের দিকে, আমদানি এখন একটাই রে। ওদিকে দ্যাখ্।

টিকিটঘরেব সামনে পা ছড়িয়ে পাগলী উকুন বাছ্ছে এক মনে। সেলিম পা টিপে এগিয়ে গেল, আইব্বাস্, এ যে শালা আস্মানের মাল। বৃষ্টির সঙ্গে পড়ল নাকি বে?

—যা যা, তোদের জন্যই পুষে রেখেছি। কিছু খেতে দিলেই একেবারে গায়ের সঙ্গে লেপটে যায়। আরেকজন জি আর পি ঠোঁট চেপে অশ্লীল ভঙ্গি করল।

—মাইরি?

স্টেশনের বাইরে ঝিরঝির নাচছে বিদ্যুৎ। তালে তালে বাদ্যি বাজছে আকাশে। সেলিম চায়ের ষ্টল থেকে একখানা বানরুটি তুলে পাগলীকে দেখাল, কি রাণী, চলবে নাকি?

পাগলী তাকাল না। শুধু মাথায় বাঁধা রাংতার মুকুটখানা ঝিকঝিকিয়ে উঠল।

ব্যাঙা আরেকটা বানরুটি তুলে ছুঁড়ে দিল, আয় আয় শালী খেতে দেব।

দিনভোর উপোসী পাগলী চকচকে চোখে তাকাল বানরুটির দিকে। জিভ চাটল বারকতক। সেলিমও হাতেরটা ছুঁড়ে দিয়েছে। মন্ত্রপড়া কেউটের মত পিছলে পিছলে এগিয়ে এল পাগলী। দু-চোখে জবজবে খিদে। ছোবল ওঠাল রুটির দিকে। পঞ্চা ছোঁ মেরে সরিয়ে নিল টোপটা,

—এখানে নয়, ওদিকে আয় শালী।

হ্যাংলা কুকুরের মত পাগলী ওদের পেছন পেছন যাচ্ছে। চারদিকের মানুষ রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে। জল মাড়িয়ে, কাদা পেরিয়ে মালঘরের শেডের দিকে চলে গেল ওরা। পাগলী কি চিৎকার করল? একটা গোঙানির শব্দ ভেসে এল না? বৃষ্টির শব্দ আর পাগলীর কান্না মিলেমিশে এক এখন। গিরিধারীর মেরুদণ্ড কাঁপিয়ে অদ্ভুত ঠাণ্ডা একটা স্রোত ওঠানামা করতে লাগল। এত বড় চাতালের একটা মানুষও কেউ কোন কথা বলছে না। স্তব্ধ বসে আছে পাথরের মত।

সেই শুরু। ব্যাঙা সেলিমদের দেখাদেখি অনেকেই শিখে গেল পাগলীকে জাদু করার মন্ত্র। পুলিশ, মস্তান, ভিখিরি, কারবারী, মুটে-মজুর কেউই বাদ যায় না এখন। পাগলীকে খাবার দেখায় আরেঠারে। শালীর পেটে খিদেও আছে। এক চিমটে খাবারের গন্ধ পেলেই লক্লক্ করতে থাকে জিভ। উড়াল পুলের নীচে রাস্তার মত বিছিয়ে দেয় নিজেকে।

তিন

ভর দুপুরে কল থেকে ফিরে ময়নুদ্দিনের বিবি হায় হায় করে উঠল, উদোম মাগীর পেটে ছাওয়াল এয়েচে গো। আতদিন বমি করতিচে।

গিরিধারীব শরীর জুড়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। তাই কদিন ধরে খাওয়ার জন্যে আর হাঁকপাঁক করে না পাগলী! গিরিধারী অবাক চোখে দেখে। দেখে আর ভাবে। পড়ে আছে থাক্। একটু ভাল হোলেই তো মালঘরের দিকে যাবে। ভাবে ঠিকই। তবু শংকা যায় না। ইদানিং কি যে হয়ে গেছে তারও ভেতরটায়! চোখ শুধু পাগলীকে খুঁজে বেড়ায়। খুঁজে পেলেই বুক জুড়ে জমাট বাঁধে দানা দানা কষ্ট। —দয়াল একি লীলেখেলা তোমার, একি লীলেখেলা। আপনমনে সে বিড়বিড় করে যায়। মেয়েমানুষের শরীর কি আজব। পাগল দেহেও চারা গজায়।

ভাবতে ভাবতে ক্রমশ গান ভুলে যেতে থাকে গিরিধারী। কুড়ান সকাল হোলে নিয়মমতই বসিয়ে দিয়ে যায় ইঁটের ধারে। বসানোই সার। আগের মত আর তেমন উপায় হয় না। শুধু শুধু বোবা মুখে বসে থাকা ভিখিরিকে কে আর যেচে পয়সা দিতে চায়।

বেলা বাড়ছে। আজও থম্ মেরে বসে আছে গিরিধারী। চোখের পর্দা জুড়ে রোজকার মতই নানান মুখের আসা যাওয়া। সবই ঠিকঠাক আছে। তবু কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কদিন যাবৎ আর এদিক সেদিক নেচে বেড়াচ্ছে না সে। ঘুরছে না আপন খেয়ালে। গিরিধারী নিঝুম চোখে চারদিকে তাকায়। ফোয়ারার ধারে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়েছে। লাল শালুর ছড়াছড়ি সেখানে। আজ তবে গলা ফাটিয়ে লাভ নেই। কেউ শুনবে না গান। বাবুদের মিটিং আছে আজ। লাল শালুর গায়ে দুম্‌দাম্ তেরঙা কাপড়ও ঝুলে পড়ল। দু-দল দুদিকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণ। একদল হাঁকল, কলকাতাকে মরা বলা চলবে না। চলবে না।

আরেক দল জবাব দিল মাইকে, কলকাতার বুকে নতুন প্রাণ আনবে কে?......

দেখতে দেখতে কথার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর তর্জন গর্জনে দশদিক থরথর। বাবুরা রগ ফুলিয়ে এ তাকে গাল পাড়ছে। সেদিনের মত মারপিট না লেগে যায়। গিরিধারী ভয়ে ভয়ে তাকাল। কুড়ানটা সময় মত ফিরবে তো? বাবুরা যে লড়তে লড়তে ক্ষ্যাপা ষাঁড় হয়ে যায়। আগে একবার যুদ্ধের মুখে পড়ে নুলো শরীরটার সে কী হয়রানি। মানুষগুলো যে যেমন পারছে ছুটে

পালায়। টুকরো ইঁটের মত ধাক্কা খেয়ে সে শুধু গড়াগড়ি যায় চত্বরে।

গিরিধারী হাতের চাপে চাকাগাড়িখান্ ঠেলার চেষ্টা করল। এমন সময় কোথা থেকে ভগবানের মত উদয় হল ময়নুদ্দিনের বেটা। হাফ্ প্যান্ট খসে পড়েছে কোমর থেকে। উত্তেজনায় হাপরের মত হাঁপায় ছেলেটা, ও চাচা, উদিকে ইস্টিশনে কী অক্তাঅক্তি কাণ্ড গো। পাগলীর পেট খসে গেছে। আর বোধহয় বাঁচবেনি।

ছেলেটার কথাগুলো বুকে লোহার ডাণ্ডা মারল যেন। মুহূর্তে নিজের ভাবনা ভুলে গেল গিরিধারী। শিরদাঁড়া বেয়ে বন্যার জল ছুটে আসছে। হৃদয় বুঝি ভেসে যাবে। ঝোড়োপাতার মত গলা কেঁপে উঠল, আমাকে এট্টু লাটফর্মে পৌঁছে দিবি বাপ্?

তিন দিন তিন রাত ঘুম নেই চোখে। গিরিধারী চেয়ে চেয়ে দেখল কিভাবে মড়ার দেহেও প্রাণ ফেরে একটু একটু করে। নেতানো শরীরখানা নিজের জোরেই চাঙা করে তুলল পাগলী। শুধু গিরিধারীর মাথাটাই খারাপ করে দিয়ে গেল একেবারে। আর মোটে ভিক্ষেয় বেরোতে চায না। নিজের ঠাঁয়ে বসে ঝিমোয় রাতদিন। চোখ বেয়ে নামে কাদাজল। ভাবের ঘোরে দিন যায়।

দেখে দেখে ভয় ধরে কুড়ানের প্রাণে। ধরম বাপকে ধমকায়, ও পাগলীর জন্য তুই এত ভেবে মরিস কেন? ও তোর কে?

গিরিধারী আধখানা শরীরটাকে মৃদু দোলায়, কেউ কারো নয় দুনিয়ায়, কেউই কারো নয় গো।

আবোল তাবোল সুর তুলছে গিরিধারী। কুড়ান গাল ফোলায়, এমন ধারা চলতে থাকলে পয়সা আসবে কোথ থিকি? আমারে বুট পালিশের বাক্স কিনে দিতে হবে কিন্তু হ্যাঁ।

গিরিধারী ঝিম্ মেরে যায়।

কুড়ান কেঁদে ফেলে, আমিও চলে যাব। আর ফিরবুনি। পাগলী তোরে কত দ্যাখে দেখি।

গিরিধারী উদাস তাকায়। কুড়ানের পিত্তি জ্বলে যায়। হিংসে দাঁত বসায় বুকে। এভাবে চলতে থাকলে পাগলীকে ঠিক একদিন খুন করবে সে। কটমট তাকিয়ে থাকে পাগলীর দিকে। মানুষটাকে বিগড়ে দিয়ে দিব্যি কেমন সেরে উঠেছে। কোমর দুলিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক। খেপিয়ে দিলে নাচছে হাত ঘুরিয়ে। মাথায় ঝিলমিল মুকুট। গলায় পুতির বাহার।

চার

অনেকদিন ভুগে উঠে আবার রোজগারে বসেছে গিরিধারী। কুড়ান চাকাগাড়ি বসিয়ে গেছে ইঁটের ধারে, পিরীত করে জোর মরেছিলি। আর মোটে তাকাবিনি লেংটিটার দিকে।

গিরিধারীর ভাঙা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোলে চাপ চাপ কুয়াশা। কাশবন চুলের গোছা নেতিয়ে পড়েছে। দেখলেই বোঝা যায় জোর কামড় মেরেছিল রোগ।

কাঁপা গলায় গান ধরল গিরিধারী। দুর্বল হাতে কটকটি নাচছে খটাখট। ভারি মিঠে রোদ উঠেছে আজ। উড়াল পুলের মাথায় চড়ে হাসছে আকাশ। ঝকঝক করছে পৃথিবী। পাশেই কঞ্চিঘেরা জমিতে রাধাচূড়ার চারা। গিরিধারী ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল। বছর ঘুরে গেল তবু মোটে বাড় এল না গাছটার শরীরে। বছবখানেক তো হয়েছে বটেই। গতবার এই পুজোর মরশুমেই তো মন্ত্রী এসেছিল এখানে। চাতালের আশে পাশে অনেকগুলো গাছের জন্ম দিয়ে গিয়েছিল। রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, শিরীষ জারুল। সব কটা চারাই যেমন ছিল তেমন বেঁটে খব্বুরে রয়ে গেছে। কার দোষে বাড়ল না চারাগুলো? রাজদোষে কি? রাজা মন্ত্রীদের শরীর বদ্‌রোগের বাসা। এ কথা কে না জানে। গিরিধারী হাসল। তবু রাজা বলে কথা। তার জন্যই সে কী যজ্ঞ সেবার। মন্ত্রী দলবল নিয়ে একেকটা জায়গা ঘিরে দাঁড়ায় আর কুট করে জন্ম নেয় একটা গাছ। এসব কথা অবশ্য কুড়ানদের মুখে শোনা। গিরিধারীর মত নুলোদের বাইরে আসার হুকুম ছিল না সেদিন। আগের রাতেই রেলবাবুরা শাষিয়ে গিয়েছিল। গিরিধারীর বড় শখ ছিল একবার চর্মচোখে মন্ত্রী দেখার। রাজদর্শনে পুণ্য হয়। মন্ত্রী মানেই তো রাজা। গিরিধারী জানে রাজার কাল শেষ হয়ে এখন মন্ত্রীর যুগ। তা সেদিন তাকে ঘাড় গুঁজেই পড়ে থাকতে হয়েছিল গুদাম ঘরের পেছনে। ভিখিরী দেখলে মন্ত্রীদের নাকি চোখ করকর করে। ভাগ্যিস পাগলী আসেনি তখনও। ওকে যে কি করে সামাল দিত পুলিশ আর বাবুরা! এই দ্যাখো, আবার পাগলীর কথা মাথায় ঢুকে যাচ্ছে। গিরিধারী জিভ কাটল। কুড়ানের কাছে দিব্যি খেয়েছে আর কোনদিন পাগলীর নাম মুখে আনবে না। সেদিনের কথাই ভাবতে চাইল মন দিয়ে। সেদিন গোটা শেয়ালদায় সে কি হৈ চৈ কাণ্ড। শেয়ালদা কেন গোটা শহরটাই সেজেছে রাণীর বেশে। মিনিটে মিনিটে ঝাঁট, নোংরা সাফাই, বাবু আর পুলিশ দলের হুটোপুটি। মুটে-মজুর, চালের কারবারী কেউ ছুটছে না বোঝা মাথায়। হকারগুলো কোন্ মন্ত্রে উধাও। চেকারবাবুরা নিপাট ভেজা

বেড়ালের মত দাঁড়িয়ে গেটে। সেদিন তাদেরও ভিক্ষেয় দাঁড়ানো বারণ ছিল বোধহয়। এখানকার চেহারাই সেদিন আলাদা। ঠিক যেন . .। দূর, আবার পাগলী ভেসে উঠছে বুকে। গিরিধারী প্রাণপণে চোখ বুজে ফেলল,

হে ভগবান, হে ভগবান।
যদি কিছু করো মোরে দান,
হৃদয় ভবিয়া দিও প্রে এ এম......

এ জীবনে কারুকে বুক ভরে প্রেম দেওয়া হোল না। আধখানা শরীর দেখে একটাও মেয়েমানুষ এল না কাছে। ছন্নু বলে, মেয়েমানুষে কি মজা তা আর এ জেবনে জানলি না গিদ্দার।

আবার বুক বেয়ে শুঁয়োপোকার মত উঠে আসছে কষ্ট। তলপেটে বিদ্‌ঘুটে যন্ত্রণা। দরদরিয়ে ঘামতে লাগল গিরিধারী, হে ভগবান, হে ভগবান...

কৌটোর বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে পয়সা। চোখ বুজে গান ধরেছে গিরিধারী। গানের মাঝে কখন যেন নেমে এসেছে আঁধার। গিরিধারীর খেয়াল নেই। অন্ধকার কোলে নিয়ে একভাবে সুর তুলে চলেছে গলায়। ধরমবাপকে নিতে এসে কুড়ান থমকে দাঁড়াল। ছায়া ছায়া অন্ধকারে রুপোলি চাকতিগুলো ঝিকঝিক করছে।

—এতগুলো পয়সা ছইড়ে গ্যাচে তুলিস্‌নি কেন?

গিরিধারী চোখ খুলল।

দু চোখ ভরা সন্দেহ নিয়ে তাকে বুঝতে চাইল কুড়ান। ধরমবাপের এ মুখ তার একেবারেই অচেনা।

·

রাতে কুড়ানের নাক ডাকা শুরু হোলে শরীরটাকে টেনেটুনে তুলল গিরিধারী। গভীর ঘুম নেমে এসেছে গোটা চত্বরে। গিরিধারী নিঃশব্দে লাঠিগাছ তুলে নিল কুড়ানের মাথা থেকে। ছেলেটা টের পেলেই মুস্কিল। বড় হিংসে বেটার শরীরে। পাগলী টিকিট ঘরের পেছনে বসে ঝিমোচ্ছে। আরেক ঝলক তাকে দেখে নিল গিরিধারী। মাথায় লাল ফিতের ফুল, গলায় শুকনো গাঁদার মালা।

—আজ তোরে নিয়ে আমি ফুলশয্যে করব রে পাগলী। গিরিধারী উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। শুকনো দড়ির মত পায়ের টুকরো দু'টো লতপত দোল খাচ্ছে। শিরদাঁড়া কটকটিয়ে উঠল। কোমর বুঝি খসে পড়বে এখনই। প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রাখার চেষ্টা করল গিরিধারী। ঝমঝম ঘাম ঝরছে শরীর বেয়ে। চামড়ার নিচে বিশ্রী যন্ত্রণা। বার কয়েকের চেষ্টায় একটা মানুষ টপকাল। তারপর আবার একটা। নাঃ, আর যাওয়া যাবে না। সার সার মানুষ শুয়ে আছে পথ

জুড়ে। এ এক আজব ঘ্যাবাড়ি মানুষের। মনে মনে দেওয়াল দিয়ে ঘরেব বেড়া তোলা। গিরিধারী সামনে ⁻হ টা আঁকড়ে কুকুরের মত হাঁপাতে থাকল। আসছি রে পাগলী। আমি আসছি। আবার একটা মানুষ পার হোল। আব দুজনকে ডিঙোতে পারলেই সামনে ফাঁকা পথ। গিরিধারী শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে এগিয়ে যেতে থাকল।

—এই পাগলী, অ্যাই। দূর থেকেই হিসহিসিয়ে উঠল গলা। পাগলী ঢুলছে মাতালের মত। খোলা চোখে একবার তাকাল যেন। জিভ বাব করে হাঁপাচ্ছে গিরিধারী। হাঁপাতে হাঁপাতেই কোনমতে সন্দেশের বাক্সখানা দেখাল। আট আনা দামের দুখানা সন্দেশ। ময়িনুদ্দিনের বেটাকে দিয়ে চুপি চুপি আনিয়েছে। সঙ্গে খান তিনেক আটার রুটি।

– এই যে তাকা। দ্যাখ্ কি এনিচি ।

পাগলী চোখ খুলে মিষ্টির বাক্স দেখল। জিভ চাটল বার বাব। ও এখন জেনে গেছে খাবার পেলে কি কি করতে হয়। প্রথমে একটু দোলে। লালা ঝরে মুখে। তারপর গুটি গুটি হেঁটে যায় খাবারওলার পেছন পেছন। অন্ধকারে ছোবল মেরে মুখে ঢোকায় খাবার। কচকচ চিবোয়। চিবোতে চিবোতেই শুয়ে পড়ে। খুলে দেয় কোমরের ন্যাকড়া। খেলা শেষ করে উঠে যায় অন্নদাতাবা। পাগলী পড়ে থাকে ছিবড়ে আখের মত। কোনদিন গোঙায়। রাতভোর ছটফট করে।

পাগলীর হাত খামচে টান দিল গিরিধারী, এখেনে নয়। ওদিকে চল্।

পাগলী থাবড়া দিল সন্দেশের বাক্সে।

দুই লাঠির ভরে বহুকাল পরে গিরিধারী একা একা হাঁটছে। পিঠ বেয়ে লাখ খানেক আরশোলার ওঠানামা। টিকিটঘরের পেছনে এসে সব দম ফুরিয়ে গেল। থেবড়ে বসল শানের ওপর।

মুখোমুখি বসে সন্দেশ গিলছে পাগলী। গিরিধারী কাঁপা কাঁপা হাত রাখল তার বুকে, তোরে আমি খুউব ভালবাসিরে। বিশ্বেস কর ভালবাসি।

পাগলী তাকাল না। মন দিয়ে রুটি ছিঁড়ছে।

—তোরে আমি বে করব। বুকের ভেতর রেখে দেব।

খাওয়া শেষ করে পাগলী অভ্যাস মত শুয়ে পড়েছে। গিরিধারীর চোখ দপ দপ করে উঠল। পেটের কাছে সেই পুরোনো যন্ত্রণা। পাগলী নিথর পড়ে। পাশে শুতে গিয়েও পারল না গিরিধারী। শরীর ভেঙে কান্না উঠে আসছে। পাগলীর হাত চেপে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

—তোরে আমি রোজ খেতে দেব। দু'বেলা ভরপেট খাওয়া। যা তুই চাস্।

শুধু শুয়োরের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে আর শুবি না তুই। হারামীগুলো তোকে চুষে শুষে শেষ করে দেবে।

পাগলী চোখ খুলে পিট পিট তাকিয়েছে। নুলো মানুষটা বগলে লাঠি গুঁজে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

কদিন বাদেই খবর পেল। পাগলীর আবার পেট হয়েছে। গিরিধারী দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে উঠল, শুয়োরের বাচ্চারা.....

পাঁচ

রাতের ঘুম বুঝি জন্মের মত তালাক দিয়ে গেছে মানুষটাকে। কোন রাতেই ঘুম আসে না চোখের পাতায়। এ এক বিদঘুটে যন্ত্রণা। রাত বাড়লে দুনিয়ার গতরে যখন ঝিমুনি নামে, গিরিধারীর সমস্ত দেহকোষ তখন টসটসে হয়ে ওঠে। শরীর জুড়ে লাট খায় বিশ্রী কষ্ট। শরীর থেকে মন, মন থেকে আরও ভেতরে। আরও গভীর কোন গোপন জায়গায়। সে তখন চাটাই-এর ওপর এপাশ ওপাশ করে মরে। নিশ্বাস দৌড়োয় উন্মাদের মত। লালচে দুচোখ অস্থির চক্কর দেয় চারদিকে। কোন কোন দিন খুঁজে পায় তাকে। বেশির ভাগ দিনই পায় না। তখন উইপোকার ঝাঁক ঢুকে পড়ে মাথায়। মাথা থেকে বুক, বুক থেকে পেট। পেট থেকে আরও নিচে। শরীরের অক্ষম অঙ্গে।

কুড়ান পাশেই বেহুঁশ ঘুমোয়। প্রায় রাতেই তাকে খুঁচিয়ে তোলে গিরিধারী। সরু লাঠির ডগা ফুঁড়ে দেয় ঘুমন্ত পেটে।

—এই কুঁড়ো, কুঁড়ো জাগলি?

ঘা কতক খেয়ে উঠে বসে কুড়ান। তেতো মুখে চোখ কচলায়। গিরিধারীর গলা ঘড়ঘড় করে, ওঠ্ বাবা। একবার দেকে আয়।

চোখ থেকে জোর করে ঘুম সরিয়ে কুড়ান কাঁধ ঝাঁকায়,

—কত দিবি?

—দশ নয়া।

—হবেনি।

—শালা, খুব পয়সার খাঁই হয়েছে? পয়সা চিনেচো অ্যাঁ!

কুড়ান ফিচেল হাসে।

—যাঃ, পঁচিশই দেব। মালঘরের দিকটা ভালভাবে দেকে আয়।

দাঁড়িয়ে উঠে ইজেরের দড়ি শক্ত করে বাঁধল কুড়ান। সার সার ঘুমন্ত মানুষগুলোকে টপকে এগোল সিঁড়ির দিকে। আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ

সারল। সামনেই ধূ ধূ করছে বিশাল স্টেশন প্রাঙ্গন। বাতের গন্ধে চারদিক ঝিমঝিম। নরম বাতাস হাঁটছে টালমাটাল। রোদের মত লালচে হলুদ আলোয় ডুবে আছে রাত। একটু এগোতেই লাল আলোয় লেখা শেয়ালদার নাম জ্বলজ্বল। এ সময়টা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভারি ভাল লাগে কুড়ানের। পাগলীকে খোঁজার নাম করে রোজই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

ফোয়ারাগুলোর মাথায় উঠে পা ছড়িয়ে শুয়েছে উড়ালপুল। ফাঁকা রাস্তার দেহ ছিঁড়ে একখানা ট্রাক ছুটে গেল। কুড়ান ভুরু কোঁচকাল। ট্যাক্সি শেডের নিচে এক থোক জমাট অন্ধকার। সেখানে দাঁড়িয়ে ঢ্যাঙা পুলিশটা দর কষছে একটা মেয়েছেলের সঙ্গে। কোমর দুলিয়ে বিদঘুটে কিছু অঙ্গভঙ্গি করল কুড়ান। ছোট্‌কুর কাছে শিখেছে এসব। ছোট্‌কু বড় হোলে মস্তানের দল খুলবে। কুড়ানকেও সেখানে নিতে চায়। ছিন্‌তাই করবে খোকাদের মত। তারপর ডাকাতি। ছোট্‌কু বলে বড় হোলে কলকাতার সব দোকানগুলোকে সাফ্ করে দেবে। সেদিন পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। হেভি ধোলাই খেয়েছে পাবলিকের হাতে। গুদাম ঘরের দিকে পেছন ফিরে নাক ঝাড়ল কুড়ান। গিরিধারীর মতলব এখনও বোঝা যাচ্ছে না। মুখে বলে ধরমবাপ। শালা মাল ছাড়ার বেলায় হাড় কঞ্জুস। বহুত টাকা জমিয়েছে। কুড়ান সব খবর রাখে। গিরিধারীর পয়সা পেলে ছোট্‌কুর দলে যাওয়ার দরকার নেই। হারুর মতই জুতো পালিশের ব্যবসা ধরবে। ও ধান্দায় মার খাওয়ার ভয় কম। কুড়ান দুপা এগোল। গুদাম ঘরের ছায়া ছায়া অন্ধকারে দুটো শরীর পড়ে আছে জোড়াসাপের মত। লোকটা মনে হয় ছন্নু মিঞা! নাকি ময়িনুদ্দিন কিম্বা গোবিন্দ! সব শালাই এখন পাগলীকে খাওয়াতে শিখে গেছে। পাগলী গপাগপ খায় আর হুড়হুড় পেট খসায়। আছে ভাল। শরীর লিকলিকে মরা লতার মত, তবু শালীর নোলা কমে না।

কুড়ান আরেকটু এগোল। যাঃ শালা, ওটা পাগলী নয়, অন্য মেয়েছেলে। ধূর. ভাল লাগে না। রাতবিরেতে এখন কোথায় পাবে তাকে! গিরিধারীটাও শালা পাগল হয়ে গেছে। যে যা খুশি করে বেড়াক, তোর কি? নিজের মুরোদ নেই একআনা, তবু সারাক্ষণ হামলে মরছে।

কুড়ান টিকিটঘরের দিকে ঘুরে এল। পেছন থেকে গোঙানির শব্দ আসছে যেন। গিরিধারী বলে, তুই শুধু নজরটুকু রাখবি তার ওপর; আমি তোকে আমার সব টাকা দিয়ে দেব।

মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পাগলী। কুড়ান থমকে দাঁড়াল। ভীষণভাবে হাত পা ছুঁড়ছে মেয়েমানুষটা! মুখ বেয়ে শব্দ উঠছে গঁ গঁ। পায়ে পায়ে আরো কাছে

এগোল। পাগলীর কষ বেয়ে সাদা ফ্যানার বুড়বুড়ি। চোখের কোণে থকথকে জমাট জল। কুড়ানের হঠাৎ শরীর গুলিয়ে কান্না ছুটে এল। এতদিন চোখে পড়েনি, যন্ত্রণাভরা এ মুখের সঙ্গে কার যেন খুব মিল। কার? কার? আবছা ভাবে মুখটা ভেসে উঠেই ডুবে যাচ্ছে বারবার। কোথায় দেখেছে এ মুখ? এই শহরেই? নাকি বিশাল বড় নদীটার উথাল পাথাল ঢেউয়ে?

কুড়ান পাগলীর মাথার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। দুহাত দিয়ে মুছে দিল চোখের জল, মুখের লালা। নরম করে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। রাংতার মুকুট ঠিক ঠিক বসিয়ে দিল কপালের ওপর। রঙ্‌বেরঙী মালাগুলো তুলে দিল বুকে। তারপর নিজের জামা খুলে ঢেকে দিল উদোম শরীরটা। প্রাণপণে তার হাত দুটোকে এবার খামচে ধরেছে পাগলী। কী প্রচণ্ড শক্তি গায়ে! কুড়ানের মনে হোল তার হাতের হাড়গুলো বুঝি গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কিশোর কুড়ান বুঝলো এ হাত একবার ধরলে আর কোনদিন ছাড়ানো যায় না।

বনসাই

দাড়িওলা দোকানদার ব্যস্তসমস্ত মুখে প্রশ্ন করল,—আপনি ঠিক কোন রঙটা খুঁজছেন ম্যাডাম?

সুন্দরী গৃহিণী তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। দোকানেব কোণে তারের খাঁচায় এক ঝাঁক বদ্রিকা হুটোপুটি করছে, প্রায় ছুট্টে চলে গেল সেখানে। দোলায় বসা একটা পাখির দিকে ঝট করে আঙুল দেখাল, —ওইটা। ঠিক ওই রঙটা চাই।

প্রার্থিত রঙের টিন কাউন্টারে সাজাচ্ছে দোকানদার......

সিরিয়ালের মাঝে কমার্শিয়াল ব্রেক। রঙের বিজ্ঞাপন। দূর, সাদাকালো টিভিতে রঙের মাহাত্ম্য কিছুই বোঝা গেল না। কী রঙ চাইল মেয়েটা? নীল? খয়েরি? হলুদ? নাকি এই ঘরের দেওয়ালের মতো ক্যাটকেটে সবুজ?

বিরক্ত মুখে সীমা বলে উঠল, —অসহ্য।

তাপস সবে বাড়ি ফিরে অফিসের খোলস বদলাচ্ছিল। শোওয়ার ঘর থেকেই বউয়ের আক্ষেপোক্তি বুঝি কানে গেল তার। লঘু স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়ল, —হল কী?

--তোমার এই টিভি। সীমা আবার বলল, —অসহ্য।

—কেন, পিকচার গণ্ডগোল করছে?

মেঝেয় বসে পিসবোর্ডে টুকরো জোড়া দিয়ে খেলনাবাড়ি বানাচ্ছে তিতলি। ফুড়ুৎ করে বলে উঠল, —না বাবা, পিকচার ঠিক আছে।

—তাহলে?

--তাহলে কী তুমি জানো না? সীমা ঝেঁঝে উঠল, —কবে থেকে বলছি এ টিভিটাকে বদলাও, এ টিভিটাকে ফ্যালো। বিশ্বসুদ্ধু লোকের বাড়ি কালার টিভি এসে গেল, শুধু আমরাই ওই মান্ধাতার আমলের... দূর দূর, কোনও কিছুর বঙ

বোঝা যায় না! গাছের রঙও যা, মানুষের রঙও তাই, শাড়ির রঙও তাই...

গজগজের মেলট্রেন চলছে সীমার। তাপস উত্তর দিল না কোনও। টুক করে বাথরুমে ঢুকে গেল। ফিরে এসে বসেছে সোফায়। ঝুঁকে মেয়ের চুলে হাত বোলাচ্ছে।

সীমা কটমট করে স্বামীর দিকে তাকাল, --বোবা হয়ে থাকলেই সব চাপা পড়ে যাবে! আমিই শুধু মুখ নষ্ট করে হেনস্থা হচ্ছি!

—যাহ্ বাবা! কে তোমায় হেনস্থা করল?

—তুমি করছ। আমার কোনও চাওয়ার কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে। একে হেনস্থা করা ছাড়া আর কী বলে?

তাপস হেসে ফেলল, —চটছ কেন? যা হয় না তা বলছই বা কেন?

—কেন হয় না? আমাদের কি একটা কালার টিভি কেনারও মুরোদ নেই?

তাপসের মুখ সামান্য ম্লান হল এবার, —কালার টিভির দাম জানো?

—সব্বাই জানে। তিতলিও জানে। তিতলি বলে দে তো বাবাকে একটা কালার টিভির দাম কত।

চার বছরের তিতলি ঘাড় না তুলে পাকা বুড়ির মতো জবাব দিল, —বুবাইদের টিভির দাম কুড়ি হাজার টাকা, বুবাই বলেছে।

আরও ম্লান হল তাপসের মুখ, —এক কথায় অত টাকার একটা জিনিস কিনে ফেলা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

—একটু কম দামের কেনো। বারো হাজারে, তেরো হাজারে।

—তাই বা পাব কোথায়?

—ইন্‌স্টলমেন্টে কেনো। আজকাল তো হাজারো রকমের স্কিম চালু হয়েছে।

—সেখানেও তো প্রথমে কিছু থোক লাগবে। তাছাড়া মাসে মাসে আমি ইনস্টলমেন্টের টাকাই বা জোগাব কোথ্থেকে? পি এফে প্রতি মাসে কতগুলো করে টাকা শোধ করতে হচ্ছে, এল আই সি'র লোন মেটাতে হচ্ছে....

---বুঝেছি বুঝেছি। শুধু বাহানা, শুধু বাহানা। আসল কথা বলো না, বউয়ের কোনও সাধআহ্লাদ পূর্ণ হয় তা তুমি চাও না। তুমি একটি ন্যাদোস।

তিতলি হি হি হেসে উঠল, —এমা, বাবা নাকি ন্যাদোস!

সীমা সংযত হল একটু। উঠে দাঁড়িয়ে হিম হিম গলায় বলল, —চা খাবে?

—থাক। এসে থেকেই যা জুটছে।

—সে তো নিজের দোষে।

—আমার কি মনে হয় জানো সীমা? তোমার একটু অন্য রকম ঘরে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। টাকাপয়সাওলা ফ্যামিলিতে। ফস করে কথাটা বলে ফেলল

তাপস, —আমার মতো প্রায় কেরানি গোছের মানুষ তোমার জন্য মিসফিট।

তাপস গোমড়া হয়ে গেছে। সন্তর্পণে তিতলির দিকে তাকিয়ে রান্নাঘরে সরে এল সীমা। মেয়ের সামনে মাকে এমন কথা বলে কোন বাবা? ছিহ্ ছিহ্। তাপস কথাটা আজকাল প্রায়ই বলে। ইচ্ছে করে বলে। সীমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য বলে। সত্যি সত্যি তাপসের থেকে ভাল বর জোটে নি বলেই হয়তো বলে। সীমা গ্যাসে কেটলি বসাল। হত হত, ভাল বিয়ে হত মশাই। সীমা দেখতে খারাপ, না ফিগার খারাপ? বিয়ে তো নয় নয় করে কম দিন হয় নি, ছ'বছর, এখনও তাপসের বন্ধুরা আড়ে আড়ে তাকায় কেন। খারাপ যদি কিছু থেকে থাকে, সে হল সীমার কপাল। তার লিখন কে খণ্ডায়! নইলে কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল.....সেই যে ছেলেটা, ডটপেন তৈরির বিজনেস, ফর্সা লম্বা, কী স্মার্ট....ব্যবসা করে বলে বাবা তাকে বাতিল করে দিল। কী, না ব্যবসায়ীদের রোজগারের কোনও স্থিরতা নেই! আজ রমরমা, তো কাল উল্টো গণেশ! ছেলেটা ছবি দেখেই সীমাকে পছন্দ করেছিল তো! সেসব আফশোস ভুলে তাপসকে তো মেনে নিয়েছে সীমা, তার পরও এত কথা ওঠে কেন!

জল ফুটে গেছে। ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে কেটলির ঢাকনা খুলল সীমা, চায়ের পাতা ফেলল। হাল্কা সুগন্ধ ভেসে এল নাকে, তবু খিঁচড়োনো মেজাজটা সিধে হচ্ছে না। তাপস কি চেষ্টা করলে আরেকটু সাধ আহ্লাদ পূর্ণ করতে পারে না সীমার!

কাঁপ প্লেট হাতে সীমা বসার জায়গায় এল। তাপসের পাশ ঘেঁষে বসেছে। চোখের কোণ দিয়ে তাপস দেখছে তাকে, টের পাচ্ছে সীমা। অপলক চোখে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। একটা হিন্দি সিরিয়াল চলছে টিভিতে। দেখছে সীমা, অথচ দেখছে না।

—রাগ করে আছ এখনও?

সীমা ঘুরল না, —রাগ করে থাকা কি আমার শোভা পায়?

—কখন কী বলে ফেলি! সরি!....স্লিপ অফ টাঙ্।

সীমা নিশ্চুপ।

তাপস ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, —কেন আমার অবস্থাটা একটু ফিল্ করতে চাও না তুমি? কার জন্য আমি প্রাণপাত করি? আমার বাপ ঠাকুর্দা চোদ্দোপুরুষ চিরকাল ভাড়া বাড়িতে জীবন কাটিয়েছে। শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে এই ফ্ল্যাটের জন্য আমি জান লড়িয়ে দিই নি? কত টাকা আমি মাইনে পাই তুমি তো জানো।

—আমি সব জানি। সীমার স্বর ভারী।

—তাহলে মাঝে মাঝে এমন উটকো বায়না করো কেন? ফ্ল্যাট করার জন্য আমাকে একটু ধন্যবাদ অন্তত দিও। একটু অন্য ভাবে কথা বোলো।

—হুঁহ্। ভারী তো ফ্ল্যাট! সীমার ঠোঁট বেঁকে গেল, —শোনালে সাতশো দশ স্কোয়্যার ফিট, ঢোকার সময়ে ছ'শো হয়ে গেল।

—সে কি আমার দোষ? করপোরেশানে প্ল্যান নিয়ে ঝামেলা না হলে....

—তুমি বসে বসে তোমার গাওনা গাও। আমার অনেক কাজ আছে। সীমা মেয়ের হাত ধরে টানল, —তিতলি চলো, খাবে চলো।

সীমা মেয়েকে খাবার টেবিলে এনে বসাল। ছোট্ট টেবিল আর চারটে চেয়ারে ভরে আছে জায়গাটা, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তার মধ্যেই ফ্রিজটাকে যে কী করে বসানো হয়েছে!

ফ্রিজ থেকে মেয়ের মাছের ঝোল বার করে গরম করে আনল সীমা। রাতে মাছ খেতে চায় না মেয়ে, ভাতও না। ঝোলে রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করে খাওয়াতে হয়। মুরগি খেতে বেশি ভালবাসে মেয়ে, কিন্তু সে তো সপ্তাহে একদিন বরাদ্দ। অজান্তেই নিশ্বাসটা আবার ঘন হয়ে এল সীমার। তিতলিকে খাওয়াতে খাওয়াতে তাকাচ্ছে চতুর্দিকে। কান্না পায়, এই ফ্ল্যাটটাকে দেখে সত্যিই তার কান্না পায়। বছর ঘুরতে চলল, এখনও মেনে নিতে পারল না মন থেকে। মাত্র তো দুটো ঘর, তারও কী সাইজ! প্রোমোটার প্রথমে বলেছিল দুটোই নাকি দশ বাই বারো হবে, শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল আট বাই এগারো, দশ বাই দশ। বাথরুম রান্নাঘর, তাও যা একটু পদের। কিন্তু ঘরেই যদি দু পা হাঁটতে তিনটে ঠোক্কর লাগে, ভাল লাগে মানুষের! আর ওইটাই বা কী ড্রয়িং হল! সাত বাই আটের একটা খালি প্যাসেজ, সেখানে টিভি শোকেস বেতের চেয়ার মোড়া, একেবারে জবরজং দশা। কত স্বপ্ন ছিল ড্রয়িংরুম ছিমছাম সাজাবে, কিচ্ছু হল না। পুতুল, ফুলদানি, পেতলের শো-পিস সব ডাঁই করে রাখতে হয়েছে। বাড়ি যদি হলই নিজের, আরেকটু কেন মনোমতো হল না!

খেতে খেতে ঢুলছে তিতলি। মেয়েকে ঝাঁকি দিয়ে জাগাল সীমা। গরাস তুলে তুলে মেয়ের মুখে ঠাসছে। অপাঙ্গে দেখল দরজার কাছে রাখা কাগজের মোড়কটা নিয়ে শোওয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছে তাপস। নির্ঘাৎ আবার নিম কি তেঁতুল কি কাঁঠাল। কী যে বিদ্ঘুটে বনসাই এর শখ তাপসের! টবে টবে চার বাই আড়াই ব্যালকনিটা ভরিয়ে দিল!

চোখ বুজে বুজে খাওয়া শেষ করল মেয়ে। চোখ বুজে বুজেই আঁচাল। মেয়েকে পাঁজাকোলা করে এনে ঘরে শুইয়ে দিল সীমা। শান্তি। সারাদিন যা হুড়ুদ্দুম করে মেয়ে! পাড়ার নার্সারি থেকে ফিরল তো একবার এই ফ্ল্যাট,

একবার সেই ফ্ল্যাট। একবার চারতলা তো একবার তিনতলা। মেয়েরই বা দোষ কী! এইটুকুন জায়গায় কি কোনও শিশুর মন আঁটে!

তাপস এখনও ব্যালকনিতে। খুটুর খুটুর করছে। টিভিটা খোলাই, চলছে নিজের মনে। পুরনো হিন্দি ফিল্ম শুরু হয়েছে একটা। দেব আনন্দের প্রেমপূজারী। কলেজ কেটে সিনেমাটা দেখেছিল সীমা. কী অপরূপ সিনসিনারি ছিল ছবিটায়। ওই টিভিতে সব দৃশ্যই এখন বিবর্ণ, সবই ম্যাড়মেড়ে।

সীমা ফট করে টিভিটা বন্ধ করে দিল।

তাপসের গলা শুনতে পাওয়া গেল, —টিভিটা অফ করলে কেন?

—দেখছেটা কে? শুধু শুধু চলার কী দরকার?

—গানগুলো শুনছিলাম।

শুধু গান শোনার ইচ্ছে হলে রেডিও কেনো, টেপ কেনো। সীমা আরেকটু গলা ওঠাল, —ও, তোমার তো আবার পয়সা নেই। তুমি তো এখন ফ্ল্যাট কিনেই ফতুর। ভাল ভাল। ওই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভিই তোমার রেডিও টেপ....

তাপস ব্যালকনি থেকে ফিরল। মাটি মাখা হাত। আহত চোখে দেখছে সীমাকে, — তোমার মাঝে মাঝে কী হয়, অ্যাঁ? হঠাৎ হঠাৎ ফোঁস! পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া!

—আমি তো এরকমই। ঝগড়ুটে লোভী বে আক্কেলে....

—উঁহু, তুমি মোটেই তা নও। আর নও বলেই তো আমার অবাক লাগে। তাপস বেসিনে হাত ধুতে ধুতে হাসছে, —তোমার মাথায় কি এক একদিন ভূত ঢোকে সীমা? নাকি কোনও পোকা....?

সীমা জবাব দিল না। ঘরে এসে ঘুমন্ত মেয়ের মাথার কাছে বসেছে। বসেই আছে। চৈত্রের দমকা হাওয়া থেকে থেকে ঝাঁপ কাটছে ঘরে। মিঠে বাতাসে ক্রমে জুড়িয়ে এল মন। সত্যি, এক একদিন কী যে হয় তার! মাথাটা কিছুতেই বশে থাকে না। আজ সন্ধেতেই বা হল কেন এমনটা? রঙ-কোম্পানির বিজ্ঞাপনটাই কি....? ওই বিজ্ঞাপন তো রোজই দেখে, দশ বাব বিশ বার করে দেখে....। হয়তো একই দৃশ্য প্রতিদিন মনের ওপর একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কবে না, আবার অতি নিরীহ ছবিও হঠাৎ কোনও ক্ষণে স্ফুলিঙ্গ হয়ে বাসনার বারুদগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে সত্যিই কি তাপসের কিছু করার আছে? মাত্র সাড়ে ছ'হাজারি এক আধা সরকারি কর্মচারী এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে চৌত্রিশ বছর বয়সে একটা ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছে, এই না ঢের।

তিতলি এপাশ ওপাশ করছে। মশা?

ছত্রিতে মশারির খুঁটগুলো টাঙিয়ে দিল সীমা। টেনে টেনে গুঁজে দিল বিছানায়। বেরিয়ে তাপসকে ডাকল, —খাবে এসো।

তাপস খবরের কাগজ উল্টোচ্ছে। ভার গলায় বলল, —পরে খাব।

—খেয়ে নাও না। সাড়ে নটা বাজে।

—যাই।

বলেও উঠছে না তাপস। আদ্যোপান্ত পড়া কাগজটায় চোখ গেঁথে বসে আছে। পড়ছে, নাকি সীমার ওপর অভিমান হয়েছে একটু?

সীমা টেবিলে খাবার সাজাল। শব্দ করে করে। ওই শব্দেই যেন সম্বে ফিরল তাপস। এসেছে টেবিলে। এখনও তার মুখেব ভাব যথেষ্ট গম্ভীর, যেচে কোনও কথা বলছে না। টুকটাক দু'একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলল সীমা, হুঁ হ্যাঁ কবে এড়িয়ে গেল তাপস।

সীমার হাসি পাচ্ছিল। তাপসটা এক্কেবারে ছেলেমানুষ। কোথায় মুখে হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে বউকে স্বচ্ছন্দ করে দেবে, তা নয়,....

খেয়ে উঠে রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজ সারল সীমা। শোয়ার ঘরে এসে দেখল কাগজে কী সব হিসেব কষছে তাপস। ডাকল না তাপসকে, ঢুকে পড়েছে মশারিতে। চোখ বুজল।

একটু তন্দ্রা তন্দ্রা মতো এসেছিল, তাপসের ছোঁয়ায় ঘোরটা কেটে গেল।

—কিছু বলছ?

—হুঁ?

—কী?

—রাগ পড়েছে?

সীমা ঘুরে চিত হয়ে শুল, —আমি তো রেগে নেই।

—তাহলে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ছ যে?

সীমা হাসল সামান্য, —এই বলার জন্য ডাকলে?

—না। ....বসে বসে একটা এস্টিমেট করলাম, বুঝলে। জুলাইয়ে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে তো, প্লাস একটা ছোট্ট এরিয়ারও পাব। সব মিলিয়ে তখন হাজার চারেকের মতো বেশি হাতে আসবে। ওই অ্যামাউন্টটা যদি ডাউন পেমেন্ট করে দিই....তাহলে পরের মাস থেকে যে করে হোক ইনস্টলমেন্টের টাকাটা....না হয় কটা বেশি ইনস্টলমেন্টই নেব, ছত্রিশ মাসের।

সীমার হৃদয়টা দ্রব হয়ে গেল। সে বড় অকারণ দোষারোপ করে মানুষকে। চোর ছ্যাঁচোড় নয়, উপরি রোজগারের জন্য ছোঁক ছোঁক করে না, নেহাত ডাইনে

আনতে বাঁয়ে কুলোয় না বলেই তো সাধআহ্লাদগুলোকে ছেঁটে ফেলতে চায় তাপস। সে কি বেশি চাপ সৃষ্টি করেছে? ভাবতে গিয়ে সীমা একটু মজাও পেল। তার চাপ আছে বলেই না জিনিসটার জন্য যেমন তেমন করে হোক উঠে পড়ে লাগতে চাইছে তাপস।

সীমা পল্‌কা স্বরে বলল, —এখন থাক। তোমার অসুবিধে হবে।

—নাহ্, এবার কিনেই ফেলব। তুমি সারাদিন একা একা থাকো, রঙিন টিভি এলে সে তোমার ভাল সঙ্গী হবে।

—উঁহু, এখন দরকার নেই।

—আছে আছে। মেয়েকে টপকে সীমার বালিশে চলে এল তাপস। নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এল দুজনে। টুকটাক কথা বলছে। সাংসারিক কথা, মেয়ের কথা, অফিসের কথা। দরকারি কথা। অদরকারি কথা।

এক সময়ে তাপস বলল, —জানো, অফিসে আজ অ্যাকাউন্টস্ অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এক দু'মাসের মধ্যে এল-টি-সিটা নিয়ে নিতে বলছে।

—কেন?

—নইলে নাকি টাকা ফেরত চলে যাবে।

—সে কী কথা! ফেরত দেবে কেন? চলো তাহলে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। একটা কোথাও ঘুরে এলে হয়।....এই প্রথম এল-টি-সি অ্যাভেল করার চান্স পেলাম, সুযোগটা বেমক্কা চলে যাবে!....কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?

—কত পাবে?

—হাজার কিলোমিটারের মতো ভাড়া দেবে ট্রেনের। সেকেন্ড ক্লাস। আর ধরো হোটেল খরচা ফরচা মিলিয়ে.... মনে মনে কয়েক সেকেন্ড যোগ করল তাপস, —সব মিলিয়ে হাজার তিনেক মতো দেবে।

—মাত্র?

—তিন হাজার টাকা কি কম?

একটুক্ষণ চুপ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল সীমা। অনেক দিন আগের একটা স্বপ্নকে মনে পড়ছিল তার। ছোটবেলাকার। ফিসফিস করে বলল, —কন্যাকুমারিকা যাওয়া যায় না?

—ওরেব্বাস! সে তো বিস্তর দূর। মিনিমাম চার পাঁচ হাজার কিলোমিটার হবে যাতায়াত।

—হোক না, জায়গাটা কী সুন্দর ভাবো! একদিকে বঙ্গোপসাগর, একদিকে

ভারত মহাসাগর, আরেক দিকে আরব সাগর। তিন সমুদ্রের জল একই পাড়ে এসে মিলছে। তারপর ধরো বিবেকানন্দ রক, যেখানে বসে স্বামীজি ধ্যান করেছিলেন....এই তো তিনতলার শুভম্‌রা পুজোর সময়ে ঘুরে এল....বলছিল তিন সমুদ্রের নাকি তিন রকম বালি, স্পষ্ট তফাত বোঝা যায়....তিন সমুদ্রের জলও নাকি আলাদা আলাদা....

—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু পাচ্ছি তো সাকুল্যে হাজার তিনেক। তিনজন ওদিকে যেতে গেলে কত পড়বে কিছু আন্দাজ আছে? মিনিমাম ছ'সাত হাজার।

—পড়ুক না। তবু ওটা একটা অক্ষয় স্মৃতি হয়ে থাকবে।

—কিন্তু এক্ষুনি অত টাকা পাব কোথায়?

—কারও কাছ থেকে লোন করে নাও। জুলাইয়ে এরিয়ার পাবে বলছ, তখন শোধ করে দিও।

—আর তোমার টিভি?

—সে পরে দেখা যাবে।

তাপস নীরব হয়ে গেল। একটু যেন শক্ত হয়ে গেছে শরীর। হঠাৎ বলে উঠল, —পুরী গেলে হয় না?

—পুরী!

—হ্যাঁ, পুরী। টাকাতেও খাপে খাপে কুলিয়ে যাবে, ভাল একটা হোটেলেও থাকা যাবে....

তাপসের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সীমা, —বেড়াতে যাওয়ার নাম হলে খালি পুরীর কথাই মনে পড়ে? হানিমুনে পুরী, তিতলি হওয়ার পর পুরী...

—তো কী আছে? নয় আরও একবার গেলে। পুরীতেও সুন্দর সমুদ্র আছে, সোনালি বালি আছে.....

—থাকুক। আগের বারও তুমি আমায় ওই সব ভুজুং ভাজুং দিয়েছিলে। এতগুলো পড়ে পাওয়া টাকা আসছে হাতে তাও কন্যাকুমারিকা যাওয়া হবে না?

অন্ধকার নৈঃশব্দ্যে ভরে রইল খানিকক্ষণ। চোখ খুলে অন্ধকারকে দেখছিল সীমা। অজান্তেই চোখের কোণে জ্বালা জ্বালা ভাব। খোলা জানলা দিয়ে একটা উটকো হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরে, মশারি দুলিয়ে ঘরের যন্ত্রবাতাসে মিলিয়ে গেল।

তাপস কথা বলছে। নিচু স্বরে।

—শুধু টাকার প্রবলেমই নয়, আমার ছুটির ব্যাপারও একটা আছে। অফিসে স্টাফ কম, বেশি দিন লিভ্ নেওয়া যাবে না। বড় জোর দিন সাতেক। এদিক

দিয়ে পুরীই কিন্তু সব থেকে আইডিয়াল।

— মোটেই না। সীমার স্বর ভিজে গেছে, —যাই যদি, তবে আমি অনেক দূর যাব। ওই কন্যাকুমারিকাই যাব। নইলে যাবই না।

—এটা তো জেদের কথা।

—উঁহু, এটা আমার অন্তরের কথা। ইচ্ছে।

ইচ্ছেগুলোকে একটু কাটছাঁট করা শেখো সীমা।

তাপসের স্বরে ঝাঁঝ নেই, দোষারোপ করা নেই, শুধু এক তীব্র আকুতি। চেষ্টা করেও সীমা রেগে উঠতে পারল না। কোনও প্রতিবাদও ফুটল না গলায়। এক চাপা বিষণ্ণতায় ভরে যাচ্ছে বুক। কাটছাঁট করা জীবনে কী থাকে!

মশারি তুলে খাট থেকে নামল সীমা। পায়ে পায়ে লাগোয়া ব্যালকনিতে। বনসাই-এর টবে টবে বোঝাই ব্যালকনি, দাঁড়ানোর ঠাঁই নেই। তাপস এসব নিয়েই পড়ে আছে বেশ। বাড়ি থাকলেই কী পরিচর্যার ধূম! শিকড় ছাঁটছে, ডালপালা ছাঁটছে, মাটি পরীক্ষা করছে, রোদ জলের মাপ বুঝে টব সরাচ্ছে, এদিক ওদিক। বৃক্ষের অতিকায় হওয়ার সম্ভাবনাকে ছোট্ট একটা মাপে বেঁধে বামন করে রাখার প্রয়াস। এক হাত বেড়ে বটগাছ ঝুরি নামিয়েছে, দেড়ফুটি নিম ডালপালা ছড়িয়েছে সাধ্যমতো, খর্বকায় নারকেলের মাথায় বেঁটে বেঁটে পাতা। দেখতে এত বিচ্ছিরি লাগে সীমার।

ভাবতে ভাবতেই সামনের একটা টবে হোঁচট খেয়েছে সীমা। উফ্ করে বসে পড়ল। কাতরাচ্ছে।

তাপস হুড়মুড়িয়ে ছুটে এল। ব্যালকনির আলো জ্বালিয়েছে, —কী হল?

সীমা কঁকিয়ে উঠল, —ওই তোমার সৃষ্টিছাড়া টব....মাগোঃ....বাগান করার ক্ষমতা নেই, টবে টবে....! তাও যদি একটাও গাছের মতো গাছ হত.....

—লাগল তোমার? কোথায়? তাপস থেবড়ে বসে পড়েছে।

সীমা পায়ের বুড়ো আঙুল চেপে ধরল, —থাক, তুমি আর দেখে কী করবে?

—আহা দেখি না। সীমার হাত জোর করে সরিয়ে শিউরে উঠল তাপস, —ইশ্, নখটা যে নীল হয়ে গেছে। ....দাঁড়াও দাঁড়াও। নড়ো না। বরফ নিয়ে আসি।

সীমা ঝুঁকে দেখল আঙুলটাকে। নখে অল্প নীল নীল ভাব হয়েছে বটে, তবে তেমন কিছু নয়। আঙুলটাকে মুড়ল আস্তে আস্তে, সোজা করল, টিপল নখটাকে। নাহ্, খুব একটা ব্যথাও লাগছে না।

ফ্রিজ থেকে বরফের ট্রেটাই নিয়ে চলে এসেছে তাপস। খট খট ঠুকে বরফ বার করল। ঘষছে সীমার পায়ে, —আলোটা জ্বালিয়ে বারান্দায় আসবে তো।

কী কাণ্ড ঘটালে বলো তো!

—কী করছ কী? ছাড়ো। বরফ দেওয়ার মতো কিচ্ছু হয় নি।

—অমন করে না সীমা। কালশিটে পড়ে গেলে নখটাই উঠে যাবে।

—গেলে যাবে। তোমার যত সব বিদ্‌ঘুটে কাণ্ডকারখানার জন্য আমাকে তো ভুগতেই হবে।

অপরাধী অপরাধী মুখে হাসছে তাপস। চোখের পাতায় উদ্বেগ তিরতির। উদ্বেগ, না মমতা? মমতা, না প্রেম?

উপুড় টবটাকে সোজা করছে তাপস। খর্বকায় গাছটার দিকে চোখ পড়তেই সীমা নিষ্পলক। দেড় ফুট কৃষ্ণচূড়াব ডালে ডালে ঝিরিঝিরি সবুজ পাতা। ক্ষুদি ক্ষুদি পাতার আড়ালে ফুটে আছে একটা ফুল। একটাই।

লাল। টুকটুকে লাল।

আপন সুখে বাড়তে না দেওয়া কাটাছাঁটা গাছেও এমন রক্তিম ফুল ফোটে!

ফোটে ফোটে। একটু তাকালেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

অথবা চোখ বুজলে।

সীমা চোখ বুজে ফেলল। তাপসের স্পর্শ হারিয়ে যাচ্ছে গভীরে, অনেক গভীরে।

মনে মনে সীমা বলল, —আমার সাদাকালো টিভিই ভাল। আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটই ভাল। আমার পুরীই ভাল। ইচ্ছের গাছ আকাঙ্খার বনসাই হয়েই থাকুক। ছোট্ট ফুল ফুটিয়ে। টুকটুকে লাল ফুল।

উনসত্তর আর তেষট্টি

হানিমুনে চলেছেন তপোধীর আর করুণা। ট্রেন ছাড়তে এখনও মিনিট দশেক বাকি, শেষ বারের মতো মালগুলো গুনে নিচ্ছেন তপোধীর। সুটকেস এক, প্লাস্টিকের থলি দুই, বালতিব্যাগ এক, ঢাউস কিটব্যাগ এক, কাঁধঝোলা ব্যাগ এক, টিফিন কেরিয়ার এক, ওয়াটারবটল্ এক। ওহো, ছোট বেডিংটাও তো আছে, ট্রেনের জন্য। মোট তবে হল গিয়ে নয়। সঙ্গের গন্ধমাদনটিকে ধরলে অবশ্য হয় দশ। হাঁটতে চলতে দিশা পায় না, ধপাধপ যেখানে সেখানে বসে পড়ে. কোথাও একবার দাঁড়িয়ে পড়লে নড়ায় কার সাধ্যি, এমন মেয়েমানুষ গন্ধমাদন ছাড়া আর কী! জানলার ধারে কেমন ঘটটি হয়ে বসে পড়েছে দ্যাখো! সাংসারিক নির্দেশ দেওয়া চলছে পুত্রবধূকে।

তপোধীর অধৈর্যভাবে বললেন, — পা'টা একটু তোলো তো। সুটকেসটা ভেতরে ঠেলি। একগাল জরদা পান মুখে অবহেলা ভরে তাকালেন করুণা, —তাড়া কোরো না তো। সব হবে। রন্টু সব ঠিক করে দেবে।

—আমার তাড়া আছে। পা সরাও।

—আহ্, চুপ করে একটু বোসো তো। কাজের কথা সেবে নিতে দাও।

কাজের কথা, না গুষ্টির পিণ্ডি। তপোধীর উবু হয়ে বসে পড়লেন। ঠেলে ঠেলে বালতি ব্যাগ ঢোকাচ্ছেন বার্থের নীচে। সাত দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া, তার জন্য মালও কিছু নিয়েছেন বটে করুণা! নিয়েই দায় শেষ। এখন ম্যাও সামলাবে এই বুড়ো চাকর। তপোধীর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এবাব টানলেন সুটকেসটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে রন্টু, —ওটা ওখানে থাক বাবা। মা পা রাখবে।

---তারপর রাতে কেউ নিয়ে নেমে গেলে কী হবে? তোমার মার ঘুম ভাঙবে?
—ব্যস্ত হতে হবে না। চেন দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি। চাবিটা শুধু কাছে ঠিক করে রাখো, তা হলেই হবে।

তপোধীর সোজা হলেন অগত্যা। গিন্নির কাছে হেরে যাওয়া মুখে বসেছেন এক কোণে। মরুক গে যাক, যে যা খুশি করুক। এখন তিনি এদের হাতের পুতুল। যেমন ইচ্ছে নাচাচ্ছে। কথা নেই, বার্তা নেই, হুট করে দুখানা টিকিট এনে হাতে ধরিয়ে দিল। তোমাদেব দুজনেব তো এক সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয় না বাবা, যাও একবাব জোড়ে সমুদ্র ঘুরে এসো। আর এই বইল হোটেলের রিজাবভেশন, সাত দিনে একটু চাঙ্গা হয়ে এসো তো দেখি। প্ল্যানটা অবশ্য রন্টুর একার নয়, এর পিছনে মেয়ে জামাইয়েরও ষড়যন্ত্র আছে। ভালমানুষ মুখ রুন্টুর বউটিও কম যায় না। আর ওই যে রিন্টির মেয়ে বাবলি, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চুকুর চুকুর করে কোল্ড ড্রিঙ্কস্ খাচ্ছে, সে বেটিরও সেদিন কী উল্লাস! ইইহ্, কী থ্রিলিং! দাদু দিদা হানিমুনে যাচ্ছে! ভূভারতে কেউ শুনেছে বাবা মার বিবাহবার্ষিকীর দিন এই সব মতলব ভাঁজে ছেলেমেয়েরা! ট্রেনের টিকিট, হোটেলের বুকিং উপহার দিয়ে বাবা মার বিয়ের চল্লিশ বছর পালন করে! ফাজলামি!

কামরার জানলায় অরুণাংশু। জামাই। ছেলেরই সমবয়সী, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ক্লাসমেট ছিল, তখনই রিন্টিকে গেঁথেছে। হাইপাওয়ারের চশমার আড়ালে ছোকরার চোখ হাসছে ফিক ফিক, —বাবা, চা খাবেন?

তপোধীরের তেমন কোনও নেশা নেই, তবু চায়ের নাম শুনলেই জিভ যেন একটু শুলিয়ে ওঠে। বললেন, —লিকার চা হবে?

রন্টুর বউ ফুট কাটল, —এখানে লিকার চা কোথায় পাবেন বাবা? —থাক তা হলে। দুধ চা আমার....। তোমার শাশুড়িকে দাও বরং। —আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিয়েছি। নেশার জিনিস বলে কথা। সন্তর্পণে পিক ফেললেন করুণা, —ট্রেন ছাড়লে একটু কফি খাব।

ধন্যি মেয়েমানুষ! কত যে নেশা! চা কফি পান জরদা মৌরি সুপুরি জোয়ান....। দাঁত মাজার সময়ে আবার গুড়াখু চাই। সুযোগ পেলে বোধহয় বিড়ি সিগারেট নস্যিটাও ধরে ফেলতেন।

সিগন্যাল হয়ে গেছে। বউয়ের ইশারায় রন্টু নেমে গেল কামরা থেকে। সামনের স্টল থেকে ম্যাগাজিন হাতে দৌড়ে এল রিন্টি। তপোধীরের হাতে পৌঁছনোর আগে করুণা খপ্ করে নিয়ে নিলেন পত্রিকাটি। এক গাল হাসিতে মুখ ভরে গেল, —ওমা, এ যে দেখি শচীনের ছবি।

তপোধীর সরু চোখে তাকালেন, —তুমি আবার শচীনকে কবে থেকে চিনলে?

—আমি সব্বাইকে চিনি। শচীন আজাব মোঙ্গিযা শ্রীনাথ... তারপর আমাদের ওই ছেলেটা... সৌরভ গো। আহা, কী মিষ্টি মুখখানা।

—এই করেই তো দেশের ক্রিকেটটা ডুবল। যত মূর্খের দল এখন খেলার সমঝদার হয়েছে। তপোধীর ভেংচে উঠলেন, —আহা, কী মিষ্টি মুখখানা! হ্যাহ্।

—অ্যাই, মূর্খ মূর্খ করবে না তো। মেয়েরা কি খেলা বোঝে না? গালি থার্ডম্যান মিডন মিডঅফ সব নাম আমি জানি। এই তো সেদিন রাহুল স্লিপে কী সুন্দর একটা ক্যাচ ধরল....

—থাক, নাতি নাতনির মুখের ঝাল খেয়ে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না।

ট্রেন দুলে উঠল। বিন্টি জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে ছুঁল মাকে, —সাবধানে যেও। দুজনে যেন সারাক্ষণ লড়াই কোরো না।

—আমাকে বলছিস কেন? তোর বাবাকে বলে দে।

—বাবা, তুমি কিন্তু একদম মাথা গরম করবে না।

তপোধীর জবাব দিলেন না। প্ল্যাটফর্ম সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সরে যাচ্ছে কোলাহল। সরে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ জামাই নাতনি। হাত নাড়ছে। রন্টুর গলা উড়ে এল, — কেসটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেল রে। পুরীর সি-বিচে না দুটো লাশ পড়ে থাকে! স্কন্ধ কাটা!

তপোধীর গুম হয়ে গেলেন। সবই যখন জানা, তখন জোর করে পাঠানোর কী দরকার ছিল? কেন যে টিকিট দুটো কুচিয়ে ফেলেননি তপোধীর!

ট্রেন কারশেড পেরোল, এগোচ্ছে ঘটাং ঘটাং। এখনও শহরের আলো ঘিরে আছে ট্রেনটাকে। তপোধীরের কুপের মাঝবয়সী লোকটি লুঙ্গি তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে এগোল। সামনের তিন যুবক, সম্ভবত সেলসে চাকরি করে, উচ্চৈস্বরে গল্প জুড়েছে। উল্টোদিকের দুই জানলায় দুই ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনী ভাবলেশহীন মুখে বাইরে তাকিয়ে। সব প্যাসেঞ্জার এখনও থিতু হয়নি, অনেকেই ঘুরছে এদিক ওদিক। পাশের কুপে দুটো বাচ্চা কাঁউমাউ করে ঝগড়া করছে। যে দঙ্গলটা একটু আগেও এ জায়গাটা বোঝাই করে রেখেছিল, বোধহয় তাদেরই কেউ। অসহ্য।

করুণা হাতের ম্যাগাজিন তপোধীরের কোলে ফেলে দিলেন। ছোট্ট একটা হাই তুলে বললেন, সকালে কটায় ঠিক আমরা পৌঁছব গো?

তপোধীর বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন, —আমি ট্রেনের টাইম টেবিল নই। বলতে পারব না।

--সে তো জানিই। তুমি হলে গিয়ে খাওয়ার টাইম টেবিল। সাড়ে সাতটায় এই চাই, নটায় এই চাই, সওয়া বারোটায় এই চাই....

—দাও কেন? না দিলেই পারো।

—ওখানে গিয়ে দেব না। তোমার ওই পৌনে চারটের মুসুম্বি, সওয়া পাঁচটার ছানা, ওসব তুমি নিজে জোগাড় করবে।

—ভয় দেখাচ্ছ?

—না, বলে দিচ্ছি। বেড়াতে গিয়ে আমাকে দিয়ে খিদমত খাটাবে, ওটি হবে না।

—তা হলে করবে কী সারা দিন? ভোঁস ভোঁস নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে?

—মোটেই না। ঘুরব, ফিরব, সকাল বিকেল প্রাণ ভরে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করব। ছেলেমেয়ের দয়ায় সুযোগটা যখন এসেই গেল....

একেই বলে নেমকহারাম। বিয়ের সময়ে ক'টাকাই বা মাইনে ছিল তপোধীরের যে বছর বছর বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন! করতেন তো কলেজের মাস্টারি, সাকুল্যে পেতেন দেড়শো টাকা, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যেত। তারপর যখন মাইনে টাইনে বাড়ল, তখন ছেলে মেয়ের পড়াশুনো নিয়ে হিমশিম দশা। তার মধ্যেও কি বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরোননি দু-চারবার? এই পুরীতেই তো গিয়েছিলেন। বছর কুড়ি আগে। কপাল খারাপ, পৌঁছেই রিন্টির ধুম জ্বর। কোথাও বেরনো হল না, সমুদ্রে নামা হল না, শুধু হোটেল আর ডাক্তারখানা। তাও মেয়ের জ্বর কমার পর একদিন সবাইকে নিয়ে কন্ডাক্টেড টুরে বেরিয়েছিলেন তপোধীর। কোনারক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নন্দন কানন। ফেরার দিন সকালে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়াও হয়েছিল করুণার। সে সব কথা কি করুণা ভুলে গেছেন!

তপোধীরের ঈষৎ অভিমান হল। ভার গলায় বললেন, —হ্যাঁ, ছেলেমেয়েই তো তোমায় ঘোরাচ্ছে জীবনভর।

—ঘোরাচ্ছেই তো। মেয়েজামাই নিয়ে গেল বলে তবু কেদার-বদরি দর্শন হল। ছেলের কল্যাণে তিরুপতি কন্যাকুমারিকা।

—তার আগে তো জীবনভর তুমি ঘরেই বন্দি থেকেছ!

—ছিলামই তো। ধম্মের মধ্যে কম্মো, একবার পুরী, একবার দার্জিলিং, আর একবার সিমলা। তারপর থেকে তো শুধু ঘাটশিলা আর শিমুলতলা, শিমুলতলা আর ঘাটশিলা।

—তুমি একটি এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। রিটায়ারমেন্টের আগে এই পুরী যাওয়ার জন্য তোমাকে দুবার সেধেছিলাম আমি। টোয়াইস্। মনে পড়ে?

—হবে হয়তো। করুণা অবলীলায় এক টিপ জরদা ছুড়লেন মুখে, —আমার শুধু মনে পড়ে তোমার সঙ্গে একবার জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে আমার খুব শিক্ষা হয়েছিল। গরুর মতো হেট হেট করতে করতে মন্দিরে ঢোকালে, আর পাঁচন বাড়ি দিতে দিতে বার করলে।

—সে তো ফেরার ট্রেনের তাড়া ছিল বলে। চটপট বলে উঠলেন তপোধীর।

— ট্রেন কিন্তু ছিল সন্ধেবেলা।

তপোধীর অপ্রতিভ মুখে হাসলেন একটু, — সেই কথা এখনও মনে পুষে রেখেছ!

করুণার গাল ফুলল, — আমার সব মনে থাকে। কিছু ভুলি না।

তপোধীর চুপ মেরে গেলেন। আড়চোখে একবার সহযাত্রীদের দেখলেন, একবার স্ত্রীকে। ওই গোলগাল ফরসা মুখ, পুতুল পুতুল চোখের মহিলাটিকে চল্লিশ বছরেও ঠিক চেনা গেল না। কত দরকারি কথা অনায়াসে ভুলে যায়, অথচ বিশ বছর আগের তুচ্ছ স্মৃতিও যত্ন করে সাজিয়ে রাখে মনে। কেন যে এমন হয়!

শহরতলি পার হয়ে ট্রেনের গতি বেড়েছে। দুদিকে এখন জমজমাট অন্ধকার, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট আলোর ফুটকি। মাঝবয়সী লোকটি লুঙ্গি শোভিত উঠে পড়েছে উপরের বার্থে, এখন শোওয়ার তোড়জোড় করছে। দুই সন্ন্যাসিনীও শোওয়ার সিট জোড়া লাগিয়ে নিয়েছে, মুখোমুখি বসে কথা বলছে। তিন যুবকের একজন তপোধীরের পাশে এসে বসল, হাঁটুতে ব্রিফকেস রেখে তিন সঙ্গী তোড়জোড় করছে তাস খেলার। তপোধীর একটু সরে এলেন করুণার দিকে। শেষ ফাগুনের বাতাস হু হু ঢুকছে জানলা দিয়ে। ঠাণ্ডা হাওয়া, তবে কামড় নেই। ভারী নরম, মিঠে।

কফিওলা এসে গেল। হেঁকে হেঁকে কানের পোকা নাড়িয়ে দিচ্ছে। তপোধীর গলাতে চাইলেন করুণাকে, —কফি খাবে না?

করুণার চোখ জানলার বাইরে। ঘুরলেন। গুমগুমে স্বরে বললেন, —থাক।

—থাকবে কেন? খাও না। বলেই কফিওলার দিকে অর্ডার ছুড়েছেন তপোধীর, —দুটো কফি দাও দিকি। একটাতে দুধ একটু কম।

—দুধ তো আমাদের মেশানোই থাকে দাদু।

—ঠিক আছে, তবে তাই দাও।

—তুমি এখন কফি খাবে নাকি? করুণার ভুরু কপালে জড়ো, —তোমার-না কফি খেলে রাত্তিরে ঘুম হয় না!

—একদিন, কিছু হবে না।

—না। এর পর কাল সকাল থেকেই তো বুক জ্বালা অম্বল এসব শুরু হবে।

—সকালের ভাবনা সকালে। কাগজের গ্লাস করুণার দিকে এগিয়ে দিলেন তপোধীর। নিজেরটাও নিলেন। চুমুক দিচ্ছেন। একটু ঝুঁকলেন স্ত্রীর দিকে। যুবকদের কান বাঁচিয়ে নিচু গলায় বললেন, —একটা রাত নয় নাই ঘুমোলাম।

—হঠাৎ এমন বদ খেয়াল?

—আমাদের তো আর আগে হানিমুন হয়নি। ছেলেমেয়েরা যখন পাঠালই, তখন নয় আজ রাত থেকেই...

—ন্যাকামো। সকালবেলা যদি বলো ঘুম হয়নি বলে পেটে গ্যাস হয়েছে, তখন কিন্তু আমি তোমার ধুধধুড়ি নেড়ে দেব।

কফির গ্লাস বাইরে হাওয়ায় ছুড়ে দিলেন তপোধীর। দুহাতের বুড়ো আঙুল দেখালেন স্ত্রীকে, —আমার কাঁচকলা হবে। গিয়েই একটা এমন সমুদ্রে স্নান করব, শরীরটা তর হয়ে যাবে।

—সে কী! তুমি সমুদ্রে নামবে নাকি!

—তা হলে আর পুরী যাওয়া কিসের জন্য! আবার গলা নামালেন তপোধীর, — কেন, তুমি নামবে না?

—মরে গেলেও না। করুণাও ফিসফিস করছেন, —জলে নামলে কাপড়চোপড় ঠিক থাকে না.... মনে নেই সেবার দিঘায় গিয়ে কী অবস্থা! বাবলি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল....

—ও, এই কথা। তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কী হবে?

—আমার সব খেয়াল থাকে। তোমার জন্য একটা এক্সট্রা আন্ডারওয়ার এনেছি।

—আমি আন্ডারওয়্যার পরে সমুদ্রে নামব! বিস্ময়ে কথাগুলো ঠিকরে এল করুণার গলা থেকে, —তোমার কি ভীমরতি ধরেছে?

তিন যুবক তাস খেলতে খেলতে টেরচা চোখে তাকাচ্ছে। মুখ টিপে হাসছেও যেন। তপোধীরের লোমঅলা বড় বড় কান লাল হয়ে গেল। মিনমিনে, কিন্তু মরিয়া স্বরে বললেন, —অসুবিধের কী আছে। শাড়ি সায়ার নীচে পরবে।

—ছিঃ।

—অতই যদি লজ্জা, তবে কারুর একটা সালোয়ার কামিজ আনলে না কেন?

—চুপ করো তো। পাগলের মতো কথা বোলো না। করুণা কাঁধের ওপর আঁচল গুছিয়ে নিলেন, —তোমাকেও জলে নামতে হবে না।

- কেন?

--প্রেশারের রুগি, সমুদ্রে নামবে কী?

—কালকেই আমি প্রেশার চেক করিয়ে এসেছি। ওষুধও আছে সঙ্গে।

—থাকুক। রন্টু আমাকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছে, বাবা যেন নুনজলে না নামে।

—বললেই হল। রন্টু কি আমার গার্জেন? তপোধীরের গলায় ঝাঁঝ ফিরে এল।

-দেখাশুনো যখন করে, তখন গার্জেন তো বটে।

—এই করে করে তো ছেলেকে মাথায় তুলেছ। বাপকে আর কেয়ার করে না।

—অমান্যিটা কী করেছে?

—করেনি! ওইটুকু ছেলেকে পই পই করে হস্টেলে পাঠাতে বারণ করলাম...। হস্টেলে না পাঠালে কি ছেলে মানুষ হয় না?

—তা ওদের ছেলে, ওরা যা খুশি তাই করেছে। তোমার কী?

—আমার শরীর নিয়েও আমি যা খুশি করব। জলে নামব।

—নেমে দেখো। আমি পরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাব।

অসহায় ক্ষোভে দাঁত কিড়মিড় করলেন তপোধীর। করুণা সব পারেন। বপুতেই শুধু গন্ধমাদন নয়, তাঁর মতটিও নড়ানো বড় কঠিন কাজ। এক সময়ে, তখন রিন্টি কোলে, রন্টু বছর চারেকের, খুব ব্রিজ খেলার নেশা হয়েছিল তপোধীরের। কলেজ থেকে চলে যেতেন তাসের আড্ডায়, ফিরতেন সেই সাড়ে দশটা এগারোটায়। করুণা খুব রাগারাগি করতেন, বাপের বাড়ি চলে যাবেন বলে ভয় দেখাতেন। তপোধীর আমল দেননি। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরে দেখলেন ঘর শুনশান, ছেলেমেয়ে নিয়ে সত্যি সত্যি কোন্নগর চলে গেছেন করুণা। পাঁচ সাতদিন মাথা ঘামাননি তপোধীর, হাত পুড়িয়ে রেঁধে বেড়ে কলেজ করেছেন। তারপর এক সময়ে টনক নড়ল। কোন্নগরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আরও বিপত্তি। করুণার এক গোঁ। ছেলেমেয়ের মাথায় হাত রেখে দিব্যি গালতে হবে আর কখনও তাস ছোঁবেন না তপোধীর, তবেই ফিরবেন করুণা। তপোধীরকেই হার মানতে হয়েছিল সেবার। সে নিয়ে অবশ্য এখন আর কোনও খেদ নেই তপোধীরের, তাস ছেড়ে ছেলেমেয়ের পিছনে সময় ব্যয় করা আখেরে ভালই ফল দিয়েছে। দুজনেই কৃতী হয়েছে লেখাপড়ায়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে তপোধীরের। বাপ মাকে যথেষ্ট মান্যিগন্যিই করে ছেলে মেয়ে।

তবে এই মুহূর্তে সে কথা স্মরণে আনতে রাজি নন তপোধীর। গাল ঝুলিয়ে বসে আছেন। প্রচণ্ড গতিতে একটা ছোট্ট ব্রিজ টপকে গেল ট্রেন। জানলার দিকে তাকালেন না তপোধীর।

করুণা হাঁটু চেপে উঠে দাঁড়ালেন। বাথরুমে যাচ্ছেন। দুই সন্ন্যাসিনীর মাঝে কোথ্থেকে এসে বসেছে এক দাড়িওলা সাধু, ঝালমুড়ি খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। টিটিকে কাছে আসতে দেখে শুট করে উঠে দাঁড়াল, গেরুয়া সামলে কেটে পড়ছে দরজার দিকে। তিন যুবক ডুবে আছে রামিতে, কাগজে হিসেব লিখছে বার বার।

খেলার পত্রিকাটা উলটোলেন তপোধীর। অসংলগ্নভাবে। দু-চারটে পাতা দেখে রেখে দিলেন ম্যাগাজিনটা।

করুণা ফিরে এসে বললেন, —ম্যাগোঃ, বাথরুম কী নোংরা।

তপোধীর উত্তর দিলেন না।

করুণা মুখ টিপে হাসলেন, —রাগ করো কেন? আমি যা বলি, ভালর জন্যই বলি।

তপোধীরের কথা বলার ইচ্ছে হল না। করুণা এক দৃষ্টে দেখছেন স্বামীকে — ঠিক আছে বাবা, নেমো সমুদ্রে। বেশিক্ষণ থেকো না।

—আর তুমি? তপোধীরের ঘাড় শক্ত।

—গিয়ে দেখা যাবেখন। করুণার হাসি ছড়িয়ে গেল, —এবার টিফিন কেরিয়ারটা পেড়ে দাও দিকি। নটা বাজে, খাওয়াটা আগে সেরে নাও।

তপোধীরের রাগ নিবে এল। নিঃশব্দে উঠে চার থাকের কৌটোখানা নামালেন,

—মেনু কী?

—তোমার জন্য মালাই চমচম আছে। নরম পাকের সন্দেশও। তোমার মেয়ে এনেছিল।

—বউমা দুপুরে আলুর দম বানাচ্ছিল না! গন্ধ পাচ্ছিলাম!

—আছে গো আছে। তোমার আলুর দমও আছে। দু পিস মাছভাজাও।

—তুমি মাছভাজা ভালোবাসো, ও দুটো তুমিই খাও। আমাকে খালি লুচি আলুর দম দিলেই হবে।

—লুচি কোথায় পাব?

—পাবে মানে! রিন্টি আর বউমা যে তখন লুচি ভাজছিল!

—সে তো ওদের জন্য। আমাদের জন্য ওরা নরম করে রুটি বানিয়ে দিয়েছে।

লুচি দেয়নি! তপোধীর প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

—অমন করো কেন? তোমার না ভাজাভুজি খাওয়া বারণ। ঠাণ্ডা লুচি খেলে তুমি হজম করতে পারতে? টিফিন কৌটোর ঢাকনা খুললেন করুণা,

—বউমা দিতে চেয়েছিল, আমিই বারণ করেছি।

তপোধীর রাগ করতেও ভুলে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন,

—শিরে হইল সর্পাঘাত, তাগা বান্ধি কোথা! বউই যদি শত্রু হয়....। দুধ নেই, কিছু নেই, আমি রুটি চিবোতে পারব না।

—তোমার জন্য সেই আচারটা এনেছি গো। করুণা যেন শিশুকে ভোলাচ্ছেন, — সেই যে গো মিক্সড পিক্‌ল্। তুমি ভালবাসো বলে সেলস্ গার্লের কাছ থেকে কিনেছিলাম।

ট্রেনের গতি কমছে। খড়্গপুর এসে গেল। ভেন্ডাররা জানলায় খাবার হাঁকছে। ছেলে তিনটে তাস বন্ধ করে পুরি তরকারির হুকুম ছুড়ল। ওপরের বার্থের লোকটা তরতরিয়ে নেমে চলে গেল প্ল্যাটফর্মে। দুই সন্ন্যাসিনী উদাসীন স্বরে ডিমওলাকে ডাকছে।

তপোধীরও উঠে জানলায় গেলেন, —অ্যাই আমাকে দুটো বয়েলড এগ দাও তো।

টিফিন কেরিয়ার পাশে রেখে বাবু হয়ে বসেছেন করুণা। ঝুলি থেকে প্লেট বার করেছেন, গ্লাস বার করেছেন, আলুর দম তুলছেন চামচ দিয়ে। অবাক মুখে বললেন,

—তুমি এখন ডিম খাবে?

—খাব। অ্যাই, দুটো ডিমের দাম কত?

—আমি কিন্তু খাব না।

— খেয়ো না। আমি একাই খাব।

—আর সারা রাত বেলুনের মতো ফুলব! করুণার চোখ থমথমে, —নুন ছাড়া খাবে কিন্তু।

—সব ব্যাপারে হুকুম ফলাবে না। আমি দুটোই খাব। উইথ স'ল্ট।

কচকচ ডিমসেদ্ধ চিবোচ্ছেন তপোধীর। নুন মাখিয়ে। করুণাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন করুণা, সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর।

ট্রেন ছাড়ল। তিন যুবক খাওয়া সেরে মৌজ করে সিগারেট ধরিয়েছে, ধোঁয়া পাক খাচ্ছে কুপে। মাঝবয়সী লোকটা আধ ডজন কলা হাতে পাকা মাদারির মতো টঙে উঠে গেল। ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনীরাও রাতঘুমের নিবাসক্ত

তোড়জোড় চালাচ্ছে। বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব বেড়েছে সামান্য। এমন কিছু বেশি নয়।

বাথরুম সেরে ধুতি বদলে লুঙ্গি পরে এলেন তপোধীর। করুণা ইতিমধ্যেই তিন যুবকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছেন, তাদের হাঁড়ির খবর বার করছেন টেনে টেনে।

তপোধীর গিন্নির মেজাজটা পড়ার চেষ্টা করলেন। একটু খোশামোদের সুরে বললেন, — তোমার চাদর বার করে দিই?

করুণা শুনেও শুনলেন না।

তপোধীর আবার বললেন, —সুতির চাদরটা বার করব?

—না।

—বাপস্ কী তেজ গলায়! তপোধীর মুখ হাসি হাসি রাখারই চেষ্টা করলেন, —জানলাটা বন্ধ করে দাও না।

—কেন?

—কেন আবার কী? তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

—জানলা বন্ধ করলে আমার গরম লাগবে।

এরই নাম বাতিক। ইনি আবার অন্যের পিছনে লাগেন! তপোধীর গার্জেনের গলায় বললেন, —রাতের ট্রেনে কারুর গরম লাগে না।

—আমার লাগে।

—শুনলে পাগলেও হাসবে। স্ত্রীকে টপকে ঝুপ করে কাচ নামিয়ে দিলেন তপোধীর। দুটো জানলারই। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, —একটু গরম লাগুক। কদিন আগেই গলা ব্যথা হয়েছিল, সে খেয়াল আছে?

করুণা বিশেষ পাত্তা দিলেন না, আবার গল্প জুড়েছেন সামনের ছেলেটির সঙ্গে। ভাঁজ করা ধুতি কিটব্যাগের ওপর রেখে পাশের চেন খুললেন তপোধীর। হাতড়াচ্ছেন, —আমার প্রেশারের বড়িগুলো গেল কোথায়?

—যেখানে রেখেছিলে সেখানেই আছে। করুণার উদাস জবাব।

—সেখানে নেই।

—তা হলে ওখানে রাখোনি।

—বললেই হল! আমি নিজে হাতে কিট ব্যাগে তুলেছি।

—এটা তা হলে কী? কোলের হ্যান্ডব্যাগ থেকে ওষুধের পাতা বার করলেন করুণা।

—লুকিয়ে রেখেছিলে!

—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার ওষুধ লুকোব! টেবিলে

ফেলে এসেছিলে, আমি মনে করে নিয়ে নিয়েছি। বলতে বলতে ছেলে তিনটেকে সালিশি মানছেন করুণা, —দেখেছ তো, কী বেখেয়ালি মানুষ নিয়ে আমার ঘর করা?

তোলো হাঁড়ির মতো মুখ করে ট্যাবলেট গিললেন তপোধীর। ঢকঢক খানিকটা জল খেলেন। বেডিং খুলতে গিয়ে কী যেন মনে পড়ে গেল। হঠাৎই থামলেন, —তোমার মালিশটা নিয়েছ?

—আমার তোমার মতো ভুলো মন নয়। বালতিব্যাগে আছে।

—বটেই তো, বটেই তো। খোলা কিট ব্যাগের পকেট থেকে একখানা টিউব বার করলেন তপোধীর। করুণার নাকের সামনে নাচাচ্ছেন, —এটা তা হলে কী?

খপ করে ওষুধটা কেড়ে নিলেন করুণা, নিজের হ্যান্ডব্যাগে পুরে ফেললেন, —ও, এটা তোমার কাজ! তাই আমি বেরনোর সময়ে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

—আমার কাজ নয়, তোমারই বেআক্কেলেপনা।

—কেউ যদি সরিয়ে রাখে কী করব?

—সরাইনি, মনে করে সঙ্গে নিয়েছি। বলেই ছেলে তিনটের দিকে ফিরলেন তপোধীর,

—দ্যাখো দ্যাখো, কী চিজ নিয়ে ঘর করি আমি।

মজা পেয়ে হাসছে তিন যুবক। হাসতে হাসতেই টপাটপ মাঝের বার্থ নামিয়ে ফেলল, ফুঁ দিয়ে দিয়ে বালিশ ফোলাচ্ছে, পেশাদারি ভঙ্গিতে আয়োজন করছে শোওয়ার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডান কাত ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজন।

তপোধীর বসে বসে হাই তুলছেন,—এবার তো আমাদেরও শুতে হয়।

—সারা রাত জাগবে বলেছিলে না? করুণার কণ্ঠে উপহাস।

—ঘুম পাচ্ছে যে।

—তবে শোও। দাঁড়াও, বিছানা করে দিই।

—এখানে কেন? আমি মাঝের বার্থে যাচ্ছি।

—উঁহু, ওটা এখন নামাবে না।

—কেন?

—কারণ আমি ঘুমোব না, তাই। ওটা নামালে আমার বসতে অসুবিধে হবে।

তপোধীর কথা বাড়ালেন না। বাধ্য ছেলের মতো নীচের বার্থেই শুয়ে পড়লেন। করুণাকে আলগা ছুঁয়ে।

তপোধীরের মাথার কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছেন করুণা, আনমনা চোখে

দেখছেন পৃথিবীটাকে। বন্ধ কাচের এপার থেকে।

রাত নিঝুম হয়ে এল। কামরায় জেগে আছে নীলচে রাতবাতিরা, জেগে আছেন করুণা। স্বপ্ন স্বপ্ন বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে এ কুপে সে কুপে। আঁধার ছিঁড়ে ছুটছে রেলগাড়ি, ঝমঝম ঝমাঝম। থামছে, ছুটছে, থামছে, ছুটছে। পার হচ্ছে নদী, পার হচ্ছে প্রান্তর, পার হচ্ছে একটার পর একটা সেতু।

গভীর রাতে তপোধীরের ঘুম ভেঙে গেল। করুণা ঠেলছেন জোরে জোরে,

—অ্যাই শুনছ?

—উঁ?

—বাপ্, কী ঘুম রে! কামরা যে একেবারে মাত করে দিলে। পাশ ফিরে শোও।

ঘুম চটকে গেল। চোখ বড় করে উঠে বসলেন তপোধীর,

—চিল্লাচ্ছ কেন? হলটা কী?

—সিংহের মতো নাক ডাকাচ্ছ কেন?

—তোমার তাতে কী?

—আমার ঘুম আসছে না। ট্রেনে আমার ঘুম আসবে না।

—শুলেই আসত। বললাম ওপরে উঠে যাচ্ছি।

—না। ওপরে উঠলে তোমাকে আর ঠেলা যাবে না। অভ্যেস তো জানি, না ডাকলে তোমার গর্জন থামে না।

—সঙ্গে একটা পাখা আনলে পারতে। ডাঁটি দিয়ে খোঁচাতে মনের সুখে।

—তাই উচিত ছিল। কী লোকের সঙ্গেই না বেড়াতে বেরিয়েছি। কুম্ভকর্ণ একটা।

করুণার যেন গলা কাঁপল একটু! তপোধীর অপাঙ্গে তাকালেন। হঠাৎ কোথ্থেকে এক ঝলক বাতাস এসে ঝাপটা মারে ঊনসত্তর বছরের মনটায়। বাতাসটা এত বেশি দূরের, যে চিনেও চিনতে পারলেন না তপোধীর।

এবার একটা নদী পার হচ্ছে রাতের গাড়ি। ধীরে, অতি ধীরে। বৈতরণী নদী। এ নদী পার হলে নাকি এ পারের টান কমে যায়।

তপোধীর চুপটি করে বসে আছেন। করুণাও নীরব। বয়ে যাচ্ছে এক মৌন মুহূর্ত।

এক সময়ে তপোধীর ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, —ওয়াটার বটলটা দাও তো।

করুণা জানলার কাছে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, নিজে উঠে নাও।

মুহূর্ত মিলিয়ে গেল। তপোধীর অসহিষ্ণু হলেন, নিয়ম মতোই। বললেন,

– তোমার সামনে ঝুলছে বলেই বলা। থাক্, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে নয় মরেই যাব।

—কী কথার ছিরি! হাত বাড়িয়ে জলের বোতল পাড়লেন করুণা,

—সবটা শেষ কোরো না। আমিও খাব।

এক ঢোক খেয়েই প্লাস্টিকের বোতল এগিয়ে দিলেন তপোধীর,

—খাও, নিজে আগে প্রাণ ভরে খাও।

—ইঁইহ, মেজাজে একেবারে চাঁদি ফাটে দেখি।

উত্তরে কিছু একটা বললেন তপোধীর। তার উত্তরে করুণা। তার উত্তরে তপোধীর। চলছে, কলহ চলছে। বিনবিন ঝগড়া বন্ধ কাচ ফুঁড়ে চলে গেল বাইরে। নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে।

রাত এখন বড় মায়াময়। চাঁদের বুড়ি রুপোলি সুতো কেটে চলেছে চরকায়। সেই সুতোয় বোনা মসলিন এখন ভাসছে চরাচরে। রুপোলি সর মেখে ছুটছে অলৌকিক গাছপালা, ছুটছে মাঠ, ছুটছে নদী, ছুটছে বালির চর।

বৃদ্ধ পৃথিবী ছুটছে সমুদ্রের পানে। জ্যোৎস্না মেখে। জ্যোৎস্না হয়ে। সেই জ্যোৎস্নায় একাকার হয়ে গেল কলহরাজি। জ্যোৎস্না চলেছে সমুদ্রের পানে। বড় বাঙ্ময় জ্যোৎস্না। হানিমুনে চলেছেন ঊনসত্তর আর তেষট্টি। তপোধীর আর করুণা।

প্রতীক্ষালয়

বাথরুম থেকে ফিরে দাঁতের পাটিদুটো আর খুঁজে পেলেন না উমানাথ। আশ্চর্য! খানিক আগেও চা বিস্কুট খাওয়ার সময় খুলে রেখেছিলেন টেবিলে। বিস্কুটের ডেলা দাঁতের খাঁজে বড় বেমক্কা জড়িয়ে যায়। লম্বাটে শরীর সামনে ঝুঁকে পড়ল। প্রাচীন কপালে আরও কিছু গলিঘুঁজি। গেল কোথায়? রাতে ডাঁটিভাঙা কাপে পাটি জোড়া ভিজিয়ে রাখেন। সেখানে খুঁজলেন। নেই। ঘোলাটে জলে মরা পিঁপড়ে ভাসছে শুধু। বুকটা ছলছল করে উঠল। সময় নেই। আর এক মুহূর্ত সময় নেই। সকালের সূর্য রঙ্ পাল্টাতে শুরু করেছে। একটু পরেই এসে পড়বে ওরা।

ওদের খবর এবারও বড় দেরিতে এসেছে, মাত্র ঘন্টাখানেক আগে, ব্রেকফাস্টের টেবিলে। সেই থেকে দোতলার চারচারটে বাথরুমে অবিরাম লাইন। একবার ঢুকতে পারলে সহজে সেই ভাগ্যবান বেরোতে চায় না। যে যাকে পারছে টপকে চলেছে এলোপাথাড়ি। অঘোষিত সেই হার্ডল রেসে, লাস্ট বাট্ ওয়ান উমানাথ, বহু কষ্টে কোণার বাথরুমখানা খালি পেয়েছিলেন। অনেকদিন আগে ভাইঝি একটা বিলিতি সাবান দিয়ে গিয়েছিল। সাবান নয়, একমুঠো জুঁই-এর জমাট নির্যাস যেন। বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া সেটিকে খরচ করেন না তিনি। আজ সাবান ঘষেছেন অনেকক্ষণ। ভাঁজভাঙা পাজামা পাঞ্জাবিও পরে এসেছেন বাথরুম থেকে। প্যাকাটি শরীরে লতপত দোল খাচ্ছে যুবক পোশাক। দাড়ি আগেই কামিয়েছিলেন। সাদা রোঁয়া মুছে খানাখন্দ ভরা গাল চকচক করছে বৃষ্টিধোয়া কলকাতার রাস্তার মত। এ মুখ এখন দাঁত ছাড়া একেবারে বেমানান। বিশেষ করে ওদের সামনে। দাঁতবিহীন মুখে কথা বলতে গেলে শব্দগুলোকে ঠিক বাগে রাখা যায় না। মাড়িতে থুতুতে মিশে সব কেমন ভিজে ভিজে হয়ে যায়। উমানাথের দুচোখ ধোঁয়ায় ভরে গেল। চিরকালই প্রয়োজনের সময় আসল জিনিসটা হারিয়ে যায় তাঁর কাছ থেকে। কাঁপা হাতে

বিছানা বালিশ হাতড়ালেন, টেবিল ঘাঁটলেন তন্ন তন্ন করে। সবই যে যার জায়গায় আছে। দেওয়ালে হেলানো গোল আয়না, ব্রাশ, চিরুনি, পিঠ চুলকোনোর প্লাস্টিক হাত এমনকি বাইরে ভুলে ফেলে রাখা পেট্রল লাইটারটাও। একমাত্র দাঁতটাই কোন ম্যাজিকে অদৃশ্য হযে গেছে। দাগী আয়নায় উমানাথের তোবড়ানো মুখ অসহায়ভাবে নাচল খানিক। তেল চুপচুপ চুল কগাছা আঁচড়াতে ভুললেন। দুহাতে কোমর চেপে নিচু হলেন খাটের তলায়।

— ওভাবে মাথা গুঁজে কি খুঁজছেন উমাবাবু?

- আমার দাঁতটা। খাটের খাঁচায় আটকে থাকা মাথা নড়ল উমানাথের।

- দাঁত?

উমানাথ এবার মাথা বাইরে আনলেন। তখনই সুপ্রকাশের চোখে চোখ পড়ল। বুড়ো ভেড়ার মত হলদেটে চোখে খলবল করছে ধূর্ত হাসি। বুঝতে বাকি রইল না কিছু।

— আমি ভাবলাম বুঝি কি না কি হারালো আপনার। সেদিন সিকি হারিয়ে যা হন্যে হয়ে মরছিলেন.......

উমানাথের ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। চিতায় ঠ্যাং রেখেও ফিচলেমি করার অভ্যাস গেল না লোকটার। খাটে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে কোমর সোজা করলেন। অনাথ মাড়ি টপকে কিছু অবাধ্য বাতাস ছিটকে এল,

— আমার দাঁআত ফেএরতদিইইন।

সুপ্রকাশ পুরোপুরি না শোনার ভান করলেন। উমানাথ আর কিছু বলার আগেই তিনি চলে গেছেন জানলায় সামনে টুকরো উজ্জ্বল আকাশ। সেদিকে চোখ রেখে ফিক্ করে হাসলেন। ভালমতন জব্দ করা গেছে আজ উমা বাঁড়ুজ্যেকে।

— কি হোল? শুনতে পাচ্ছেন না? উমানাথের শিরা ছিঁড়ে এবার ভাঙা কাঁসি বেজে উঠল, আমি আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি....

খুশিতে মাথা দোলাতে লাগলেন সুপ্রকাশ। গলার ডগায় সুর কুলকুল.....ছন্দে ছন্দে দুউউলি আনন্দে.....জানলার নিচে সবুজ মাঠ। মাঠ না বলে ফালি ঘাসজমি বললেই মানায় বেশি। তারপরই উঁচু পাঁচিল। কম্পাউণ্ডের এই পেছন ভাগ সব সময়ই নিঝুম। এ মুহূর্তে শরতের প্রথম রোদ গেঁজেল বুড়োর মত ঝিম্ মেরে পড়ে আছে ঘাসের শরীরে। চারদিকে রোজকার অলস নীরবতা। জারুল গাছের শাখা মাড়িয়ে একটা দাঁড়কাক কর্কশস্বরে ডেকে উঠল। সুপ্রকাশের গানের সুর থেঁতলে গেল যেন। কাকের চিৎকারের সঙ্গে উমানাথের গলার কোন্ তফাত নেই। চিল্লোক। যত পারে চিল্লিয়ে যাক্। সেদিন ওদের সামনে বেইজ্জত করার সময় মনে ছিল না? ন্যাড়া মাড়ি নিয়ে সারাদিন ভক্‌ভক্ করে মরো আজ। সুপ্রকাশ ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন জানলায়।

একেকটা বড় ঘরে চারজনের থাকার ব্যবস্থা। মাথা পিছু একটা লোহার খাট, তেপায়া টেবিল, বসার টুল আর একখানা করে বেঁটে মতন আলমারি।

বাড়তি ট্রাংক স্যুটকেস্ যার যার নিজস্ব খাটের তলায়। হাঁটাচলার অসুবিধা হয় বলে বেতের চেয়ারগুলো সামনের টানা বারান্দায় সাজানো থাকে। লম্বা ঢাকা বারান্দায় সার সার চেয়ার, আরামকেদারা। সেখানে বসেই এ বাড়ির মানুষগুলোর সময় কেটে যায়। এ ঘরের আর দুজন তো দিন রাত পড়ে থাকেন বারান্দাতেই। এখন অবশ্য জয়মোহন ঘরে। জানলার ডানদিকের কোণে তাঁর আস্তানা। চার কোণে চার মানুষ যে যার মত সংসার সাজিয়ে বসেছেন। নিজস্ব এলাকার দেওয়াল জুড়ে গজাল আর পেরেকের জঙ্গল। দূরে সরে যাওয়া আত্মজনের বিবর্ণ ছবিতে সেজে আছে পাঁশুটে দেওয়াল। জানলার ঠিক উল্টোদিকে, দেওয়ালের মাঝা-মাঝি ক্যালেণ্ডারে দুলছে লাস্যময়ী এক জাপানী বিমান যুবতী।

জয়মোহন খুব মন দিয়ে খেলার খবর পড়ছেন। এ বছর বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার মারাদোনাকে নিয়ে বেজায় মাতামাতি চলছে। আগের বার ইতালির একজন ছিল সবার চোখের মণি। রোসি না কি যেন নাম ছোকরার? গতবার বিশ্বকাপ ফাইনালটা তিনি নিচে অফিস ঘরের টিভিতে রাত জেগে দেখেছিলেন। এবার শরীরে আর অতটা ক্ষমতা নেই। খবরের কাগজই ভরসা। এক সময় নিজেও নামী খেলোয়াড় ছিলেন। নেহাত পেটের রোগ কব্জা করে ফেলেছে, নইলে এখনও যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটার মত মনের জোর তাঁর আছে। প্রায়ই রাতে স্বপ্ন দেখেন বুটের ডগায় ফুটবল চেপে, হাওয়ার আগে জালের দিকে ছুটে চলেছেন। গজা ঘোষ ল্যাঙ্ মারল পেছন থেকে। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিলেন। আবার ছুটছেন। এবার সামনে শুধু গোলকীপার। ফুসফুসে বাতাস ভরে তিনি কিক্ মারলেন। গোও ও ল। স্বপ্নটা দেখলেই নতুন করে দেহে বল ফিরে পান। এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়েন তখন। এরিয়ানে খেলার সময় একবার শিরদাঁড়ায় জোর চোট পেয়েছিলেন। সেই আঘাত এখনও যন্ত্রণা দেয়। বেশি দূর হাঁটতে পারেন না।

উমানাথের একটানা চিৎকারে জয়মোহনের মেজাজ বিগড়ে গেল। এ ঘরের লোকগুলোর বিন্দুমাত্র স্পোর্টস্‌ম্যান্ স্পিরিট্ নেই। পথ আটকাচ্ছে তো কি আছে? ড্রিব্‌ল্ করে বেরিয়ে যা না বাপ্। এ সংসারে প্যান্‌পেনে মানুষদের কোন জায়গা নেই। সুপ্রকাশেরও বলিহারি। খেলতে নেমে শুধুই ফাউল করার ধান্দা। অসহ্য। জয়মোহন ঘুরে বসলেন। আন্‌ফেয়ার গেম্ তিনি কোনদিনই পছন্দ করেন না। যদিও ওরা আসবে শুনেই তড়িঘড়ি কলপ্ থুপে নিয়েছেন মাথায়। পেছন দিকের কিছু চুল খামচা খামচা ভাবে সাদা হয়ে আছে। ঘরের কেউ লক্ষ্য করেন নি। কিম্বা করলেও দেখিয়ে দেন নি। এখানকার অনেকেই তাঁর সম্পর্কে কম বেশি ঈর্ষাপরায়ণ। জয়মোহন অবশ্য তোয়াক্কা করেন না। সব সময় নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তরতাজা রাখতে ভালবাসেন। প্রতিবারের মতই ছাইরঙ্ ফুলপ্যান্টআর সাদা স্পোর্টস্ গেঞ্জি পরে তৈরি হয়েছেন। অসুস্থ সেজে সেবা নেওয়ার থেকেও স্মার্টভাবে ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াতে বেশি ভাল লাগে তাঁর। তিনি জানেন রোগাভোগা মানুষদের থেকে সবল

পুরুষেরা চিরকালই বেশি আকর্ষণীয়। এমনকি পঁচাত্তব বছব বযসেও।

উমানাথ চেঁচিয়েই চলেছেন। জয়মোহন ফেটে পড়লেন বিরক্তিতে, - কী শুরু করেছেন আপনারা অ্যাঁ ? এটা কি চিড়িয়াখানা?

--- দেখতে পাচ্ছেন না সুপ্রকাশবাবুর কাণ্ডটা? উমানাথ ডুকবে উঠলেন।

-- দিয়ে দিন না মশাই। কী ছেলেমানুষি করছেন?

— দেব না, দেব না। সুপ্রকাশ দুহাত তুলে গৌরাঙ্গনৃত্য কবে নিলেন আগের বারের কথা মনে নেই?

--- তাই আপনি প্রতিশোধ নিচ্ছেন ?

— না তো কি? ভাল মতনই জানেন ওই কাকাতুয়াটাকে দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। ও যেই এসে বসলো আমাব কাছে, হিংসেয পুড়ে গেলেন আপনি।

— কখ্খনও না। ওই কটকটিটাকে আমার আদৌ ভাল লাগে না। তাব থেকে ছোট্ট মুনিয়া পাখিটা অনেক সুন্দর। কী চমৎকাব কথা বলে। আব কী অপূর্ব শরীরের ভঙ্গিমা......উমানাথের গলা একটু একটু করে খাদে নেমে গেল, আসলে আপনার ন্যাকামো আমার সেদিন সহ্য হয়নি। তাই আপনাকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলুম।

— ও হো হো, কে আমার টিচার এলেন রে। সুপ্রকাশ ভেংচে উঠলেন। কিছুতেই বুঝি ভোলা যায় না সেদিনের অপমান....

সাদার ওপর লাল কালোয় টিপ টিপ সালোয়ার কামিজ পরেছিল সে। কি অপরূপ যে দেখাচ্ছিল। স্বচ্ছ ওড়না বাতাসে তিরতির। পাথরের ওপর আছড়ে পড়া ঝরণার বাষ্প যেন ঢেকে রেখেছে নরম বুক দুটোকে। বেতফল ঠোঁট টুকটুকে লাল। পালক পালক ভুরুর মাঝে এক বিন্দু টিপ। চিকন চুল দামাল ঢেউ হয়ে ফুলে উঠছে। সেই ঢেউ-এর ধাক্কায় টালমাটাল হয়ে উঠেছিল সুপ্রকাশের একাশি বছর বয়সটা। বুকের ভেতর জমাট বাঁধছিল দানা দানা কষ্ট, ও নির্ঘাত নকুলেশ্বরের কাছে যাবে। কিম্বা উমানাথ। সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি চশমাটাকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন বালিশের তলায়। আতসকাচ চশমা খুলতেই চারদিকে শুধু চাকা চাকা কুয়াশা। অনেকদিন তাঁর কাছে কেউ আসে না। ছেলে, মেয়ে, বউ, জামাই, নাতি নাতনী কেউ না। আরেকজন তো মুখ ফিরিযে চলে গেছে সেই কবে। কাকাতুয়া নকুলেশ্বরের দিকেই যাচ্ছে। পাখিব পাযেব মত হাতের আঙুলগুলো বিছানায় এলোপাথাড়ি পাক খেয়েছিল সুপ্রকাশের।

— আমাকে আজকের কাগজটা একটু এগিয়ে দেবে?

— ও সিওব। কাকাতুয়া সঙ্গে সঙ্গে পাশে এসেছে। কোন্ অচিন্ দেশেব যে আতর মাখে ওরা!

সুপ্রকাশ গলা নামিয়ে ছিলেন, আমার চশমাটা ঠিক খুঁজে....

— বেশ তো, আমি আপনাকে নিউজ পড়ে শোনাচ্ছি। কোন্ খবব শুনবেন? পলিটিক্স, গেমস্, এডিটোরিয়াল্......

সুপ্রকাশ ঢোঁক গিলেছিলেন। গলার কাছে উঠে আসা কফের টুকরোটা গিলে ফেলার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণ। যখন তখন গলার কাছে কেন যে আজকাল বিশ্রী ডেলা জমাট বেঁধে যায়!

সে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল, কি হোল আপনার? ফিলিং আন্ইজি?

সুপ্রকাশ কোনরকমে ঘাড় নাড়লেন। ঠিক তখনই ওপাশের বিছানা থেকে শেয়ালের মত হেসে উঠলেন উমানাথ, কেন মিছিমিছি মিথ্যে কথা বলছেন মশাই?

সুপ্রকাশ বৃথাই কট্মট্ তাকালেন। বাঁধানো দাঁত বিকশিত করে উমানাথ বলে চলেছেন, নিজের চোখে দেখলাম চশমাটা লুকিয়ে ফেললেন বালিশের তলায়.....কাগজ আপনি নিজেই দিব্যি পড়ে নিতে পারেন। কেন বেচারীকে অযথা.....

হাসির দমকে কাকাতুয়া, মুনিয়ারা তখন ভেঙে ভেঙে পড়ছে জলপ্রপাতের মত।

নতুন করে জ্বালা বুকের ভেতর। সুপ্রকাশের ঘাড় শক্ত হোল। গটগটিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। এঘর ওঘরের বেশ কয়েকজন সেজে গুজে বসে গেছেন বারান্দায়। প্রতিটি উৎকণ্ঠিত মুখে অন্যমনস্কতার মুখোশ। কোণার ঘর থেকে আদিনাথ কচ্ছপের গতিতে এগিয়ে আসছেন। বারান্দাটুকু পার হতে পাক্কা কুড়ি মিনিট সময় লাগে। পার্কিন্সন্স্ ডিজিজে আগে হাত মাথা কাঁপত। ইদানিং সে কাঁপন পায়েও ছড়িয়েছে। সুপ্রকাশ একেবারে রেলিঙ্-এর ধারে বসা নকুলেশ্বরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভুরভুর করে আফ্টার শেভের গন্ধ বেরোচ্ছে নকুলেশ্বরের শরীর থেকে। সারা গায়েই লোশন মেখেছে নাকি? সুপ্রকাশের নাক কুঁচকে গেল। ব্যাটা হাড়কিপ্টে। কবে কোন্ নাতনী এক শিশি লোশন দিয়েছিল, এখনও পুষে রেখেছে সেটাকে। পাছে কেউ ভাগ চায়, তাই লুকিয়ে মাখে। হুঃ, কুঁজোর দ্যাখো চিত হওয়ার শখ। গা ভরা যার চাকা চাকা এগজিমা, গালজোড়া খোঁচা খোঁচা দাড়ি সে কি না মাখে আফ্টার শেভ্! সুপ্রকাশের পেট থেকে কিছু বিদ্ঘুটে শব্দ ছিটকে এল। নকুলেশ্বর ফিরেও তাকালেন না। যেমন ছিলেন বসে রইলেন চোখ বুজে।

বারান্দার মুখোমুখি লোহার গেটের ওপারে ঝলমল করছে এক অন্য পৃথিবী। ঘড়ির ছোট কাঁটা আটের ঘর ছোঁওয়ার আগেই ব্যস্ততা নেমে গেছে মানুষের দুনিয়াতে। ধাতব উল্লাসে দশদিক তোলপাড় করে ছুটে বেড়াচ্ছে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, লরি। সুপ্রকাশ নাকের ওপর চশমা তুলে ধরলেন। এখান থেকে বাইরের মানুষগুলোকে পরিষ্কার দেখা যায় না। মনে হয় বৃষ্টিভেজা চলন্ত গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে সব কিছু দেখছেন বুঝি। সবুজ গেট খুলে গেল। একটা অ্যাম্বাসাডার ঢুকছে ভেতরে। সুপ্রকাশ ঝুঁকলেন। এত সকালে ডাক্তারের গাড়ি কেন? তপনজ্যোতির অবস্থা কি তবে আরও খারাপ হোল? দিন পাঁচেক

ধরে নিচের সিক রুমে মৃত্যুর সঙ্গে অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তপনজ্যোতি। ক্রনিক্ ব্রংকিয়াল পেশেন্ট। মাঝে মাঝে ফুসফুস বিকল হয়ে যায়। রক্তপ্রবাহ থমকে যায় তখন। মস্তিষ্ক ' মি . পড়ে। এবার বাড়াবাড়িটা বেশি হয়ে গেছে। আর বোধহয় বেচারাকে ধরে রাখা গেল না। সুপ্রকাশ শংকিত চোখে গাড়ি থেকে ডাক্তারের নামা দেখলেন। মাস কয়েক আগে হৃষিকেশ চলে গেছেন। তারপর আবার এই....। সুপ্রকাশের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শেষ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ফিরতি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁরা সকলেই। কার যে কখন গাড়ি এসে পড়ে! সুপ্রকাশ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। নাঃ। আজই তাঁর কাকাতুয়াকে চাই। চাইই। এখনই চাদর ঢেকে শুয়ে পড়বেন। তাঁর সর্দির ধাত আছে। যখন তখন জ্বর আসতেই পারে। কেউ অসুস্থ থাকলে ওরা তাঁর কাছে আগে যায়।

সুপ্রকাশ ঘরে যেতে অর্ধেকটা চোখ খুলে গেল নকুলেশ্বরের। এতক্ষণ চোখ বুজে হাঁপিয়ে উঠেছেন। উপায় কি। সামনে এলেই যা আবোল তাবোল বকে যান সুপ্রকাশ। ওই বক্তিয়ারটিকে একটুও তাঁর পছন্দ নয়। সাবধানে চোখে চশমা লাগিয়ে ঘড়ি দেখলেন। ঘড়ির কাঁটা কিছুতেই নড়তে চাইছে না। আলতোভাবে গালে হাত বোলালেন। মনটা ফের খুঁতখুঁত করছে। কিছুতেই দাড়িটা কামিয়ে ওঠা গেল না। ডুমো ডুমো গোটায় মুখ বেয়াড়া রকম ফুলে রয়েছে। আগে সময় পেলে সামনের সেলুন থেকে নয় সাবধানে কাটিয়ে আসতেন। লালচে দানার মাঝে খোঁচা খোঁচা শরবন। খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে কি? নকুলেশ্বরের ঘোলাটে চোখে হুড় হুড় করে দুঃখ ছুটে এল। এমনও সময় গেছে যখন তিনি পিঠ সোজা করে হেঁটে গেলে পথে একটা অনুভূতির সঞ্চার হোত। তাঁর স্পর্শ পাওয়ার জন্য সুন্দরীদের প্রতিযোগিতা দেখে গোপন গর্বে ভরে উঠতেন তিনি। কত জন যে মন দিয়েছিল তাঁকে। সেই হেমেনের বোন প্রমীলা! সে তো একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল তাঁকে পাওয়ার জন্য। সেই চুপি চুপি দেখা হওয়া, বহরমপুরের গঙ্গার ধারে হাত আঁকড়ে ছুটে যাওয়া দুজনের। একদিন নৌকো করে দুজনে নবাব প্যালেসে গিয়েছিলেন। সেদিনই কি তাকে প্রথম চুমু খেয়েছিল প্রমীলা? না, সেদিন বোধহয় নয়। তারও অনেক পরে। কিছুতেই ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই তো হেমেনরা চলে গেল বহরমপুর থেকে। যাওয়ার আগে সে কী বুক ভাঙা কান্না প্রমীলার। তারপর তাঁর বিয়ে হোল কবে? যুদ্ধ থামল পঁয়তাল্লিশে। তখন খোকনের বয়স চার। নাঃ, কিছুতেই হিসাব মেলানো যাচ্ছে না। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। অথচ কিছুকাল আগেও কী প্রচণ্ড দাপটে সময়কে চাবকে বেড়াতেন। নকুলেশ্বর ইজিচেয়ারের হাতল খামচে ধরলেন। কবে বিয়ে হয়েছিল তাঁর? খোকনই বা কোন্ সালে জন্মেছিল? ঠিক ঠিক কিচ্ছু মনে পড়ছে না। এবার খুকু এলে জিজ্ঞাসা করতে হবে। খুকুটা অনেকদিন আসছে না। খোকন তো এদিকের রাস্তা ভুলেই গেছে। সেই যে এখানে রেখে

ভেতরে। লাল, নীল, মভ্, ম্যাজেণ্টা নানান বর্ণের ঝিল-মিল পরী। তাদের ডানায় শব্দ বেজে উঠল ঝুমঝুম ঝুমঝুম। নাচতে নাচতে অফিসঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। দোতলার চেয়ারগুলো নড়ে চড়ে উঠল। পুরোন শরীরগুলোয় টান টান ভাব। ওরা এসে গেছে।

দুই

পুরীর লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে খাবার ঘরে ঢুকছেন শিবসুন্দর। তেইশ বছর আগে বানানো বার্লিংটনের স্যুটের বোতাম খুলে বাদামী কোট ঝুলে পড়েছে হাঁটু বরাবর। লাল টাই-এর বাঁধন আলগা। শিবসুন্দর আড়চোখে দেখলেন হাতে কপাল টিপে টেবিলে চুপচাপ বসে আছেন নকুলেশ্বর। এখনও খাবার আসেনি। প্রকাণ্ড টেবিলে রোজকার মত প্লেটগুলো উপুড় শুয়ে। শিবসুন্দর নিঃশব্দে চেয়ার টেনে বসলেন। কাকতাড়ুয়া চেহারা সামান্য বেঁকে গেল। নকুলেশ্বর মুখ তুললেন। চোখাচোখি হতে হাসার চেষ্টা করলেন দুজনেই। হাসি ঠিক ফুটল না ঠোঁটে। চোয়ালগুলো ফাঁক হোল মাত্র।

— আপনার ঘরের আর সবাই খেতে এল না?

— আসবে। নকুলেশ্বরের গলা ভেসে রইল বাতাসে, বারোটা কি বেজে গেছে?

কোটের হাতা আলতো উঠিয়ে ঘড়ি দেখলেন শিবসুন্দর, পাঁচ মিনিট বাকি।

নকুলেশ্বর প্রশ্ন করেই তারজাল ঘেরা জানলার বাইরে তাকিয়েছেন। বারোটা বাজল কি বাজল না সে খবরে এখন আর কোন আগ্রহ নেই তাঁর। নেহাত প্রশ্ন করতে হয়, তাই করা। সকালের সূর্য গড়াতে গড়াতে মাঝ আকাশে কখন আগুনের পিণ্ড। পৃথিবীর কোলে ছড়িয়ে পড়েছে প্রচণ্ড উত্তাপ। নকুলেশ্বর দু চোখ ছোট করে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখার চেষ্টা করলেন। ধাঁধালো আলোয় কিছুই স্পষ্ট বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে তীব্র আলোতেও সব কেমন ঝাপসা হয়ে যায়। পেছনের কৃষ্ণচূড়া গাছটাকেও ভাল মতন দেখতে পেলেন না তিনি। হতাশ মুখে দৃষ্টি ফেরালেন। আলো থেকে অন্ধকারে এসে চোখের ওপর ছোট বড় অজস্র গোলক ধাঁধা। আরও চার পাঁচজন কখন নীরবে ভেতরে এসে গেছেন। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছেন না। নিথর বসে আছেন যে যাঁর চেয়ারে।

একজন অ্যাটেন্ডেন্ট্ ঘরে এল, আপনাদের খাবার লাগাব?

কেউ উত্তর দিলেন না। কিছু ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল শুধু।

খাবার হাতে আরও দুজন অ্যাটেন্ডেন্ট্ ঘরে এল। টেবিলের ওপর যান্ত্রিকভাবে সাজিয়ে দিল ভাত, ডাল, সবজির পাত্রগুলো। সুপ্রকাশ টেরিয়ে তাকালেন। বড় কাচের বাসনে টলটল করছে মুরগির ঝোল। খসখসে জিভ নড়ে উঠল, হুঁঃ, আজ আবার মুরগি দেওয়া হয়েছে।

— ছেলে ভোলানো হচ্ছে। মুখ বেঁকালেন সোমেশ্বর। ফোকলা গালে ভারি অদ্ভুত দেখাল সেই মুখবিকৃতি।

— চাই না মুরগি। ফেরত নিয়ে যাও। নকুলেশ্বর অবিকল বাচ্চাদের মত ঠোঁট ফোলালেন।

— হ্যাঁ, এভাবে আমাদের ভোলানো যাবে না।

সকলে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। সামনে গরম ভাত। হেড অ্যাটেন্ডেন্ট্ ঘরে ঢুকে হতবাক চোখে তাকাল। এ দৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না। শেষ বয়সে খাওয়ার আসক্তি যে কত হিংস্র, সে তা রোজ দেখে।

— আজ আবার কি নিয়ে গোঁসা হোল আপনাদের?

একসঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সবাই।

— নিন্, নিন্, খেয়ে নিন্। আজ আপনাদের জন্য খুব বাচ্চা বাচ্চা মুরগি এসেছে। মুখে দিলেই গলে যাবে। চিবোতে হবে না। আপনারা উঠে গেলে পরের ব্যাচ বসবে।

একটা হাতও এগোল না টেবিলের দিকে। সুপ্রকাশ, উমানাথ পাশাপাশি বসেছেন। মাঝে মাঝে এ ওঁর দিকে তাকাচ্ছেন আড়ে ঠারে। সকালের সেই ঝাঁঝ অনেকটাই ম্রিয়মাণ। উমানাথ আরেকবার সুপ্রকাশকে দেখে বাঁ দিকে বসা দিবানাথের দিকে তাকালেন। এদিকে ওদিকে দেখছেন দিবানাথ। টেবিলের কোণা ছুঁয়ে থাকা হাতের আঙুলগুলো দপদপ কাঁপছে হৃৎপিণ্ডের মত। প্রচণ্ড ক্ষিধের অনুভূতি তাঁর নাড়িতে যেন বঁড়শির টান দিচ্ছে। সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকিয়েও আর বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারলেন না। ভাত তোলার জন্য চামচ টানলেন, আর বসে থেকে কি হবে? নিন্, শুরু করে দিই।

— হ্যাঃ, খাওয়া ছাড়া এখন আর কি আছে আপনার?

দিবানাথ অপ্রস্তুত চোখে তাকালেন।

নকুলেশ্বর অস্ফুটে বলে উঠলেন, টেবিলটার দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? সকালের পাঁউরুটির গুঁড়োগুলো পর্যন্ত পড়ে আছে।

— আমরা যে হেলাফেলার বস্তু। সুপ্রকাশের বুক নিংড়ে দুঃখী বাতাস গড়িয়ে এল।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর একে একে প্লেট টানলেন সকলে। অ্যাটেন্ডেন্ট্ মুচকি হেসে ভাত বাড়ল। শেষ পর্যন্ত দশ মিনিটের হাংগার স্ট্রাইক ভেঙেছেন বিদ্রোহীরা। তবে খুব অলসভাবে নড়াচড়া করছে শিরাওঠা আঙুলগুলো। আটটা মুখের কচকচ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোনখানে। কারুরই খাওয়ায় মন নেই। খেতে হয়, তাই খাওয়া। উমানাথ পাতে পড়া মুরগির টুকরোটা অন্যমনস্ক ভাবে খুঁটলেন। মুখে এক কুচি মাংস ফেলার সময় চোখ থেকে টপ্ করে দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল থালায়। দৃশ্যটা সুপ্রকাশের নজর এড়াল না। গলার কাছে তাঁর আবার ডেলা দলা পাকাচ্ছে। ওটা কফ্ না কষ্ট ঠিক বুঝতে পারলেন না। বাঁ হাত ঘুরিয়ে উমানাথের পিঠে রাখলেন, — আমাকে মাফ্

করে দিন উমাবাবু।

— যেতে দিন। উমানাথ দাঁতের পাটি ঘষে নিজেকে সামলাতে চাইলেন। বাঁ হাতের তালুতে আলগোছে মুছে নিলেন চোখ, আসলে আপনার কাকাতুয়াটা পাশে বসে কলকল করলে এত ভাল লাগে....

— আপনার মুনিয়া পাখিটা কি কিছু কম নাকি?

ওরা একটু পাশে বসবে, একটু কপাল টিপে দেবে, হাত রাখবে পিঠে, এটা কি খুব বেশি চাওয়া? শিবসুন্দর হঠাৎ বলে উঠলেন।

— ওদের হাত মুখের চামড়াগুলো ছুঁয়ে দেখেছেন? কিরকম নরম সতেজ...... সোমেশ্বর উদাস হোলেন।

— ঠিক বলেছেন। ঝরে যাওয়ার পরে গাছে যে নতুন পাতা গজায়, অবিকল সেরকম। মনে হয় ওরা ছুঁয়ে দিলেই আমাদের শুকিয়ে আসা চামড়াগুলো.....

— আর কী নরম শরীর....নকুলেশ্বর হাত গুটিয়ে বসলেন, সেই শরীর থেকে কী তীব্র মেয়েলি গন্ধ! মনে হয় এক ঝড়ের ধাক্কায় ষাটটা বছর পেছনে ফিরে গেছি। নিজেদের আবার নতুন করে পুরুষ বলে ভাবতে ভাল লাগে।

শিবসুন্দর আস্তে আস্তে ঝুলন্ত টাই নামালেন কোলের ওপর,

— শুধু পুরুষ কেন নকুলেশ্বরবাবু? পুরোপুরি একটা মানুষ মনে হয় না নিজেকে?

— হুঁ। এসব কি আর বোঝে না সুপার ছোকরা? সব বোঝে।

— তবু ওদের আজ আসতে দিল না ওপরে। সুপ্রকাশ কাঁধ ঝাঁকালেন, ইচ্ছে করে আসতে দিল না।

হতাশা থেকে অভিমান। অভিমান থেকে ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ রাগ হয়ে ছিটকে বেরোতে শুরু করল ক্রমশ। প্রথমে সোমেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন, আমি মুরগি খাব না।

— আমিও খাব না। প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিলেন নকুলেশ্বর।

— আমিও না।

— অ্যাই, তুলে নিয়ে যাও সামনে থেকে খাবার।

সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে আরেকজন অ্যাটেন্ডেন্ট্ হট্টগোল শুনে ঘরে এল, কি হোল, না খেয়ে উঠে পড়ছেন যে? মাংস কি সেদ্ধ হয়নি?

— খাব না। সুপরাকে ডাকো, আমরা কৈফিয়ত চাই। উমানাথ চিৎকার করে উঠলেন।

—কৈফিয়ত? কিসের জন্য? হতভম্ব মুখে তাকাল অ্যাটেন্ডেন্ট্রা। দিব্যি তো সকলে খেতে শুরু করেছিল। আবার কি হোল! সত্যি, বুড়োদের নিয়ে পেরে ওঠা দায়। যখন তখন রঙ বদলায় মেজাজের।

— পাখিগুলোকে আজ ওপরে পাঠালে না কেন? শিবসুন্দর লাঠি ঠুকলেন মেঝেতে।

— ভেবেছ এভাবে পরীদের সরিয়ে রাখা যায়? অনেকদিন পর মিলিটারি হুংকার ছাড়লেন সোমেশ্বর, জবাব দিতে হবে কেন পাঠাওনি ওদের?

— আমি আজ রজনীগন্ধার গন্ধ পেলাম না। কেন এভাবে ঠকানো হোল আমাকে?

একসঙ্গে হল্লা করছে সকলে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে কিছু সময় লাগল অ্যাটেন্ডেন্টদের, কলেজের মেয়েগুলো আজ ওপরে আসেনি, তাই এত গোঁসা?

একজন চোখ টিপল, ওরা তো আজ সবাই মিলে তপনজ্যোতিবাবুর সেবা করে গেল।

— কেন? কেন?

— বারে, ওঁর বেশি অসুখ যে।

— আমরা বুঝি খুব সুস্থ? অবোধ বালকের মত গাল ফোলালেন সুপ্রকাশ, কাল রাতে আমার টান ওঠেনি? ভোর হওয়া অবধি বসেছিলাম বিছানায়, তার বেলা?

— আমার তো তিনদিন ধরে জ্বর আসছে। নকুলেশ্বর গজগজ করে উঠলেন, মুখে কোন স্বাদ নেই, কিছু ভাল লাগে না, তার বেলা?

হেড অ্যাটেন্ডেন্ট এতক্ষণে গম্ভীর হোল, কিসে আর কিসে। আপনাদের সঙ্গে তপনবাবুর তুলনা? জানেন কাল রাত থেকে ওঁর অক্সিজেন চলছে....

— তা বলে সবাই ওঁর কাছে চলে যাবে?

— যাবে না? ডায়িং পেশেন্ট অ্যাটেন্ড করলে ওরা যে বেশি নম্বর পায়।

— মানে? বিস্ময়ে সব কটা মুখ ঝুলে পড়ল হঠাৎ।

— মানে আর কি? আপনাদের সঙ্গ দিয়ে গেলে ওরা যা নম্বর পায়, তার ডবল পাবে ডায়িং পেশেন্টের সেবা করলে। এমনি এমনি ওরা আসে না আপনাদের কাছে বুঝলেন....

তিন

একা মনে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসেছেন জয়মোহন। আজ একটু বেশিই হেঁটেছেন। এবার ফেরার পালা। বিকেলের অনেক আগেই পথে বেরিয়েছিলেন। অন্যান্য দিন নকুলেশ্বর, উমানাথ থাকেন সঙ্গে। কিম্বা সোমেশ্বর বা শিবসুন্দর। আজ তিনি একা। সঙ্গীরা সব দুপুরের পর থেকে নিস্পন্দ বসে আছেন যে যাঁর জায়গায়। বাজে পোড়া এক একটা জীর্ণ গাছ যেন। বেরোনর আগে জয়মোহন বার কয়েক ডেকেও ছিলেন। কেউ সাড়া করে নি। ময়দানের কাছাকাছি পৌঁছে জোরে জোরে শ্বাস নিলেন জয়মোহন। এত ভেঙে পড়ার কি আছে! ফর্ম পড়ে গেলে রিটায়ার করাই তো নিয়ম। তখন কে আর ধারে কাছে আসে! এটুকু মানতে না পারলে বাঁচারই কোন মানে থাকে না। এই যে তাঁর খোঁজ নিতে ভাইপো ভাইঝিরা আর আসে না, তাতে কি এসে গেল? পুষে রাখলেই অভিমান বাড়ে। অথচ দাদাদের সংসার টানতে টানতে নিজেব বিয়ে

করাই হোল না। হোল না তো হোল না। যতদিন সামর্থ্য ছিল হাসিমুখে করে গেছেন সবার জন্য। জীবনে একমাত্র দরকার স্পোর্টস্‌ম্যান স্পিরিট্‌। তাঁর সঙ্গীদের ভেতর এই জিনিসটারই বিশেষ অভাব। সামান্য ছোটখাটো ব্যাপারে এঁরা এত বেশি হতাশ হন! সেই, যে বছর ফর্ম থাকা সত্ত্বেও জোর করে বসিয়ে দেওয়া হোল তাঁকে; বলা হোল অনেক খেলেছ এবার রিটায়ার করো, সেদিনের যন্ত্রণা কি কোন কিছুর থেকে কম? মেনে তো নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মেনে নেওয়ার নামই শান্তি।

কব্‌জি উঁচু করে ঘড়ি দেখলেন জয়মোহন। দিনের আলো ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসছে। কিছু দূরে ভিক্টোরিয়ার কালো পরীর মাথায় পাতলা সরের আস্তরণ। রাস্তার দুধারে ফ্লোরেসেন্ট বাতিগুলো একসঙ্গে দপ্‌দপ্‌ জ্বলে উঠল। জয়মোহন পেছন ফিরলেন। নিয়ম মাফিক মানুষের ভিড়ে দিন শেষের রাস্তাঘাট গমগম। দুটো অল্প বয়সী ছোকরা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন কেন? সতর্ক থাকলে তিনিই আগে ডজ্‌টা মারতে পারতেন। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে পিঠে সামান্য খোঁচা লেগে গেছে। ব্যথাটা ফিরে আসবে নাকি? জয়মোহন প্রাণপণে কষ্ট ভুলতে চাইলেন। বিশাল রাজপথ গাড়িতে গাড়িতে থৈ থৈ। এক মহিলা বাচ্চা কোলে রাস্তা পার হওয়ার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে। জয়মোহন টানটান হোলেন। মহিলা কি কিছুতেই ওপারে যেতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। ওই তো ডানদিক খালি হয়েছে। উত্তেজনায় জয়মোহনের হাত মুঠো হয়ে গেল। আর একটু, আর একটু। সাবাশ। বাঁ দিকের মারুতিকে থমকে দিয়ে পার হয়ে গেল মহিলা। জয়মোহন শ্বাস ফেললেন। ভেতরে ভেতরে আত্মবিশ্বাস আবার গভীর হচ্ছে।

সামনেই এক টিভির দোকানে থোকা ভিড়। ভাল কোন খেলা দেখাচ্ছে নাকি? ভিড় ঠেলে এগোতেই জয়মোহন ওদের মুখোমুখি পড়ে গেলেন। তাঁদের বৃদ্ধাবাসে আসা দুটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে দোকান থেকে। সঙ্গে জিনস্‌ পরা এক যুবক। এই মেয়ে দুটোকে নিয়েই সকালে সুপ্রকাশ উমানাথের ঝগড়া লেগেছিল না? জয়মোহন দাঁড়িয়ে গেলেন। এরা বোধহয় আজ আসেইনি।

— কি গো, কেমন আছ? অজান্তে গেঞ্জির কলার ঠিক করলেন জয়মোহন।

লম্বা স্কার্ট পরা মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়েছে।

জয়মোহন দু গাল ছড়িয়ে হাসলেন, টিভিতে ফুটবল দেখছিলে বুঝি?

— আমাকে কিছু বলছেন? সরল নিষ্পাপ চোখে তাকাল মেয়েটি।

জয়মোহন ঢোঁক গিললেন। এরা কি তবে তাঁকে চিনতে পারছে না? নাকি জিন্‌স্‌ পরা তরুণের সামনে....

— আমি জয়মোহন দত্ত....

— আপনাকে তো ঠিক.....মানে.....হ্যাঁ, কোথায় খুব দেখেছি? মেয়েটি অপ্রতিভ হাসল।

— বাঃ। আগের বার আমাদের ওল্ড্‌হোমে এসে কত গল্প করেছিলে মনে

নেই? সেই পেলে, ইউসেবিওর গল্প?

সালোয়ার পরা মেয়েটির ঠোঁট পাপড়ি মেলল এবার, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনেছি। .. . কেমন আছেন? ভাল? .... প্লীজ্ ডোন্ট্ মাইণ্ড। অ্যাকচুয়ালি প্রথমটা ঠিক রিকালেক্ট....

জয়মোহন নিষ্পলক তাকালেন। যৌবনের স্মৃতিশক্তি কি বার্ধক্যের থেকেও কম?

ওরা আবার উড়ে যাচ্ছে। হাসছে ঝরণার মত। কি যেন বলল। ছোকরাটি ঘুরে তাকাল। হেসে উঠল জোরে। জয়মোহন কাঠ হয়ে গেলেন। পঞ্চাশ বছর পরে নতুন করে একটা অপমানের স্রোত বয়ে গেল দুর্বল শিরদাঁড়া বেয়ে। দুপুরে অ্যাটেন্ডেন্ট্দের কথা শুনেও এমনটা হয়নি। মেয়েদুটো তাঁকে একদমই আলাদা ভাবে চিনতে পারেনি। বলে দেওয়ার পরও চিনেছে কি? নাকি ভদ্রতা করে কথা বলে গেল?

নেশাগ্রস্তের মত হাঁটছেন জয়মোহন। তিনি যে একটা স্বতন্ত্র মানুষ; ইঁট, কাঠ, পাথর নন, যাঁর এই পৃথিবীতে একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে, তাকেই কেমন খেলাচ্ছলে অবহেলা করে চলে গেল মেয়ে দুটো। মাথা ঘুরছে বন্‌বন্ করে। শিরদাঁড়া ভেঙে আসছে। টলতে টলতে কখন হোমের গেটে চলে এসেছেন নিজেও টের পাননি। বাইরের পৃথিবীতে যদিও এখন জমজমাট সন্ধ্যা, তাঁদের কম্পাউন্ডে রাত নিশুত। অফিসঘরের সামনে ঝুলন্ত বাতিটা টিমটিম জ্বলছে। সবুজ লন জুড়ে থমথম নির্জনতা। জীবনে আজ প্রথম ঝুঁকে পড়ে হাঁটছেন জয়মোহন। এক্ষুনি শুয়ে পড়া দরকার। হৃৎপিণ্ড ওঠা নামা করছে হাপরের মত। অফিসঘর ছাড়িয়ে প্যাসেজে ঢুকলেন। আরেকটু এগোলে সিঁড়ি। কিন্তু একি? তিনি সিঁড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছেন না কেন? অসহায় ভাবে চারদিকে তাকালেন। গোটা কয়েক ঘর পেরোলে একেবারে শেষ প্রান্তে সীক্‌রুম। পায়ে পায়ে এগোলেন সেদিকে। ঝাঁঝালো ওষুধের গন্ধে মাথা অবশ হয়ে আসছে। ঘুমের ভেতর হাঁটা মানুষের মত জয়মোহন সীকরুমের দরজায় কখন পৌঁছে গেছেন। পর্দা সরাতেই দেখলেন তপনজ্যোতির বিছানা ঘিরে ছায়া ছায়া অন্ধকার। না, অন্ধকার নয়। সুপ্রকাশ, শিবসুন্দর, সোমেশ্বর আর নকুলেশ্বররা সকলে মিলে অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তপনজ্যোতিকে ঘিরে। কে যেন অলৌকিক স্বরে ডাকলেন, আসুন জয়মোহন।

জয়মোহন এক ঘোরের ভেতর এগোলেন যেন। তপনজ্যোতি চলে যাচ্ছেন। বুকের শেষ বাতাসটুকু ভয়ংকর ঘড়ঘড় শব্দে নিজেকে জানান দিল। তপনজ্যোতির খুব কাছে গিয়ে জয়মোহন বলে দিতে চাইলেন, পরী প্রজাপতিরা কেউ সত্যি নয় হে তপন। আসলে শুধু আমরাই সত্যি। এই আমি, আপনি, আমবা সকলে . .

কোন আওয়াজই ফুটল না গলায়। নীরব মূর্তিগুলোর পাশে আরও একটা ছায়া হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলেন শুধু।

আজ সুবর্ণজয়ন্তী

কাকভোরে ভেতর দালানে পা রাখতেই টেবিলখানা আজ ঠক করে চোখে লাগল সুহাসিনীর। ম্যাগো ম্যা কী দশা! অমন ফুটফুটে শ্বেতপাথরের টেবিল একেবারে কালচিটে মেরে গেছে গো! কেউ একটু গতর নাড়িয়ে মোছে না!

ঘুম জড়ানো পায়ে টেবিলের কাছে গেলেন সুহাসিনী। হাত রাখলেন পাথরে। স্নেহে, মমতায়। কত কাল পর এ টেবিল এত ফাঁকা দেখছেন। সারাক্ষণই তো কারুর না কারুর দখলে। সুহাসিনী যখন শুতে গেলেন তখনও, যখন বিছানা ছাড়লেন তখনও। এই দেখো বড় তরফের ঝন্টু বউ-ছেলে নিয়ে মুড়িছোলা খাচ্ছে, ওমনি ছোট তরফের নীপু সপরিবারে টোস্ট ওমলেট হাতে বসে গেল। দীপুরা যদি কর্তাগিন্নীতে একপাশে মাংসভাত খেতে বসে, তো অন্য পাশে ভাতের গর্তে ট্যালটেলে মুসুর ডাল ঢালে রন্টু। তারা না উঠতেই মন্টুরা ডিমের ঝোল ভাত। মোদ্দা কথা, শূন্য নেই কখনই। যেমনটি আছে এখন। খাওয়া না থাকলেই বা কী! কখনও রন্টুর বউ গোটা টেবিল ছড়িয়ে রেশনের গমের কাঁকর বাছছে, কখনও আটা ঠেসছে নীপুর বউ। ঝন্টুর কাজের মেয়েটা মাজা বাসনের ডাঁই উপুড় করে দিল, দেখাদেখি দীপুর কাজের মেয়ে ছড়িয়ে দিল ধোওয়া কাপ-ডিশ। জল ঝরাচ্ছে। বেশি বয়সে ছেলে হয়েছে বলে মন্টুর বউয়ের আবার আদিখ্যেতা খুব, যখন তখন ছেলেকে নাড়ুগোপাল সাজিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে টেবিলে। মুতবি তো বাবা ওখানেই মোত, নামিস না লক্ষ্মীসোনা! তা সে নাড়ুগোপাল জল ছেড়েছে কি ছাড়েনি, অমনি ধুন্ধুমার। দীপুর বউ ঝামটে এল, ঝন্টুর বউ ডানা ছড়াল, রন্টুর বউ ফণা তুলল, নীপুর বউ গলা।

কথায় কথায় টেবিল চাপড়ে কীর্তন জুড়ছে পাঁচ বউ, দোহারকি দিচ্ছে বরেবা। আহা, কী দৃশ্য!

ভাবতেই বিবমিষা। আলো অন্ধকারে ভূতুড়ে রকমের একা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড টেবিল ছেড়ে বিরক্ত মুখে বারোয়ারি বৈঠকখানা পার হলেন সুহাসিনী। এসে দাঁড়িয়েছেন বড় দালানে। সামনে এক সকাল ফুটছে। পরশু শ্রাবণ সংক্রান্তি, আকাশে এখনও ভারী ভারী মেঘ, আলো বড় কম। রাতের দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, এখনও চারদিক ভেজা ভেজা, প্রশস্ত উঠোনের ছোট বড় ফাটলে জল জমে আছে। গেটের ধারে দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা পামগাছ সিক্ত শরীরে পথ চেয়ে আছে সূর্যের। তা তিনি বোধহয় আজ আর বেরোবেন না, মেঘবন্দি হয়েই থাকবেন সারা দিন। পাখিরা আড়মোড়া ভাঙছে, গলা সাধছে, এবার তাদের নীড় ছাড়ার পালা।

এত ভোরে সুহাসিনী ওঠেন না আজকাল, উঠতে পারেন না। ক্ষমতায় কুলোয় না। রাতভর জেগে জেগে শেষ প্রহরেই চোখ দুটো জড়িয়ে আসে যে। প্রথম রাতেও তন্দ্রা আসে অল্প অল্প, কিন্তু তখন চোখের পাতা এক করে কার বাপের সাধ্যি! বড় তরফের ঝন্টু, মন্টু, রন্টু আর ছোট তরফের দীপু, নীপু, পাঁচ শরিকের ঘরে লাগাতার তাণ্ডব চলছে। ও ঘরে গাঁক গাঁক টিভি, তো ও ঘরে ঝাং ঝাং টেপ। একতলায় কোনও স্বামী স্ত্রীতে বাধল, দোতলায় ছেলেপিলের। ওপরে রন্টুর ঘরে মিয়াবিবির কোন্দল তো বাঁধা রুটিন। ঝন্টুর দুই ছেলে গোটা সন্ধে টো টো করে পড়তে বসবে রাত দশটার পর, পড়া তো নয় যেন দুই ভাই পাল্লা দিয়ে ডাকাত তাড়াচ্ছে। নীপুর বড় মেয়েটা গান শিখছে, তারও রাত না বাড়লে গলায় সুর আসে না। দীপু আবার আর-এক কাঠি বাড়া, সবাই নিবলে তিনি জ্বলে ওঠেন। বোতল কুমারের মোচ্ছবই শুরু হয় মাঝরাতে। হুইস্কি লাও, সোডা লাও, চিৎকার কী! ভি সি আর না ফি সি আর কি যন্ত্র কিনেছে, তাই চালিয়ে বাঁজা বউয়ের সঙ্গে বসে ন্যাংটো মেয়ের লীলা দেখে। আর সে কথা সুহাসিনীকে শুনতে হয় কি না নীপুর মেয়ের কাছে! কী লজ্জা কী লজ্জা! মন্টুটাই যা একটু পদের। শান্তশিষ্ট, বাড়ির সাতে পাঁচে থাকে না, গলা নামিয়ে কথা বলে, কিন্তু তার আবার অন্য ব্যায়রাম। দেশোদ্ধার! রাতদুপুর অবধি পার্টির ছেলেরা ঘরে ঢুকছে, বেরোচ্ছে, জুতোর মশমশ, চটির ফ্যাটফ্যাট, সাইকেলের কিরিরিং কিরিরিং। এত কিছুর ফাঁক গলে নিদ্রাদেবী আসবেন কোন্ পথে!

অগত্যা সুহাসিনীর একটাই কাজ। প্রহর গোনা। এবং প্রহর গোনা। এবং এবং প্রহর গোনা। দূরের শালিমার ইয়ার্ডে মালগাড়ি শান্টিংয়ের গুম গুম শব্দ

বাজে হঠাৎ হঠাৎ, কুকুরেব পাল এ বাড়ির মানুষদের থেকেও বিশ্রী গলায় ঝগড়া করে রাস্তায়, রাত কাঁপিয়ে দুপদাপ ছুটে যায় লরি, মাথার ওপর দীপুর ঘর থেকে ছিটকে আসে অশ্লীল শব্দের ফুলকি....যমযন্ত্রণা! এর পর যে সাতটার আগে সুহাসিনীর চোখ খুলবে না, এ আর বিচিত্র কী!

তা শেষ রাতের ওই মলিন ঘুমটুকুও পুরো হল না আজ। আকাশ ফর্সা হওয়ার আগে থেকেই ড্রাম বাজছে। প্রকৃতিতে নয়, পাড়ায়। সঙ্গে পোঁপ্‌পো পোঁপ্‌পো পোঁ বিউগল্ ধ্বনি, গটমট জুতোর আওয়াজ। মিত্তিরবাড়ির কাবুল হেঁকে চলেছে, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট্ রাইট, লেফ্‌ট্ রাইট.....

সুহাসিনী চোখ কচলালেন। যৎসামান্য ঘুমটুকুই যা সুখ, তাও ঠিকমতো না হলে মাথা কেমন টলমল করে আজকাল। পঁয়ষট্টিতেও সুগার প্রেশার কোনও উপসর্গই নেই তাঁর, তবু করে। বয়সটা যেন হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ে চেপে বসছে। কদিন আগেও দৃষ্টি বেশ পরিষ্কার ছিল, ষাট সত্তর গজ দূরে ওই নারকেল গাছটায় টিয়াপাখির ঝাঁক উড়ে এলে স্পষ্ট দেখতে পেতেন, এখন গেটের মাথায় কি নাচছে, শালিখ না কাক, তাও যেন ঠিকমতো ঠাহর হয় না। ছানি পড়বে? একটা ইন্দ্রিয় বুঝি গেল তবে।

মন্টুদের ঠিকে ঝি এসে গেছে ভোর ভোর। ঝাঁট দিচ্ছে। মন্টুদের ঘরের ধুলোময়লা ঠেলে এনে নীপুর দোরগোড়ায় জড়ো করে দিল। হায় রে মা, নীপুর বউ এখনই বেরোলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। সুহাসিনী তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলেন।

—গুড মর্নিং পিসিঠাম্মা।

রন্টুর ছেলে দোতলা থেকে চটাপট নেমে আসছে, ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন সুহাসিনী। ঝকঝকে দাঁত মেলে। নাতির কায়দায় বাও করলেন নাতিকে, মর্নিং। এত ভোরে সেজেগুজে চললি কোথায় রে?

—বারে, আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর না! প্রভাতফেরি আছে।

—ও। ইস্কুলে?

—উহুঁ, ক্লাবে। শুনতে পাচ্ছ না, কখন থেকে কাবুলদা হুইসিল দিচ্ছে!

—তাই বল্। আমি ভাবছি সকাল থেকে কিসের আবার রাজযজ্ঞি শুরু হল!

টুকাইয়ের পরনে সাদা হাফপ্যান্ট, ধবধবে সাদা শার্ট, গলায় ফাঁসের মতো তেরঙা টাই। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠোনের জলকাদা পার হচ্ছে টুকাই, সাবধানে, অতি সাবধানে।

একতলায় নীপুদের দরজা খুলে গেল। নিজেদের দু' কামরার মহল থেকে

এক লাফে বেরিয়ে এসেছে নীপুর ছোট মেয়ে। টুকাইয়েরই সমবয়সী, সবে ক্লাস থ্রি।

উত্তেজিত মুখে চিল্লিয়ে উঠল মিস্টুলি, —এই, তুই স্কুলে যাবি না?

—আগে কাবুলদার ফাংশন শেষ হোক। টুকাইয়েরও সোচ্চার উত্তর।

—তার মানে স্কুলে যাচ্ছিস না?

—যাচ্ছি না তো যাচ্ছি না। তোর কী রে?

—আজ কিন্তু স্কুলে রোল কল হবে। আন্টি বলে দিয়েছে।

টুকাই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গেল—আমি কাল গার্জেনের চিঠি নিয়ে যাব। মা লিখে দেবে বলেছে।

—আন্টি যদি ধরে ফেলে?

—ধুস্। তুইও তো মাসির বিয়েতে গিয়েছিলি, রাঙাজেঠি জ্বর হয়েছে লিখে দিল, আন্টি ধরতে পেরেছে? বলতে বলতে টুকাই ফিরছে পায়ে পায়ে। কাছে এসে গলা নামাল, তুইও স্কুলে যাস্ না। কাবুলদা আজ হেব্‌বি প্যাকেট দিচ্ছে।

মিস্টুলি দু' পা এগোল, কী দেবে রে?

—অনেক কিছু। প্যাটিস্, ফিশচপ, পেস্‌ট্রি, কোল্ডড্রিঙ্কস....

—এত?

—বারে, গোল্ডেন জুবিলি না! সুহাসিনীর দিকে আড়ে তাকিয়ে নিল টুকাই, কাবুলদা বেশি হাঁটাবেও না। ব্যাতাইতলার মোড় পর্যন্ত, ব্যাস্। আর স্কুল গোটা শিবপুর রাউন্ড দেওয়াবে, হাতে ধরাবে টিফিনকেক আর লাড্ডু। কোনটা ভাল?

মিস্টুলি দোনামোনায় পড়ে গেছে। মজা লাগল সুহাসিনীর, হাসছেন মিটিমিটি। নাতি-নাতনিরাই যা এখন মনের আরাম।

দুম করে নীচের ঘরের জানলা খুলে গেল। নীপুর বউ হাঁক পাড়ছে, মিস্টুলি, ঘরে চলে এসো। হাঘুরেপনা করতে হবে না।

সিঁড়ির মুখ থেকে তক্ষুনি ঝঙ্কার উড়ে এল, কি হচ্ছে কি টুকাই? কতদিন না বারণ করেছি গায়ে পড়ে কারুর সঙ্গে কথা বলবে না!

—আমি বলি নি মা। মিস্টুলি আমায় ডাকল।

—জানি তো। নিজেরা লোভে লক লক, অপরকে বলে হাঘুরে!

—তোর ছেলেকে কিছু বলিনি মণিকা, নিজের মেয়েকে বলেছি। কুঠুরি থেকেই কথা ছুড়ছে নীপুর বউ, তোর গায়ে লাগল কেন?

—কথা ঘুরিও না রাঙাদি। কে কোন্ মনে কী বলে সব বুঝতে পারি।

— সে তো বুঝবিই। তুই হলি গিয়ে বটতলার উকিলের বেটি....

শুরু হল। দত্তবাড়ি জেগে গেছে। এবার বাপবাপান্ত শাপশাপান্তরে চাপান-উতোর চলল।

সভয়ে সরে এলেন সুহাসিনী। ভেতর দালানে। সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে এই তো লাভ। দিনভর গা ম্যাজম্যাজ করবে এখন, পুজোআর্চায় মন বসবে না, সুচিন্তা মাথায় আসবে না, একটা পেঁকো গন্ধ সারাক্ষণ ম ম করবে নাকে। টেবিলে চোখ পড়াটাই যত নষ্টের মূল। যার ঝিরকুটেপনা দেখে চোখ করকর করে, তার পানে চোখ যায় কেন!

চোখেরও বলিহারি, সেই ফিরে ফিরে টেবিলটাকেই দেখে! পায়াগুলোও গেছে! রঙ নেই, পালিশ নেই, ছ' ছখানা পায়ারই কী করুণ হাল! মাঝেব একটা পায়া কেতরে আছে, কেতরে আছে না? কাছে গিয়ে পরখ করলেন সুহাসিনী। যা ভেবেছেন তাই, জোড় খুলে লতলত করছে, কোনওক্রমে মেঝে আর পাথর ছুঁয়ে আছে পায়া। আলগা চাপ দিলেন সুহাসিনী, ঠেললে যদি স্বস্থানে ফেরে।

মন্টু দাঁত ব্রাশ করতে করতে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, —উবু হয়ে কী দ্যাখো গো পিসি?

—পায়াটা তো গেছে রে। একটু গজাল পেরেক এনে ঠুকে দিতে পারিস না? একটা মিস্ত্রিও তো ডেকে আনতে পারিস।

—ও টেবিলের কি আর কিছু আছে পিসি! এক পায়া সারালে আর-এক পায়া যাবে।

—সব কটা সারাবি। একসঙ্গে সারাবি।

—তা হলে তো একদিন এস্টিমেটে বসতে হয়। তোমার অন্য ভাইপোদেরও বলে দ্যাখো, সবাই যা বলবে তাই হবে।

দায় এড়ানো কথা। জানে পাঁচ শরিক কখনও একত্র হবে না। দুই শরিকেই বা কী করেছিল, সুহাসিনীর দুই দাদা! প্রাসাদের মতো বাড়ি খসে ভেঙে পড়ছে, বড়দা দেখায় ছোড়দাকে আঙুল, ছোড়দা দেখায় বড়দাকে। যে যার মতো কলি ফেরায় নিজের অন্দরের, বহিরঙ্গে কী রূপ দেখেও দেখে না। তাদেরই তো ছেলেপিলে সব, পৃথক আর কি হবে! হিংসেয় জ্বলে মরে, বিধাতার পরিহাসটুকু বোঝে না। অত বিবাদ, হেঁশেল ভিন্ন, কথা বন্ধ, তবু যেই না ছোট ভাই চিতেয় উঠল, ওমনি পিছু নিল বড় ভাই। তিনটে মাস কাটতে না কাটতে। বছর না ঘুরতে বড় গিন্নিও হাঁটা দিয়েছে পরপারে। আর পোড় খেয়ে, মার খেয়ে, ছোট গিন্নির ঠাঁই শেষে মেয়েদের দোরে। এখানে এলে তার তো এখন তুইথুলি মুইথুলি দশা। দীপু বলে, নীচে নীপুর ঘর বড়, ওখানে থাকো। নীপু বলে,

ওপরে আলো হাওয়া বেশি, সেখানে যাও। বেচারা ছোট বউ, ননদকে যে একটি দিনের তরে সইতে প ল না, এখন এ বাড়ি এলে তার ঘরই তাব আশ্রয়। ভাগ্যে একখানা কামব, সুহাসিনীকে লেখাপড়া করে দিয়ে গিয়েছিলেন বাবা, বালবিধবা মেয়ের নামে টাকা রেখেছিলেন ব্যাঙ্কে, তাই না এমন ভাইপোদের অন্নদাস হতে হল না কখনও।

টেবিলটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুহাসিনী। হৃদয় নিংড়ে একটা লম্বা শ্বাস গড়িয়ে এল। নিজেব জন্য নয়, ছোট বউদিব জন্য নয়, বেচারা টেবিলখানাব জন্য। কী ছিলি রে তুই, কী হয়েছিস!

এই বুঝি তবে জগতের নিযম। এজমালি হয়ে গেলে সাত বাজাব ধন এক মানিকও ফেলনা হয়ে যায়। হায় বে।

সাত রাজার ধনই বটে। এমন টেবিল এ অঞ্চলেব আব কেউ আব দ্বিতীযটি দেখেনি আগে। শুধু তারা কেন, তাদেব পরিচিত কেউ দেখেছে বলেও শোনা যায় না। যেমন আকার, তেমনই বাহার। প্রকাণ্ড দালানে পড়ে থাকে বলে এর বিশালত্ব মালুম হয় না, আড়ে দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে একখানা ছোটখাটো ঘরের সমান। ছ' ছ'খানা কারুকাজ করা দামি কাঠের ঠ্যাং, ঝকঝকে সাদা পাথরের গা ঘেঁষে লতাপাতার অপরূপ নক্‌শা, ঠিক চৌকোও নয়, গোলও নয়, ডিম-শেপও নয়, টেবিলখানার এ এক আশ্চর্য আকৃতি।

এ টেবিলের সঠিক ঠিকুজিকুষ্ঠিও কারুর জানা নেই, তবে এই শ্বেতপাথরের টেবিলখানা ঘিরে একদা অনেক গল্পকথা চালু ছিল চারদিকে। গোটা তল্লাটে দত্তবাড়ির মার্বেল টেবিল এখনও এক জীবন্ত কিংবদন্তি। কেউ বলে এর বয়স একশো, কেউ বলে তিনশো, আবার কেউ-বা বলে পাঁচশো। কোনও পরিস্থিতিতেই অনুমানটা সত্তর আশির নীচে নামে না, তাতে নাকি এই টেবিলের মর্যাদাহানি হয়। চূড়ান্ত নব্যপন্থীদের মতে কলকাতার শেষ বড়লাট যখন এখান থেকে দিল্লিতে রাজ্যপাট উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই নাকি অর্ডার দিয়ে বানিয়েছিলেন টেবিলখানা। শেষমেশ ডিজাইনটা গিন্নির পছন্দ না হওয়ায় পেল্লাই ভারী গন্ধমাদন তিনি আর সঙ্গে নিয়ে যাননি, বেচে দিয়ে যান এক পার্শি ব্যবসায়ীকে। সেই পার্শি বণিক, পেস্টনজি না সোরাবজি কী যেন নাম, তিনিও বছর দুয়েকের বেশি ব্যবহার করেননি টেবিল। ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে দেশের পশ্চিম মুলুকে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি, তখনই ঢুকিয়ে দিয়ে যান এক নিলামঘরে, সেখান থেকেই দত্তবাড়িতে পা রেখেছে এ টেবিল।

এ গল্পের শেষটুকুনি নিয়ে কোনও দ্বিমতই নেই, কিন্তু প্রথমটা প্রায় কেউই

বিশ্বাস করে না। পাড়ার রোয়াকে, বৃদ্ধদের আড্ডায়, এর ওর বৈঠকখানায় কদিন আগেও সব থেকে চালু গল্পটা ছিল আর-একটু অন্য রকম। টেবিলটা সাহেব, পার্শি, নিলামঘর হয়েই দত্তবাড়িতে ঢুকেছিল বটে, তবে ও টেবিল নাকি সাহেবদেরও নয়। দিল্লির বাদশা ফারুখশিয়ার নাকি একবার এক জবরদস্ত অসুখে পড়েছিলেন, যাই যাই দশা। এক সাহেব ডাক্তার, ইংরেজই হবে, সে নাকি প্রায় ভেলকি দেখিয়ে যমের দরজা থেকে বাদশাকে ফিরিয়ে এনেছিল। সেই সূত্রেই প্রচুর উপঢৌকন পেয়েছিলেন সাহেব, ওই টেবিলও তার মধ্যে একটি। তারপর ডাক্তারের বংশধরদের হাত ঘুরে ঘুরে কলকাতার নীলামঘরই হয় তার অস্থায়ী আস্তানা।

এই উপাখ্যানটিই অধিকাংশ লোকের মনপসন্দ্। হয়তো নবাব বাদশার গন্ধ আছে বলেই। তবে ফারুখশিয়ারই ওই লা-জবাব মেজখানির প্রথম মালিক কিনা তাই নিয়েও বিস্তর মতবিরোধ আছে। কেউ বলে ফারুখশিয়ারের পূর্বপুরুষ রাজপুতদের কাছ থেকে ভেট পেয়েছিল ওটা। আবার কেউ বা বলে কোন এক ভীল রাজার জঙ্গলমহল থেকে এই মহার্ঘ বস্তুটিকে লুঠে এনেছিল রাজপুতরা। সেই অরণ্যচারী কোত্থেকে এটি পেয়েছিল, নিজে বানিয়েছিল কি না, এমন এক শৌখিন টেবিলে তার কি প্রয়োজন ছিল, তা নিয়ে অবশ্য আর তর্কাতর্কি জমত না বিশেষ, তার আগেই লোকজনের হাই উঠত।

এসব কাহিনী উপকাহিনী সুহাসিনীরও অজানা নয়, বরং আরও বেশিই জানেন। বাইরে প্রচারিত সব গল্পেরই মূল উৎস তো এই দত্তবাড়িই, তারাই না এসব কাহিনী ফেঁদে টেবিলটাকে ঘিরে এক রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করেছিল। এদের মধ্যে সেরা গপ্পোবাজ ছিলেন সুহাসিনীর বাবা। মাত্র দু' বছর শ্বশুরঘর করে সতেরো বছরে বাপের বাড়ি ফিরে আসা বিধবা মেয়ের মন ভোলাতে হঠাৎ হঠাৎ আজব গপ্পো ফাঁদতেন তিনি। একবার বলেছিলেন এ টেবিল নাকি হস্তিনাপুরের রাজসভায় ছিল, এর ওপরেই নাকি পাশা খেলেছিলেন শকুনি আর যুধিষ্ঠির!

ওই আষাঢ়ে কাহিনীও কি পল্লবিত হয়েছিল তল্লাটে? সুহাসিনীর জানা নেই। তবে এও ঠিক, বাবার মুখে গল্প শুনে শুনে একসময়ে তাঁর সত্যি ধারণা জন্মেছিল এই টেবিল বুঝি অজর অমর অক্ষয়।

আজ, এই শেষ বয়সে এসে, সুহাসিনীর মনে বড় ধন্দ জাগে। অজর অমরই যদি হবে, কাঠের পায়া তবে খসে খসে পড়ে কেন? পাথরের নয় লয়-ক্ষয় নেই, অনন্ত কাল টিকলেও টিকতে পারে, কিন্তু কাঠ? হাতফেরতা হওয়ার কালে পায়া কাঠামো কি বদল হয়েছে বারবার? হতেই পারে। সুহাসিনীর

বিয়ের বছরেই তো মেরামত হল একবার, নয় কি? সেবারেই না .....।

বাপ রে, সে কী রই রই কাণ্ড! সেও ছিল এক শ্রাবণ মাস, অঘ্রানে সুহাসিনীব বিয়ে, স্থির হল পুজোর আগে সারাই হবে টেবিল। ঠাকুর্দা সাহেব কোম্পানিতে এত্তেলা পাঠালেন, হ্যাট কোট পরা সাহেব মিস্ত্রি নিয়ে হাজির। দশ বারো জন মজুর হেঁইয়ো মারি জওয়ানদারি করে বৈঠকখানা থেকে দালানে বার করছে টেবিল, চাগাড় দিয়ে তুলল কষ্টেসৃষ্টে, শেযে দরজা পেরোতে গিয়েই বিপত্তি। দুই মজুব চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ল, সামাল দিতে না পেরে বাকিবা ফেলেই দিল টেবিলখানা। সঙ্গে সঙ্গে দু' দিক থেকে দু' কোণ ভেঙে টুকরো। ঠাকুর্দার কী আফসোস, সাহেবদের খবর না দিয়ে নিজেরই মিস্ত্রি লাগানো উচিত ছিল!

সেই থেকেই ও টেবিল পড়ে আছে ভেতর দালানেই। খুঁতো হয়ে। তার গল্প ইতিহাস নিয়েও আর তেমন মাথা ঘামায় না এ-বাড়ির কেউ, ভাঙা টুকরো দুটোর জন্য হাহুতাশ তো কবেই উবে গেছে। দেড়েমুসে ভোগ করছে সবাই, এই না সুখ।

কী অত্যাচার! কী অবহেলা! কী অনাদর!

তারস্বরে মাইক বাজছে। ভোরের কুচকাওয়াজের পর থেকেই। কখনও হিন্দি, কখনও বাংলা, কখনও দেশাত্মবোধক, কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত। দেশপ্রেমের বান ডেকেছে চারদিকে।

সুহাসিনী সকালের পুজোয় বসেছেন। পুজো মানে তেমন কিছু উপচার সাজিয়ে বসা নয়, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে দু' বেলা দু' দণ্ড নিরালা হওয়া। আজ আসন পাততে একটু দেরিই হয়ে গেল। স্নানে যাবেন, মন্টুর বউ বলল আজ নাকি শুভদিন। কিসের শুভদিন শ্রীহরিই জানেন, ঘরে ঘরে তো কলহের কামাই নেই! নীপু, রন্টু সেই থেকে গজরাচ্ছিল, সবে থামল। খানিক আগে কী মুখখারাপটাই না করল দীপু, কানে আঙুল দিতে হয়। তারে মেলা পাঞ্জাবিতে তার কে না কে ব্লেড মেরে রেখেছে! ঝন্টুর বড় ব্যাটার কারসাজি হলেও হতে পারে, গোঁফ গজাতে না গজাতেই যা ত্যাঁদোড় হয়ে উঠেছে ছোকরা। তার পরও মন্টুর বউয়ের মুখে শুভদিন কথাটা শুনে সুহাসিনীর বুক যে কেন কুনকুনিয়ে ওঠে! স্নানে না গিয়ে ঘর গোছাতে বসলেন সাতসকালে। কী বা আছে ঘরে, একটা ছোট পালঙ্ক, আয়না বসানো ঢাউস কাঠের আলমারি, ছোট একটা সিন্দুক, দুটো মিটসেফ, আর একখানা সাবেকি আলনা। তাই ঝাড়তেই ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা পার। আর-একটু আগে হত, যদি না রাজ্যের লোকের

আমোদ দেখতে সতেরোবার ছুটতেন বাইরে।

হ্যাঁ, আমোদ একটা হচ্ছে বটে। দিনটা তো প্রতিবারই আসে, প্রতিবারই যায়, সুহাসিনী তেমনভাবে টের পান কই! এবার যেন জাঁকজমক চোখে আঙুল দিয়ে খোঁচাচ্ছে। লরির পর লরি চলেছে ঢিকির ঢিকির, লরির পিঠে দুলে দুলে গান গাইছে ছেলেমেয়েরা। ব্যান্ড পার্টিই গেল কত। সাতটা আটটা দশটা.....গুনে গুনে শেষ হয় না।

গুমগুম কিল পড়ছে দরজায়, ধ্যানে বিঘ্ন ঘটল সুহাসিনীর। হাঁক পাড়লেন, কে রে?

—আমি। শামু।

হঠাৎ ঝন্টুর ছোট পুত্তুর কেন! সুহাসিনী গলা খাঁকারি দিলেন, কি চাই?

—দরজা খোল না। এক্সাইটিং নিউজ।

সেভেনে উঠল ছোঁড়া, খুব ইংরিজি ফটর ফটর করে। ধীরে সুস্থে দরজা খুললেন সুহাসিনী, কি নিউজ শুনি?

শামুর পরনে এখনও স্কুলড্রেস। হাঁপাচ্ছে, তুমি রান্না বসাওনি তো পিসিঠাম্মা?

—আ মোলো যা, এখনও বলে আমি দাঁতে কুটোটি কাটিনি! সুহাসিনী চোখ ঘোরালেন, কেন?

—রান্না বসিও না। আজ তোমার নেমন্তন্ন।

—কোন্ চুলোয়?

—আজ একটাই চুলো জ্বলবে।

কথাটা সুহাসিনীর বোধগম্য হল না, ফ্যাল ফ্যাল তাকাচ্ছেন।

শামু কায়দা করে ঘাড় ঝাঁকাল, আজ সবাই মিলে ফিস্ট হবে। বাবা, বড়কাকা, মেজকাকা সব একসঙ্গে বসে ডিসিশান নিয়েছে। মা তোমায় বলতে বলল। তোমার জন্য আজ স্পেশাল ভেজিটেরিয়ান ডিশ।

সুহাসিনী দপ করে চটে গেলেন, বচ্ছরকার দিনে আমায় নিয়ে মজা হচ্ছে?

—মজা নয় পিসিঠাম্মা, ফ্যাক্ট। বড়কাকা তো একটু আগে খুব চেঁচাচ্ছিল, বাবা গিয়ে প্রোপোজালটা দিতেই গলে জল। ছোটকাকা, রাঙাকাকা সব্বাই জয়েন করছে।

—আর তোর কাকিমারা?

—মিলে গেছে। শামু চোখ টিপল, হাতে হাত ধরে সব রান্না করবে আজ। লম্বা লাইন ধরে।

সুহাসিনীর তবু বিশ্বাস হয় না। শামুটা অম্লানবদনে ফক্কুড়ি মেরে যেতে

পারে। এক্ষুনি হয়তো কোনও বউকে জিজ্ঞেস করতে গেলে ছ্যারছ্যাব চারটি শুনতে হবে সুহাসিনীকে।

তখনই মন্টুর মহলের দিকে চোখ গেল। ধোপদুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবি পরে ছেলে কোলে বেরিয়েছে মন্টু। গলা ওঠালেন সুহাসিনী, অ মন্টু, এদিকে শোন্। শামু যা বলছে তা কি সত্যি?

মন্টু হাসিমুখে এগিয়ে এল, কী ব্যাপারে বলো তো?

—আজ নাকি তোরা সবাই এ বাড়িতে ফিস্ট করছিস?

—সবাই বলছ কেন, তুমিও আছ। চাঁদা তুলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া আর কি। ভাবছিলাম, আজকের দিনটা অভিনব উপায়ে সেলিব্রেট করব....দাদা প্রস্তাবটা দিল ...

সুহাসিনী প্রায় গলে গেলেন, আমায় কত দিতে হবে?

মন্টু হো হো হেসে উঠল, তোমার কিছু লাগবে না। তুমি আজ গোল্ডেন জুবিলির চিফ গেস্ট।

— কেন, দিই না কিছু?

—উঁহু, সবাই মিলে আমরা ডিসাইড করেছি। দাদা, মেজদা, বন্টু, নীপু..

—তোরা সব্বাই একত্র হয়েছিলি! আহ্লাদে চোখ পিটপিট করছেন সুহাসিনী, টেবিলের কথাখানা তুলেছিলি বাপ?

মন্টুর বুঝতে বুঝি কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তারপরই হেসে উঠেছে আবার। আরও উচ্চৈঃস্বরে, তুমি কী গো পিসি। আজকের দিনে কেউ অমন সেন্সেটিভ কথা তোলে!

—একবার বললে পারতিস।

—বলবখন। সময়মতো। তাল বুঝে। বলতে বলতে ঘড়ি দেখছে মন্টু, দামুটা এখনও ফিরছে না কেন? আমাকে আবার বেরোতে হবে....

—কোথায় গেছে দামু?

—বাজি কিনতে। আমিই পাঠালাম। গোল্ডেন জুবিলিতে বাড়িতে ফ্ল্যাগ তোলা হবে, একটু পটকা ফাটবে না, তা কি হয়! এটা সেরেই আমাকে একবার হাওড়া ময়দান ছুটতে হবে। বক্তৃতা আছে। সেখান থেকে একবার বাক্সাড়া ঘুরে....চার পাঁচটা আইটেম রান্না হবে, দেড়টা দুটোর আগে ফিরলেই হল, কি বল পিসি?...এই শামু, তোর দাদাকে দ্যাখ না, কোথায় গেঁজে গেল!

শামু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। পায়ে পায়ে উঠোনে নামল মন্টু। দোমহলা বাড়ির দিকে ফিরে চেঁচাচ্ছে, দাদা, মেজদা, রন্টু, নীপু, কী হল রে তোদের? তাড়াতাড়ি নাম। ..... মেয়েরা, এসো।

সবার আগে একতলা থেকে বেরিয়ে এল নীপু, নীপুর বউ। সঙ্গে বুলবুলি, সে আজ সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে শাড়ি পরেছে। দোতলা থেকে বাজারের থলি হাতে নেমে আসছে দীপু আর মন্টু, রন্টুর বউ তাদের পিছন পিছন। রন্টু আর দীপুর বউ হাসতে হাসতে সিঁড়ি ভাঙছে, বাকি দুই বউ বেরিয়ে এল মন্টুর ঘর থেকে।

সুহাসিনীর চোখে পলক পড়ছিল না। পিলপিল করে হাস্যমুখে জড়ো হচ্ছে পাঁচ শরিক, এও কি সম্ভব। গেটে একটা ইয়া বাঁশ বাঁধা হয়েছে, তার ডগায় পতপত নেচে উঠল তেরঙা ঝাণ্ডা। পটকা ফাটছে, শাঁখ বাজছে, উলু দিচ্ছে বউরা....। সুহাসিনী ভোরের দুঃখ ভুলে গেলেন।

পতাকার এত গুণ! নাকি জুবিলির!

নাহ্, সত্যিই আজ শুভদিন।

জব্বর মেন্যু হয়েছে আজ। বাসমতি চালের ভাত, সোনামুগের ডাল, দিশি ভেটকির ফ্রাই, ইলিশের ভাপা, মুরগির কারি, আমসত্ত্বর চাটনি। শেষ পাতে দইও আছে। ছেলেপিলেদের খাওয়া সারা, কর্তারা এবার বসল। শ্বেতপাথরের টেবিলে। পাঁচ বউ পরিবেশন করছে ঘুরে ঘুরে। সুহাসিনী প্রধান অতিথি হলেও হাত গুটিয়ে বসে নেই, মোড়ায় বসে তদারকি করছেন খাওয়াদাওয়ার।

বেলা বাড়ার পর মেঘ সরে গেছে অনেকটা। সূর্যের হাসিখুশি মুখ দেখা যায় মাঝে মাঝে। রোদ কম, ঝাঁঝও কম। বাষ্পবোঝাই বাতাস বইছে থেকে থেকে, ঘাম জমছে অল্প অল্প, তাপ কম বলে ঘামটুকু মন্দ লাগে না। উঁচু সিলিং-এ ঘুরন্ত পাখার হাওয়ায় আরাম হচ্ছে বেশ।

ফিশফ্রাই-এ কামড় দিয়ে নীপু বলল, তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে গেলে পারতে পিসি।

—মরণ! সুহাসিনী মুখ টিপে হাসলেন, আমাকে কোনও দিন তোদের ওই টেবিলে বসতে দেখেছিস?

—আজ বসতে। সারা জীবন তো মাটিতে বসেই খেয়ে গেলে।

—আমার মাটিই ভাল। আমি ওসব ছোঁয়াছুঁয়ি ম্লেচ্ছপনার মধ্যে নেই। বাপ-দাদার আমলেই টেবিলে বসলুম না.....

ঝন্টু বলল, পিসির খাবার তোমরা আলাদা করে রেখেছ তো?

—হ্যাঁ দাদা। দীপুর বউ উত্তর দিল, —পিসির রান্না আলাদা গ্যাসে হয়েছে। আমিষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

রন্টু মিটিমিটি হাসছে, পিসি আজ কি কি সাঁটাচ্ছে?

নীপুর বউ মুখে আঁচল চাপা দিল, ছানার ডালনা, আলু কাঁচকলার কোপ্তা, নারকেলের পুর দিয়ে পটলের দোল্‌মা, ...

—ও গ্র্যান্ড! করেছ কি পিসি? তোমারই তো আজ কপাল গো।

সুহাসিনীর অন্তরটা তর হয়ে যাচ্ছিল। খাওয়ার লোভে নয়, তার প্রতি সকলের এই নজরটুকু দেখে। হোক না ক্ষণিক, তবু এ তো সত্যি বটে। মুহূর্তের জন্য মনে হল এই সুখী সময়ে টেবিলটার কথা তোলেন একবার, তার আগেই ঝন্টু বলল, পিসি, লাস্ট তুমি কবে এমন মেন্যু খেয়েছ গো?

দীপু অস্ফুটে বলল, তুই খাওয়ার আগে।

ঝন্টু ভুরু কুঁচকে তাকাল, কি বললি?

দীপু খ্যাক খ্যাক হাসল, বলছি, তুই যবে লাস্ট এত ভাল মেন্যু খেয়েছিস, তার আগে।

—তুই কিন্তু আমায় টন্ট্ করলি দীপু!

নীপু ফস করে ফুট কেটে উঠল, ওমা, তুমি টন্টও বোঝ?

রন্টু বলল, অমন ভাবে কথা বলছিস কেন রে? আমরা কি ভুখ্‌খার পার্টি, খেতে পাই না? নাকি কনট্রিবিউশান কম দিয়েছি?

দীপু বলল, কনট্রিবিউশান দেখাস্ না রন্টু। তোরা তিনজন, দাদার ফ্যামিলি চারজন, তোদেরও যা কনট্রিবিউশান, আমাদের দুজনেরও তাই।

রান্নাঘরের দরজা থেকে মন্টুর বউ নাক গলাল, তার জন্যই তো আপনার পাতে বড় পেটিটা পড়েছে মেজদা। মেজদি কি ওটা এমনি এমনি আলাদা করে সরিয়ে রেখেছিল?

নীপু মন্টুকে বলল, কী ভাষা রে বউয়ের! লঘুগুরু জ্ঞান মুছে গেল!

মন্টু কড়া গলায় বলল, নিজের দাদাকে জিজ্ঞেস কর, একশো টাকা চাঁদা দিয়ে সে কিছু আমাদের কিনে নেয়নি।

—না, তোমরাই কিনেছ। ঝামটে উঠল দীপুর বউ, তাকিয়ে তাকিয়ে কার পাতে কী পড়ল তাই দেখা হচ্ছে! জন্মে কোনও দিন চল্লিশ টাকা কিলোর চাল খেয়েছ, আমাদের কল্যাণে তো জুটল। এখন হাত শুঁকে শুঁকে বছর চালাও।

ঝন্টুর বউ খেঁকিয়ে উঠল, চোপ। এমন চাল আমার ঘরের ঝি-চাকরে খায়।

—হ্যাঁ। নীপুর বউ ভেংচে উঠেছে, আমরা তো চাঁদে থাকি, কার উনুনে কি বসে দেখতে পাই না। মেঝে থেকে মুড়ি কুড়িয়ে টিফিন বাক্সে ভরে কে?

সুহাসিনী প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সংবিৎ ফিরতে চিৎকার করে উঠলেন, অ্যাই, কি হচ্ছে কি? থামো থামো, এমন একটা দিন কেউ ঝগড়া করে

নষ্ট করে!

ঝন্টু গর্জে উঠল, দিন মারিও না পিসি। ওই মন্টুটার জন্য আজ হারামীদের সঙ্গে এক পাতে বসতে হল।

নীপু হুল ফোটাল, তোমার যেন নোলা কম হ্যাহ্!

—তবে বে শালা। থালা ঠেলে উঠে পড়েছে ঝন্টু। ছুটে গিয়ে ঘেঁটি চেপে ধরেছে নীপুর। দীপু দাঁড়িয়ে উঠে এক লাথিতে চেয়ার ফেলে দিল, দৌড়ে এসে হেঁচকা টান দিল ঝন্টুকে, পলকে পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ফালা ফালা।

তিন মিনিটে দালান রণক্ষেত্র হয়ে গেল।

ফাঁকা হয়ে গেছে টেবিল। শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে থাকা লোকজনও। যার যার থালা বাটি গ্লাস নেমে গেছে কলতলায়, পাঁচ অংশে ভাগ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সাদা টেবিল জুড়ে এখন শুধু আধখাওয়া মাংসের টুকরো, মাছের কাঁটা, চাটনির মণ্ড, ডেলা ডেলা ঝাল ঝোল মাখা ভাত। লাল পিঁপড়ে উঠছে সার বেঁধে, প্রায় ছেয়ে ফেলেছে টেবিলটা। আঁশ আঁশ দুর্গন্ধে ভারী হয়ে আছে দালানের বাতাস।

বাথরুম থেকে বালতি টেনে আনলেন সুহাসিনী, জল ভরা। খালি পেট মোচড় দিচ্ছে, ন্যাতা ভিজিয়ে মুছতে শুরু করলেন টেবিলটাকে। প্রাণপণে নাকে কাপড় চেপে রেখেছেন, তবু গুলিয়ে ওঠে গা। তার মধ্যেই নজরে পড়ছে টেবিলময় চুলের মতো সরু সরু দাগ। অসংখ্য। পাথরও কি ফাটতে শুরু করল!

দামু বুলবুলি উঁকি দিচ্ছে বারোয়ারি বৈঠকখানা থেকে। কৌতূহল চাপতে না পেরে দালানে বেরিয়ে এল টুকাই মিস্টুলি শামু। যে পিসিঠাম্মা জন্মে কোনও দিন এঁটো টেবিলে হাত ছোঁয়ায় না, সে কিনা পাথরে ন্যাতা বোলাচ্ছে! এ যে বড় আজব দৃশ্য!

দরদর ঘামছেন সুহাসিনী। একা হাতে আর পারছেন না। অতিকায় টেবিল ক্রমশ বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে।

ক্লান্ত স্বরে সুহাসিনী ডাকলেন, দেখিস কি বাছারা? আয়। তোরা অন্তত হাত লাগা।